# একালের সমালোচনা সঞ্চয়ন



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

1973

## সূচীপত্র

প্রবন্ধসূত্র :

১. 'সাহিত্য-সম্পুট' : বিশ্বভারতী ; ২. 'সাহিত্যবিতান' : মোহিতলাল মজুমদার ; ৩. 'নানা নিবন্ধ' : সুশীলকুমার দে ; ৪. 'সাংস্কৃতিকী' (১ম) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ৫. 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; ৬. 'বক্তব্য' : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; ৭. 'শাশ্বত বঙ্গ' : কাজী আবদুল ওদুদ ; ৮. 'সাহিত্য-বীক্ষা' : নীরেন্দ্রনাথ রায় ; ৯. 'স্বগত' : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; ১০. 'সাম্প্রতিক' : অমিয় চক্রবর্তী ; ১১. 'বাঙালী ও বাঙ্‌লা সাহিত্য' : প্রমথনাথ বিশী ; ১২. 'বাঙ্‌লা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি' : গোপাল হালদার ; ১৩. 'বাঙ্‌লা সমালোচনা পরিচয়' : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ; ১৪. 'প্রবন্ধ' : অন্নদাশঙ্কর রায় ; ১৫. 'প্রবন্ধ সংকলন' : বুদ্ধদেব বসু ; ১৬. 'আধুনিক কবিতার ভূমিকা' : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ; ১৭. 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' : বিষ্ণু দে ; ১৮. 'সাহিত্যের স্বরূপ' : শশিভূষণ দাশগুপ্ত

# রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

১

কালিদাসের কালে জন্ম নিলে তাঁর কাব্যরচনার প্রকৃতি ও পরিমাণ কীরকম হত রবীন্দ্রনাথ তা কৌতুকের সঙ্গে কল্পনা করেছেন। তাঁর লেখা একটি মাত্র শ্লোকের স্তুতিগানেই যে রাজা উজ্জয়িনীর প্রান্তে একখানা উপবন-ঘেরা বাড়ি কবিকে দান করতেন তা সহজেই বিশ্বাস হয়। কিন্তু কালিদাসের কালের রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাধরের স্তুতিগীতেই তাঁর কবি-প্রতিভাকে নিঃশেষ করতেন, আর তাঁর কাব্যসৃষ্টি দু-একখানি মাত্র ছোট-খাটো পুঁথি ভ'রে দিত এ একেবারে অবিশ্বাস্য। ত্বরাহীন জীবন মন্দাক্রান্তা তালে কাটিয়ে দেবার কোনও লোভ, কি রাজার চিত্রশালার কোনও মালবিকার মোহ, তাঁর কবি-মর্মের এ সংকোচ ঘটাতে পারত না। তাঁর কাব্যগুলি খুব সম্ভব আকারে ছোটই হত, যেমন 'মেঘদূত' ছোট ; কিন্তু সংখ্যায় দু-একখানি নয়। নরনারীর চিত্তের সহজ ও সূক্ষ্ম বহু ভাব ও আকাঙ্ক্ষা, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের পরমাশ্চর্য লীলা অনেকগুলি খণ্ডকাব্যে বাণীর পরিপূর্ণ মূর্তি নিয়ে ফুটে উঠত, যার অম্লান দীপ্তি কাব্য-রসিকের মন আজও উদ্ভাসিত করত। অনুষ্টুপ্ থেকে স্রগ্ধরা এবং রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কালে জন্মান নি ব'লে সংস্কৃত ভাষায় যে-সব ছন্দ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে তাদের বিচিত্র ঝংকার ও দোল, এসব কাব্য থেকে দেড় হাজার বছর পার হয়ে আমাদের কান ও মনে এসে লাগত।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য, বিশেষ ক'রে কালিদাসের কাব্য, রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে নানা দিকে নাড়া দিয়েছে। এর কারণ, এ সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিবিড় যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ সুর ও ছন্দের রাজা। তাঁর সুররসিক মন ও আশ্চর্য ছন্দকুশলী কান সংস্কৃত কাব্যের ধ্বনি ও ছন্দের মধ্যে নিজের প্রতিভার একটা অংশের গভীর ঐক্য উপলব্ধি করেছে। বালক বয়সে যখন সংস্কৃত কাব্যের অর্থ বুঝে তার রসগ্রহণের সময় হয় নি তখনও যে তাঁর মনকে ওর ছন্দের তাল ও লয়ে মুগ্ধ করত 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ তার

সাক্ষ্য দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যে ভাষায় ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা ও রসোদ্‌বোধনের শক্তি একটা চরম পরিণতি লাভ করেছে। এই পরম উৎকর্ষের মূল উপাদান দুটি—কালিদাসের শব্দসম্পদের নিটোল পরিপূর্ণতা ও তার অপূর্ব ধ্বনিসামঞ্জস্য। এর মিশ্রণে যে কথা ও ভাব কালিদাস প্রকাশ করতে চেয়েছেন তার দীপ্ত পরিচ্ছন্ন মূর্তি তখনি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে, যে রস তিনি জাগাতে চান 'শুকেন্ধন ইবানলঃ' পাঠকের চিত্তকে তা ব্যাপ্ত করে। কালিদাসের ভাষা একসঙ্গে ছবি ও গান। রঘুবংশের যে প্রারম্ভটা প্রথম যৌবনে নিতান্ত সরল বর্ণচ্ছটাহীন মনে হয়, ভাবপ্রকাশে তার কী অদ্ভুত ক্ষমতা !—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ ॥

মনে হয় কী সহজ এ রচনা। শিল্পীর চরম কৌশল এই সহজের মায়া সৃষ্টি করেছে। এ হচ্ছে সেই শ্রেণীর সহজ, মানবদেহের সামঞ্জস্য যেমন সহজ। ও এমনি সুসম্পূর্ণ যে, তাকে নিতান্ত স্বাভাবিক বলে আমরা মেনে নিই, গড়নের যে আশ্চর্য কৌশলে এই সামঞ্জস্য এসেছে, তার কথা মনেই হয় না।

প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ।

একটি মাত্র লাইনে অক্ষমের হাস্যকর নিষ্ফল চেষ্টার ছবি কালিদাস এঁকে তুলেছেন, আর তেমনি সে লাইনের ধ্বনির বৈচিত্র্য ও ব্যালান্স। ভাষা-প্রয়োগের এই চরম নৈপুণ্য কেবল পৃথিবীর মহাকবির লেখাতেই পাওয়া যায়। যেমন শেক্সপীয়রে—

And then it started like a guilty thing
Upon a fearful summons.

.. .. .. ..

.. a poor player
That struts and frets his hour upon
the stage
And then is heard no more.

ভাষা যেন রেখা ও ধ্বনি দিয়ে ভাবের মূর্তি গড়ে চলেছে। এই পরিপূর্ণ বাণীর অভাবে অনেক শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিভা মহাকবিত্ব লাভে বঞ্চিত হয়, যেমন ইংরেজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের ভাষা এই মহাকবির ভাষা; ধ্বনি রেখা রঙের অমৃত রসায়ন।—

বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবাণবিদ্ধ বাল্মীকিরে।...
শঙ্খশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।...
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।...
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

কিছুই আশ্চর্য নয় যে, পূর্বভারতের অপভ্রংশের এই মহাকবি পনেরো শতাব্দীর ব্যবধান ভেদ ক'রে উজ্জয়িনীর মহাকবির হাতে হাত মিলিয়েছেন।

কালিদাস বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে মানুষের চিত্তকে ব্যাপ্ত করেছেন। তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ভাব ও রসের নিবিড় মিলন ঘটেছে। এইখানে কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকটতম আত্মীয়তা। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিগূঢ় যোগের যে রসমূর্তি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ফুটে উঠেছে, পৃথিবীর সাহিত্যে তা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এ সম্পর্কে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম ইংরাজী কাব্যরসিকের মনে হয়। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে যোগ, তা প্রধানত তত্ত্বের যোগ, রসের যোগ নয়—প্রকৃতির সঙ্গে ভাবের কারবারে কবির মন কতদিক থেকে কতখানি পুষ্ট হচ্ছে তার হিসাব। এর আস্বাদ বিভিন্ন। যুগল-মিলনের যে মধুর রস রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ব'য়ে যাচ্ছে এ রস সে অমৃত-রস নয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে ভাবৈকরসত্ব মানুষের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেয়, বিশ্বপ্রকৃতির সুর মানুষের মনের বীণায় বাজাতে থাকে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের বাহিরে কালিদাসের কাব্যেই তার সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের অতীত ও বর্তমানের এই দুই মহাকবি এইখানে পরস্পরের একমাত্র আত্মীয়।

কালিদাসের কাব্য ও সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আর একটি যোগ এমন প্রকট নয়, কিন্তু প্রচ্ছন্ন নাড়ীর যোগ। সে হচ্ছে, এই কাব্যের একটা আভিজাত্যের সংযম। মহাভারতে, রামায়ণে, সমস্ত ভাব রস ও বৈচিত্র্যকে একটা গভীর শান্তরসে ঘিরে আছে, যা সমস্ত রকম আতিশয্য ও অসংযমকে লজ্জা দেয়। তার অর্থ নয় যে, এ সব কাব্যের ভাব গতানুগতিক কি রসবৈচিত্র্যহীন। কালিদাস কবিপ্রসিদ্ধির ধার-করা চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখেন নি, সংস্কারহীন কবির চোখেই দেখেছেন। বহু রসের বিচিত্র নবীন লীলায় তাঁর কাব্য ঝলমল্ করছে। কিন্তু তাঁর কাব্য কখনও সংযমের ছন্দ কেটে সৌন্দর্যের যতিভঙ্গ করে না। ইউরোপীয় অলংকারের ভাষায় কালিদাসের কাব্যে 'ক্লাসিসিজ্‌ম্' ও 'রোমান্টিসিজ্‌ম্'-এর অপূর্ব মিলন

ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা এই মিলন-পন্থী। পৃথিবীর 'লিরিক' কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সম্ভবত সবার উপরে। মানুষের মনের এত অসংখ্য ভাবের রসের পরিপূর্ণ রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। প্রাণের প্রাচুর্যে তাঁর কাব্য কানায় কানায় ভরা। কিন্তু সমস্ত লীলা ও গতিকে অন্তরের একটি গভীর অটলতা, নটরাজের মূর্তির মতো চিরসুন্দরের ছন্দে গড়ে তুলেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সমধর্মী। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে যে কাব্য-সাহিত্যের সবচেয়ে প্রভাব ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর সেই ইংরেজী কাব্য বরং এর পরিপন্থী। এ কাব্যে ভাব ও প্রাণের বন্যা বহু স্থানেই রসের সীমাকে ভাসিয়ে অদৃশ্য করেছে। দুই তটরেখার মধ্যে কূলে কূলে পূর্ণ নদীর যে রূপ তা এ কাব্যে কচিৎ দেখা যায়। কারণ বন্যা যখন নেমে গেছে তখন জল শুকিয়ে চর দেখা দিয়েছে, যেমন টেনিসনের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের অনতিপূর্ববর্তী বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এই ইংরাজী কাব্যের ভাবাতিশয্যের প্রভাব অতিমাত্রায় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য যে এ থেকে মুক্ত তার কারণ তাঁর প্রতিভার ধর্মবৈশিষ্ট্যের 'পরেই সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাসের প্রভাব।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উপর সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব কোথাও তাঁকে তার অনুকরণে রত করে নি। এ প্রভাব তাঁর প্রতিভার জারক রসে জীর্ণ হয়ে স্বতন্ত্র নব সৃষ্টির রস জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংস্কৃত কাব্যের সুর, ধ্বনি, ভাব ছড়ানো রয়েছে; কিন্তু তার আস্বাদ সংস্কৃত কাব্যের স্বাদ নয়। নব প্রতিভার নবীন রসায়নে তা থেকে নূতন রসের সৃষ্টি হয়েছে।

২.

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা সংস্কৃত কবি ও কাব্যের কবিতা; যেমন 'মেঘদূত', 'ভাষা ও ছন্দ', 'সেকাল', 'কালিদাসের প্রতি', 'কুমারসম্ভব গান'। এ কবিতাগুলি এক অভিনব কাব্য-সৃষ্টি। এগুলি কাব্য বা কবিকে শ্রদ্ধা, প্রীতি বা প্রশংসার অঞ্জলি নয়, যেমন কীটস-এর On Looking into Chapman's Homer, কি রবীন্দ্রনাথের নিজের 'যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে।' বস্তুর জগৎ কবির চিত্তকে রসসমাহিত করে কাব্যের জন্ম দেয়; এখানে কবি ও কাব্যের জগৎ রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে ঠিক তেমনি রসাবিষ্ট করে এই অভিনব শ্রেণীর কাব্যের জন্ম দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কালিদাসের 'মেঘদূত' পড়ে কবি চিত্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস নয়। মেঘদূত ও তার কবি

রবীন্দ্রনাথের অনুকূল কবি-কল্পনাকে যে-দোল দিয়েছে এ তারি ফলে নূতন রসসৃষ্টি। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাও ঠিক তাই। বাল্মীকির রামচরিত রচনার যে-কাব্যে রামায়ণের আরম্ভ, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় তা এক নতুন রসমূর্তি নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কাব্য যে কোথাও সংস্কৃত কাব্যের প্রতিচ্ছবি তা মনে হয় না, মনে হয় সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি, তার কারণ, এসব কাব্যের কবির মন ও দৃষ্টি এখানেও রবীন্দ্রনাথের মন ও দৃষ্টির সীমরেখা নয়। তাঁদের কাব্যের পথেই রবীন্দ্রনাথের চোখ ও মন সেই বস্তু ও ভাবে গিয়ে পৌঁছেছে যা তাঁদের কাব্যের মূল উপাদান। সেই উপাদানকে নিজের প্রতিভার ছন্দে ও রঙে নতুন করে গড়ে তুলেছে। 'মেঘদূত' কবিতার যে অংশটা বাহ্যত কালিদাসের মেঘের যাত্রাপথের সংক্ষেপ মাত্র সেখানেও এর পরিচয় পাওয়া যায়।—

কোথা আছে<br>
সানুমান আম্রকূট, কোথা বহিয়াছে<br>
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে<br>
উপলব্যথিতগতি, বেত্রবতীকূলে<br>
পরিণত ফলশ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে<br>
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে<br>
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;

এ মেঘদূত, কিন্তু ঠিক মেঘদূত নয়। কালিদাস আঙুল তুলে যে দিকে দেখিয়েছেন কবি সেই দিকেই চেয়েছেন, কিন্তু দেখেছেন নিজের চোখে, 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায়—

বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম ;<br>
কাহার চরিত্র ঘেরি' সুকঠিন ধর্মের নিয়ম<br>
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,<br>
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,<br>
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,<br>
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,<br>
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম<br>
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম····

রামায়ণের রামচরিত্রই বটে। কিন্তু আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি-নারদ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ঠিক এ জিনিষ পাওয়া যাবে না।

৩.

মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের প্রসঙ্গ ও উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কাব্যের উপাদান। প্রাচীন ভারতবর্ষের এই বিশাল ও মহান সাহিত্য তাঁর কবিচিত্তের অনেকখানি জুড়ে আছে, কিন্তু এখানেও তাঁর প্রতিভা যা সৃষ্টি করেছে তা নতুন সৃষ্টি। এইসব কাব্যে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক সুপরিচিত পাত্র ও পাত্রীর উপর যে কল্পনার আলো ফেলেছেন তাতে মনে হয় যেন 'নতুন লোকে' তাদের সঙ্গে 'নতুন করে শুভদৃষ্টি হলো।' 'গান্ধারীর আবেদন' ও 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এ রবীন্দ্রনাথ, ব্যাস যে রসের সৃষ্টি করেছেন, তার ধারা ধরেই মহাভারতের এই চরিত্রগুলির একেবারে অন্তস্তলে পাঠককে নিয়ে গেছেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের মুখে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কথা দিয়েছেন, কর্ণ ও কুন্তীকে দিয়ে যা বলিয়েছেন তার অনেক কথাই মহাভারতে নেই। কিন্তু সে-সবই যে মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী, কর্ণ ও কুন্তীর মুখের কথা তাতেও সন্দেহ নেই। এসব চরিত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিজের কল্পনায় একেবারে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। এবং তাঁর কাব্যে এদের নতুন কথা ও নতুন কাজ অত্যন্ত পরিচিত লোকের স্বাভাবিক কথা ও কাজ মনে হয়।—

> হের দেবী, পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
> জ্বলিয়াছে দীপালোক, এ পারে অদূরে
> কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বক্ষুরে
> খর শব্দে উঠিছে বাজিয়া।—

মহাভারতে নেই। কিন্তু মহাভারতের যুদ্ধপর্বগুলিতে আসন্ন যুদ্ধের যে ভীষণ-রস পুনঃ পুনঃ ফুটে উঠেছে এ তারি রূপ।

'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপ' মহাভারতের অতি সামান্য ভিত্তির উপর কবির সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি। এ দুই কাব্যের যে রস তার সঙ্গে মহাভারতের উপাখ্যান দুটির সম্পর্ক নেই। এখানে পৌরাণিক চরিত্র ও আখ্যান কবির কল্পনাকে জাগায় নি, কবির কল্পনাই এদের আশ্রয় করেছে। এ দুই জায়গায় তবুও গল্পের এক-একটা কাঠামো ছিল ; কিন্তু রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান থেকে যে 'পতিতা'র কল্পনা তা রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব।

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আধুনিক বাংলায় কাব্য-রচনার কথায় স্বভাবতই মাইকেলের কথা মনে হয়। 'মেঘনাদবধ' ও 'তিলোত্তমা'র বাহ্যিক গড়ন, সংস্কৃত ক্লাসিক কবিরা পৌরাণিক উপাখ্যান নিয়ে যে সব

কাব্য রচনা করেছেন, ঠিক সেই গড়ন। এবং এই দুই কাব্যের অন্তরের মিলও ঐ ক্লাসিক কবিদের কাব্যের সঙ্গে। পুরাণ থেকে আখ্যানবস্তু নেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু তার ঘটনা কি চরিত্র কবির চিত্তের রসের তাতে খুব জোরে ঘা দেয় নি। কাব্য-সৃষ্টিতে কবি যে-কল্পনা এনেছেন তা পুরাণ-প্রসঙ্গকে অতিক্রম ক'রে পাঠককে রসের একটা সম্পূর্ণ নতুন লোকে নিয়ে যায় না। এ কাব্য পৌরাণিক আখ্যানের ঘরেই থাকে, কিন্তু 'পেইং গেস্ট'। রবীন্দ্রনাথ থাকেন বাহিরে, কিন্তু তিনি ঘরের লোক। বাড়ী যখন আসেন, তখন একেবারে অন্তঃপুরে যেয়ে উপস্থিত হন। 'বীরাঙ্গনা'য় বিদেশী কবির কল্পনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাইকেল অতি সূক্ষ্ম পৌরাণিক সূত্র ধরে অভিনব রসসৃষ্টি করেছেন। এ কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপ'-এর সমশ্রেণীর কাব্য। স্বাদের যে তফাৎ সে হচ্ছে দুই বিভিন্ন প্রতিভার সৃষ্টির প্রভেদ।

৪.

রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্য-সৃষ্টির ধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সঙ্গেই একমাত্র নিজেকে মেলাতে পারে। তাঁর কাব্য সেই-জন্য তাকেই স্মরণ করায় যিনি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কল্পনায় উজ্জয়িনীর রাজকবি ছিলেন না, কৈলাসের প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের আপন কবি ছিলেন; যাঁর কাব্য পাঠের শেষে নিজের কান থেকে বই খুলে গৌরী কবির চূড়ায় পরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।

# বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডি

## মোহিতলাল মজুমদার

১.

পাশ্চাত্ত্য কবিমণ্ডলের মহাকবির সেই বচন 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'—আমরা প্রায়ই উচ্চারণ করি, তার কারণ, কথাটা বড় সত্য। কথাটার অর্থ যদি এই হয় যে, যে-গানে দুঃখের ভার যত গভীর সেই গান তত মধুর, তাহা হইলে মানুষমাত্রেই যে তাহাতে সায় দিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ দুঃখের বার্তা কি ধরণের বার্তা—গানে যাহা এত মধুর হইয়া ওঠে? নিশ্চয় তাহাতে কোন প্রবল দ্বন্দ্বসংঘাত বা ঝড়ঝঞ্ঝা নাই, মানুষের আত্মঘোষণা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার সহিত কোন সম্পর্ক তাহাতে নাই; জনতা নাই, কোলাহল নাই। তাহাতে আছে কেবল একটি ব্যথা, সে যেন সন্ধ্যার করুণ ছায়ালোকে নিঃসঙ্গ-বিধুর হৃদয়ের দিনান্ত-স্মৃতি; জন্মান্তর-স্মৃতির মতই সে যেন একটা অস্ফুট অথচ তীব্র বিরহব্যাকুলতা—ভাবে ও অভাবে দ্বন্দ্ব। সে ব্যথা সান্ত্বনাহীন বটে, কিন্তু সে এমনই মধুর যে সান্ত্বনা পাইতে ইচ্ছা হয় না। আসল কথা, ইহা গীতিকাব্যের রস; কবি যে বলিয়াছেন, 'songs' বা গান, ইহা সেই গানের রসবস্তু। যেহেতু সাহিত্য জীবনেরই রস-রূপকে নানা আকারে আমাদের হৃদ্‌গোচর করে, এবং যেহেতু মাধুর্যই রস, সেইহেতু কবির ঐ বচনটি এই অর্থে সত্য যে সকল উৎকৃষ্ট কাব্যের মর্মস্থলে ঐ করুণ সুরটি থাকিবেই—থাকেও। এই পর্যন্ত আমরা সকলেই বুঝি; যাঁহারা উঁচুদরের রসিক তাঁহারা, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতির ভিতরেও ঐ এক রসই আস্বাদন করিয়া থাকেন; তথাপি ঐ বিশেষ রসটিই আমাদের অধিকতর প্রিয়—উহা শুধুই আমাদের রসবোধকে নয়, হৃদয়কেও গভীরভাবে চরিতার্থ করে। কিন্তু ইহাতেও কাব্যহিসাবে ইতর-বিশেষ আছে, আছে বলিয়াই পাশ্চাত্ত্য সমাজে নাটকের আকারে এক নূতন কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই কাব্যের নাম 'ট্র্যাজেডি'। ইহা দুঃখেরই নাটকীয় রসরূপ। গানে আমরা দুঃখকে অনুভব করি মাত্র, নাটকে তাহাকে দেখি। এই যে প্রভেদ ইহা

একটি বড় প্রভেদ। অনুভূতিতে কোন প্রশ্ন নাই, একটা ভাবাবস্থা আছে; গানে একটা অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, একটা সামান্য পরিস্থিতি, কিম্বা মন বা প্রাণের একটা বিক্ষোভকে আশ্রয় করিয়া ঐ ভাবাবস্থার সৃষ্টি করিতে পারিলেই হইল; সে যেন জীবন-সমুদ্রের কূলে বসিয়া বাঁশী-বাজানো; ঝটিকাক্ষুব্ধ তরঙ্গ-কল্লোল দূর হইতে একটা সুরের মত ভাসিয়া আসে—বাঁশী সেই সুরেই ভরিয়া উঠে। কিন্তু নাটকে আমরা সেই ঝটিকাগর্জন ও তরঙ্গভঙ্গের অতিশয় নিকটে, এমন কি, মধ্যে গিয়া দাঁড়াই, সেখানে দুঃখের যে মূর্তি দেখি তাহা ভাবমূর্তি নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তব-রূপ। তাহাতে শুধুই সুর নয়, একটা প্রবল ধাক্কা আছে; কেবল রসাস্বাদ নয়—আক্ষেপ আছে, প্রশ্ন-কাতরতাও আছে। এ রসের নাটকীয় রসসৃষ্টি কেন যে অতিশয় বিশিষ্ট কবিশক্তি-সাপেক্ষ তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি; আবার জীবনের ঐ দুঃখ-রূপটাকে যে-নাট্যকলায় পাশ্চাত্য কবিগণ একটা নূতন অর্থে নূতন ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই ট্র্যাজেডিই যে সে সাহিত্যের একটা অনর্ঘ ও অপরূপ সৃষ্টি, তাহাও বলিয়াছি। এবার, ঐ ট্র্যাজেডি আমাদের সাহিত্যে কেন যে তেমন প্রসার লাভ করে নাই, এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কি অর্থে কতটুকু করিয়াছে, তাহারই একটু বিস্তারিত আলোচনা করিব।

এই প্রবন্ধে আমি ট্র্যাজেডি শব্দটি, সঙ্কীর্ণ ও ব্যাপক দুই অর্থেই গ্রহণ করিব, দুইটিই সমান আবশ্যক, যেহেতু এখন সেই শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা অপেক্ষা, জীবনে ও সাহিত্যে এই শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়; তার কারণ, দুঃখের সেই রূপকে আমরা এক্ষণে জীবনের নানা স্থানে খণ্ড-আকারেই দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি—জীবনেই হোক আর সাহিত্যেই হোক, যেখানে ঐরূপ পরিণাম দৃষ্টিগোচর হয় সেইখানে আমরা তাহার নাম দিই ট্র্যাজেডি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, এবং য়ুরোপীয় জীবন-দর্শনের প্রভাবে, আমরাও উহাকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিতে শিখিয়াছি, এজন্য আমাদের ভাষায় উহাকে একটা নাম দিবার প্রয়োজন ক্রমেই বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নাম এখনও দিতে পারি নাই, ঐ বিলাতী নামটাই ব্যবহার করিতেছি।

ইহার কারণ কি? বাংলা ভাষার দারিদ্র্য? সংস্কৃত ভাষা ত দরিদ্র নয়। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় যে, ঐ 'ট্র্যাজেডি' বলিতে মূলে যাহা বুঝায় তাহার সেই বিশুদ্ধ রস আমরা এখনও আয়ত্ত করিতে পারি নাই,

না পারিলে ভাষায় তাহাকে নির্দেশ করিব কেমন করিয়া? ভাষার সহিত জাতির অন্তঃ-প্রকৃতির যোগ এমনই। আমাদের প্রাণ, মন ও আত্মার যে একটি বিশিষ্ট ধাতু বা গঠন আছে তাহার বিরোধী কোন ভাব অন্তর-গভীরে প্রবেশ করিলেও আমরা যে তাহাকে আমাদের সমগ্র সত্তা দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না, তাহার একটি প্রমাণ, ঐ পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির সহিত এত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহার একটা দেশী নাম এখনও স্থির করিতে পারি নাই। আমাদের ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কারে, যে একটি অনুভূতি-মার্গ আমাদের চিত্তে তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, তাহাতে করুণ-রস আমাদের পক্ষে সহজ হইলেও, কোন ঘটনার নিষ্ঠুর পরিণাম আমাদিগকে তেমন অভিভূত করে না,—জীবন ও জগৎ, আত্মা ও পরকাল সংক্ষে আমাদের এমন একটা সংস্কার আছে যে, আমরা কোন দুঃখকেই চূড়ান্ত বলিয়া মনে করি না। সব ঠিক আছে, কোনখানে অনিয়ম বা অবিচার নাই; কোন দুঃখই অমূলক বা অসঙ্গত নয়; এমন কি, জ্ঞানে কিংবা ভক্তির দৃষ্টিতে দেখিলে দুঃখ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। আমরা কাঁদি বটে, সেটা জীব-ধর্ম, কিন্তু সেই ক্রন্দনেও সান্ত্বনা আছে। এই সান্ত্বনার প্রয়োজন আমাদের প্রকৃতিতে, সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে, অতিশয় দৃঢ়মূল হইয়া আছে।

য়ুরোপীয় সংস্কার ইহার বিপরীত, তাহাতে দুঃখটা অতিশয় সত্য, উহার শক্তি অপরিসীম, ভগবানও সেই শয়তানের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। ঐ শক্তি এমনই দুর্জয় যে, যিশুখ্রীস্টের মত মহাপুরুষকে—সেই ঈশ্বরপুত্রকেও—ইহার হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে; তাঁহার সেই ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ, মৃত্যু-যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখমণ্ডল, অর্ধমুদিত দীপ্তিহীন স্থির অক্ষিতারকা য়ুরোপকে একটা দুঃস্বপ্নের মত অভিভূত করিয়াছে—খ্রীষ্টের সেই নিষ্ঠুর মৃত্যু ও তাঁহাকে যেমন মহিমান্বিত করিয়াছে, তেমনি জগতের দুঃখ-রূপটা তাহার চেতনায় দৃঢ়মূল হইয়া আছে। দুঃখ যেমন তাহাকে মুগ্ধ করে এমন আর কিছুই নয়; মনে হয়, এইজন্যই সে নিষ্ঠুরতা এত ভালবাসে। তাহার প্রকৃতি মূলে অখ্রীষ্টান; খ্রীষ্টের সেই বাণীকে, তাঁহার সেই আত্মাহুতির অন্তরালে যে অপার অন্তহীন করুণা উদ্বেল হইয়া আছে—তাহাকে সে সহজে আত্মসাৎ করিতে পারে না; করুণাকে এখনও সে তাহার জীবনে সহজ করিয়া তুলিতে পারে নাই। সেই দুঃখ তাহাকে কোমল না করিয়া আরও কঠিন করিয়া তোলে, তাহার আত্মাভিমানকেই জাগ্রত ও উদ্ধত করে। সেই দুঃখ সেই যন্ত্রণা সহ্য করিবার

যে শক্তি তাহাই মানুষের পৌরুষ ; তাই নাটকে উপন্যাসে ঐ দুঃখ মানুষের চক্ষে কেবল অশ্রুর ধারাই বহাইবে না—তাহার সকল হীনতা ও দীনতাকে তিরস্কৃত করিয়া, চিত্তে একটি কঠোর তৃপ্তি ও প্রশান্তির উদ্রেক করিবে। এই রসই ট্র্যাজেডির রস।

এ রস আমাদের ভারতীয় বা হিন্দু সাহিত্যের রস নয়, আমরা জীবনেও এ রসকে প্রশ্রয় দিই না। তাহার কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, ইহা একরূপ দুঃখেরই পূজা। মানুষের মাহাত্ম্য-বোধের জন্য দুঃখকেই একান্ত করিয়া দেখিতে হইবে ; জীবন ও জগতের কোন গভীরতর অর্থ—সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যুর সমন্বয়মূলক কোন সত্যের পিপাসা ইহাতে নাই। ভারতবর্ষের মানুষ দুঃখকে, মৃত্যুকে বা আনন্দকে—অমৃতকেই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, তাই কপিল বুদ্ধও হার মানিয়াছেন। ট্র্যাজেডি-নামক এই কাব্য-কুসুমের মূল ভারতীয় চিত্তভূমিতে নাই। দুঃখকে সে অস্বীকার করে না—কোন মানুষই তাহা পারে না ; কিন্তু আমার অজেয় বীর্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বা ধ্বংসই যে সর্বগ্রাস করিবে, এখানকার মানুষ তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না বলিয়াই ঐরূপ ট্র্যাজেডি তাহার নিকটে অমূলক ; কাব্যে নাটকেও সে মৃত্যুর মহাগহ্বর পূর্ণ করিয়া দেয়, অমূলক ও অর্থহীন বলিয়াই সে ঐরূপ কাব্যরসকে পরিহার করিয়াছে।

২.

এইবার কিছু উদাহরণ ও তুলনা দ্বারা কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। একদা আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে, য়ুরোপীয় কাব্যের ঐ ট্র্যাজেডি এবং ভারতীয় ভাবকল্পনার দুর্ধর্ষ আইডিয়ালিজ্‌ম—এই দুইয়েরই দুইটি দৃষ্টান্ত আমাকে যেমন মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল, আজও তেমনই করে। একটি ভিক্টর হুগোর অমর রোমান্স—*Toilers of the Sea* এই উপন্যাস প্রেম বা যৌন-পিপাসার একখানি চূড়ান্ত ট্র্যাজেডি, শেক্সপীয়রের 'রোমিও ও জুলিয়েট' ইহার তুলনায় প্রেমের শৈশবলীলা মাত্র। উপন্যাসের আকারে এই যে ট্র্যাজেডি ইহাতে কবি প্রেমের পৌরুষ ও প্রেমের আত্মত্যাগ দুইয়েরই পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এবং ট্র্যাজেডির যে অবিচ্ছেদ্য লক্ষণ, সেই ধ্বংস বা মৃত্যু ইহার কাব্যরসকে মর্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে প্রেমের মাহাত্ম্য, অপর দিকে মানব-ভাগ্যের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা এই কাব্যে এমনই সূক্ষ্ম অথচ গভীর

রেখায় চিত্রিত হইয়াছে, ঐ কাব্য পড়িয়া আমার রসপিপাসু তরুণ মন অভিভূত হইয়া পড়িল। হুগোর কল্পনাশক্তি ও কলাকৌশলের কথা আপনারা জানেন, তাহা এমন একটি লিরিক রসতীব্রতা ও আর্টের প্রয়োগনৈপুণ্য লাভ করিয়াছে যে, আমি এখনও মনে করি, এই কাব্যখানি ফরাসী মহাকবির একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। আমি নিজে এইরূপ কাব্যরসেরই পক্ষপাতী; য়ুরোপীয় কাব্যকলা আমাকে যেমন মুগ্ধ করে, ভারতীয় সাহিত্য তেমন করে না—এ দুর্বলতা আমি স্বীকার করি। ঐ যে দেহের বেদীর উপরেই অতিশয় সুস্থ ও সবল বাসনা-কামনার শতশিখাময় হোমানল, আমার মন পতঙ্গের ন্যায় তাহারই অনুরাগী; য়ুরোপীয় কাব্যে মানুষের পৌরুষ এবং প্রবুদ্ধ জীবনচেতনার আত্মঘাতী ক্ষুধা, যে রসধারা প্রবাহিত তাহার তুলনায় আমাদের কিই বা আছে? একথা আজও স্বীকার না করিয়া পারি না। কিন্তু ইহাও বুঝি—ভারতীয় কাব্য যেমনই হৌক, ভারতবর্ষের জীবন-দর্শন আরও গভীর, আরও সত্য—সত্য, অর্থাৎ খণ্ড নয়, সম্পূর্ণ। এই দৃষ্টি এমনই যে, তাহাকে দেহের বা মনের ভাষায় রূপ দেওয়া যায় না; অন্যান্য কলাতেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনই, সেই অপার্থিব তত্ত্বরসপিপাসা হেলেনীয় আদর্শে, কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় হইলেও আমি বাঙালী; তাই আত্মার সঙ্গে দেহ, তত্ত্বের সঙ্গে রূপ না হইলে আমার চলে না; ইন্দ্রিয় বা দেহকেই আমি সেই পরমদেবতার অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া জানি, আমিও বলি—

> Here in the flesh, within the flesh, behind,
> Swift in the blood and throbbing on the bone,
> Beauty herself, the universal mind,
> Eternal April wandering alone;
> The God, the holy Ghost, the atoning Lord,
> Here in the flesh; the never yet explored.

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। ভারতীয় জীবন-দর্শনই স্বতন্ত্র; তাহাতে রসও সেই বস্তুর আস্বাদন, যাহাতে দেহ ও মনের বন্ধন ঘুচিয়া একটি অপূর্ব মুক্তি-সুখের উদয় হয়। ভারতীয় কাব্যরসিক বলিবেন, এরূপ ট্র্যাজেডি অকারণ চিত্তবিক্ষেপকর, উহা রস হইতে পারে না; ঐ প্রেমও একটা পিপাসা, সেই পিপাসার জয়গান করিবার জন্যই, যাহা মিথ্যা—সেই মৃত্যুকে মহিমান্বিত করা হইয়াছে। কাব্যকলার ক্ষেত্রে আমি ইহা স্বীকার করিয়াও করি না—কেন,

তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু ঐ উপন্যাসখানি পাঠ করার পরেই একখানা বাংলা মাসিকপত্রে আমি দুইটি প্রাচীন ভারতীয় উপকথা পাঠ করিয়াছিলাম; লেখকের বা প্রবন্ধের নাম মনে নাই; কিন্তু সেই দুইটি কাহিনীতে প্রেমের যে আদর্শ ঘোষিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আজও চমকিত হই। দুইটির একটি আজিও স্পষ্ট মনে আছে। তাহাই স্মৃতি হইতে সংক্ষেপে বলিব। গল্পের ভঙ্গিও সেই প্রাচীন ভারতীয় ভঙ্গি—সেই বেতাল বা ব্রহ্মপিশাচের প্রশ্ন; এই ভঙ্গি এ গল্পের বড়ই উপযোগী হইয়াছে। গল্পটি এই।

দক্ষিণদেশে যে বিশাল অরণ্য আছে, সেই অরণ্যে একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। পশুপক্ষী জীবজন্তু জলের সন্ধানে দিক্-বিদিকে ছুটিয়া শেষে দলে দলে মরিতে আরম্ভ করিল। ঐকালে এক মৃগদম্পতি বহুদূর ভ্রমণ করিয়া যখন পিপাসায় কণ্ঠাগতপ্রাণ হইয়াছে তখন এক জলহীন নদীর শুষ্কখাতে গোষ্পদপরিমিত জল দেখিতে পাইল। সেই জলে কেবল একজনের পিপাসা নিবৃত্ত হইতে পারে, দুইজনের পক্ষে তাহা অতিশয় অপর্যাপ্ত। একজনের পরিবর্তে অপরে কিছুতেই সে জল পান করিবে না; উভয়ে উভয়কে তাহা পান করিয়া নিজ প্রাণরক্ষা করিতে বহু মিনতি করিল। যখন কিছুতেই কেহ তাহা করিবে না, তখন মৃগ মৃগীকে বলিল যে, যেহেতু সে তখন অন্তঃসত্ত্বা, তাহার জীবনে দুইটি জীবন রক্ষা পাইবে, অধিকন্তু সন্তান-হত্যার পাতক হইবে না,—তখন অগত্যা চরম শাস্তি বহন করার মতই মৃগী সেই জল পান করিয়া জীবন রক্ষা করিল, মৃগ প্রাণত্যাগ করিল। গল্পটি বলিয়া ব্রহ্মপিশাচ রাজসভার পণ্ডিতগণকে প্রশ্ন করিল—ঐ মৃগদম্পতির মধ্যে কাহার প্রেম অধিক? প্রশ্নে প্রকৃত উত্তর না পাইলে সে ঐ সভার যে-কোন একটিকে তাহার দীর্ঘ উপবাস-ব্রতের পারণার্থে ভক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিবে! পণ্ডিতেরা কেহই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না; কেহ যুক্তিসহকারে, মৃগের, কেহ বা মৃগীর প্রেম গরীয়ান বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। ব্রহ্মপিশাচ উভয় পক্ষের উত্তর অট্টহাস্যে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের একটিকে ভোজন করিবার অনুমতি চাহিল। রাজা পণ্ডিতগণের এই অক্ষমতা দর্শনে নিজেই লজ্জায় অধোবদন হইয়াছিলেন; ব্রহ্মপিশাচের প্রস্তাবে তিনি প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, এখন আর সত্যভঙ্গ করিতে পারেন না। রাজার এই উভয় সঙ্কটে তাঁহাকে উদ্ধার করিল আর এক সভাসদ; তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্বর্ণদণ্ডে যে শুক পক্ষী বসিয়াছিল, সেই মহাজ্ঞানী, জাতিস্মর, বাকশক্তিসম্পন্ন শুক ব্রহ্মপিশাচকে নিরস্ত করিয়া গভীর

কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এই সামান্য প্রশ্নের মীমাংসায় এত বাদানুবাদের প্রয়োজন কি? ঐ মৃগদম্পতির কেহই সত্যকার প্রেমিক নহে, যদি হইত তবে কাহারও মৃত্যু হইত না। একজনের উপযুক্ত জলই যথেষ্ট; সেই জল তাহাদের একজন পান করিয়া বাঁচিবে, আর একজন অপরের সেই প্রাণরক্ষার আনন্দেই বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাকে আর পৃথক জল পান করিতে হইবে না—সেই আনন্দেই অমৃত। ইহাই প্রেমের ধর্ম, যেখানে প্রেম আছে সেখানে মৃত্যু নাই। ঐ মৃগদম্পতির মধ্যে প্রেম ছিল না, ছিল কেবল একটা প্রবল আসক্তি, তাই তাহা জীবধর্মের উপরে উঠিতে পারে নাই।

এই গল্প হইতে আপনারা ভারতীয় চিন্তার দুর্ধর্ষ আইডিয়ালিজ্‌ম্ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন; গল্পটি বাস্তবের দিক দিয়া মিথ্যা হইলেও ভাবের দিক দিয়া মিথ্যা নহে। মৃত্যুর হাত হইতে স্বামীকে ছাড়াইয়া লওয়ার যে পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে, সেই সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ সকল হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, ভারতবর্ষ জীবনের বাস্তবকেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করে নাই; সেই বাস্তবকে ভেদ করিয়া, প্রকৃতি ও নিয়তির অন্তরালে একটা বৃহত্তর কিছুর দর্শন লাভ না করিয়া সে ক্ষান্ত হয় নাই। জীবনের নাট্যশালায় যে অভিনয় সে দেখে তাহাতেই সে সন্তুষ্ট নয়—নেপথ্যশালার সুগভীর রহস্যই তাহার রসবোধকে সর্বদা সচেতন করিয়া রাখে।

এইজন্য আমাদের আধুনিক নাটকে ইউরোপের অনুকরণে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিতে গিয়া আমরা করুণ রসাত্মক গীতিনাট্যই রচনা করিয়াছি। তাহাতে নায়ক বা নায়িকার চরিত্র এমন হওয়া চাই, যাহাতে আমরা তাহাদের গলা ধরিয়া কাঁদিতে পারি; দুঃখের অতি কঠিন রূপও করুণ রসে বিগলিত হইয়া পুরুষের পৌরুষকেও যেন বিকার দেয়। তাহাতে মানুষের ভাগ্য বা অদৃষ্টের পীড়ন থাকিলেও তাহার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহ নাই, সে দুঃখের কারণ সম্বন্ধেও কোন গুরুতর ভাবনা নাই, থাকিলে সে চরিত্র আমাদের রসবোধকে তৃপ্ত করিবে না। য়ুরোপীয় আদর্শে ট্র্যাজেডি রচনা করিতে গিয়া আমরা করুণরসাত্মক দৃশ্যকাব্য রচনা করিয়াছি।

তথাপি আমাদের সাহিত্যে এককালে ঐ য়ুরোপীয় রোমান্টিক নাটক ও কাহিনী প্রভৃতির একটা বড় ধাক্কা লাগিয়াছিল, আমাদের কবি ও নাট্যকারগণ হঠাৎ খুব রোমান্টিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এককালে কত উপাখ্যান যে রচিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব আজ পাওয়া যাইবে না। উপন্যাসে ব্যর্থ-

প্রেমের হৃদয়বিদারক হা-হুতাশ আমাদের অতি ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী যৌবনকে স্বপ্নাতুর করিয়া তুলিল। প্রেমের অপূরণীয় কামনা ও তাহার নৈরাশ্য আমাদের কাব্যগুলিকে একরূপ ট্র্যাজেডি-রসে উচ্ছলিত করিয়াছিল। সেই সকল কাব্য-উপন্যাস যে সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়াছে, তাহার কারণ, আমরা য়ুরোপীয় কাব্যে যে-রসের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, নিজেদের সাহিত্যে তাহা সৃষ্টি করিতে পারি নাই। সেই বিদেশী কাব্যের রস এমনই যে, তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও চঞ্চল করিবেই; কিন্তু সেই রস সৃষ্টি করিতে হইলে তাহাকে যে-ভাবে অন্তশ্চৈতন্যে আত্মসাৎ করিতে হয়, তাহা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই কেন, তাহাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি।

৩

আমাদের নব্যসাহিত্যে কেবল একজন মাত্র ঐ রসতত্ত্ব ও তাহার কলা-কৌশলকে যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এমন আর কেহ পারেন নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেই ঐ য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির রসপ্রেরণা এক নূতন ভঙ্গিতে ধরা দিয়াছে, ঐ গদ্য কথাকাব্যগুলিতেই আমরা রোমান্টিক ট্র্যাজেডির প্রায় সেই শেক্সপীয়রীয় কাব্যরস কিয়ৎ পরিমাণে আস্বাদন করিয়া থাকি। কিন্তু যেহেতু ঐরূপ ট্র্যাজেডি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার অনুকূল নয়, যেহেতু নবত্বের বিস্ময়ই আমাদের রসবোধের একমাত্র মাপকাঠি এবং যেহেতু বাংলা সাহিত্য এ পর্যন্ত পণ্ডিতের অনুকম্পা ও মূর্খের বিলাসব্যসনের অতিশয় সুখকর স্থান হইয়া আছে, সেইজন্য—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কাব্যগুলির নবত্ব লোপ হওয়ায়, তাহারা পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়গোত্রীয় পাঠকের পাঠশালা হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক সংজ্ঞা-অনুযায়ী উপন্যাস রচনা করেন নাই, অতএব সেদিক দিয়া উহাদের কোন পরিচয় যথার্থ হইতে পারে না; তিনি যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে হইলে উৎকৃষ্ট রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শেই তাহা করিতে হইবে এবং তাহাতেও তাঁহার নিজস্ব প্রেরণা ও কল্পনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এখানে সে অপ্রাসঙ্গিক। আমি আমাদের সাহিত্যে ট্র্যাজেডির অস্তিত্ব ও প্রসারের কথাই বলিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ য়ুরোপীয় কাব্যরসকে অধিগত করিয়া তাঁহার উপন্যাসগুলিতেও সেই রস একরূপ নাটকীয় ভঙ্গিতে পরিবেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও

মধ্যপথে ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কারের বশবর্তী হইয়া সেই য়ুরোপীয় আদর্শ রক্ষা করিতে পারেন নাই বা চাহেন নাই। য়ুরোপীয় আদর্শেই তিনি তাঁহার ট্র্যাজেডির অঙ্গবিন্যাস করিয়াছেন সত্য; তিনিও দৈব অদৃষ্ট Villain বা দুর্বৃত্তের দুরভিসন্ধি, আত্মঘাতী প্রবৃত্তি বা দুর্দমনীয় বাসনা প্রভৃতির কারণে পুরুষের নিদারুণ পরিণাম চিত্রিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেইরূপ ট্র্যাজেডি-প্রীতিও ক্রমে সংযত হইয়া আসিয়াছে; মানুষের নিজ আত্মারই মহিমাবোধ—সব হারাইয়াও একটা উচ্চতর অধিকার বা মহত্তর সম্পদের আশ্বাস—প্রকৃতির সেই ছলনাকে অম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিতে পারা—ইহাই তাঁহার ট্র্যাজেডির গূঢ়তর প্রেরণা হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষ' পর্যন্ত তিনি য়ুরোপীয় আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন; 'কৃষ্ণকান্তের উইল' হইতে তাঁহার কল্পনা ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছে, যদিও 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহে' সেই য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডিই এক নূতন ছন্দে তাঁহার কল্পনাকে পুনরায় আশ্রয় করিয়াছে। কারণ, 'সীতারামে' সেই অতি ভীষণ অদৃষ্টের লীলা—প্রেমময়ী সাধ্বী স্ত্রীর মূর্তিতেই তাহার সেই যে নিষ্ঠুরতা ও সর্বনাশ-সাধন, এবং 'রাজসিংহে'ও পুরুষ-বীর মোবারককে প্রবৃত্তির ক্রীড়নক করিয়া তাহার জীবনেও দৈবের সেই অট্টহাস—কোন অধ্যাত্মনীতি বা ন্যায়নীতি দ্বারা সেই ট্র্যাজেডির অন্ধকার ভেদ করা যায় না। 'সীতারাম'—রচনাকালে বঙ্কিমকে কি পাইয়া বসিয়াছিল জানি না; বোধ হয় পুরুষ-ধর্ম বা আধ্যাত্মিক শক্তি এবং প্রাকৃতিক ধর্ম বা অন্ধপ্রবৃত্তি এই দুইয়ের কোনটাকে তুচ্ছ করিতে না পারিয়া—অথচ আধ্যাত্মিকতার প্রতি পক্ষপাতের বশে, তিনি এই কাব্যে যেন নিজের কাছেই নিজে হার মানিয়াছেন; আর কোন কাব্যে তিনি ধ্বংসের এমন বিরাট অগ্ন্যুৎসব সৃষ্টি করেন নাই। কে জানে, হয়ত এই কালে কবির ব্যক্তি-জীবনেও একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাই সর্বধ্বংসের এইরূপ কল্পনা বড়ই আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজেডিগুলিতে সাধারণত সেই খাঁটি য়ুরোপীয় প্রেরণার সংশোধনই লক্ষ্য করা যায়। তিনি মানুষের মহত্ত্বকে ধর্মবিশ্বাসের মতই বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু সে মহত্ত্ব তাহার নিজেরই নয়—একটা পরমাশক্তির অংশ বলিয়াই সে মহৎ; সেই শক্তির শাসন তাহার নিজেরই আত্ম-শাসন; দুর্বল হৃদয়ের যত কিছু মোহ—জীবন ও জগতের রঙ্গশালায় শত বর্ণে শত শিখায় স্ফুরিত হইতেছে; যাহা মূলে মিথ্যা তাহাই অপূর্ব চিত্রে চিত্রিত হইয়া

জীবনের যবনিকাখানিকে কি বিচিত্র, কি সুন্দর করিয়া তুলে। কবি বঙ্কিম এই মিথ্যাকেও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাকেই সর্বোপরি স্থান দেন নাই। সত্যই যদি শিব হয়, তবে ঐ মিথ্যাও শিবমোহিনী; শিবকে সম্মুখে রাখিয়াই তিনি ঐ শিবমোহিনীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ট্র্যাজেডিতে এই প্রকৃতির যে উপাসনা আছে তাহা অন্যরূপ, তাহার সম্মুখে শিব নাই—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রকৃতি মোহিনী হইলেও বরদাত্রী। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুকোমল ছায়াদ্বারে তাহার যে রূপরাশি পুরুষকে পরশ-বিভোল করে, তাহার রসও যদি আস্বাদন না করিলাম, তবে একটা অত্যাবশ্যক চিত্ত-কর্ষণ হইতেই বঞ্চিত হইলাম। ঐ সৌন্দর্যের জ্বালাও সেই সত্যের সোপান; কেবল আগুন নয়, আহুতির কথাও মনে রাখিতে হইবে; ঐ আহুতির পর যে হবিঃশেষ-ভোজন তাহাই ত' দেবতার সহিত যজমানের একত্ববিধান করে।

ইহার পর আমাদের উপন্যাসে ও কাব্যে আরও দুইজন বড় কবির আবির্ভাব হইয়াছে, একজন রবীন্দ্রনাথ, আর একজন শরৎচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ভিন্ন বস্তু, কিন্তু তাঁহার কাব্যে এককালে ট্র্যাজেডি-রচনার প্রয়াস আমরা দেখিয়াছি। প্রথম দুইখানি উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'তে—বিশেষত প্রথমখানিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবিপ্রকৃতি, তাঁহার অতিশয় স্বতন্ত্র মৌলিক প্রতিভা, কি উপন্যাসে, কি নাটকে, কোথাও ট্র্যাজেডি তথা নাটক সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করে নাই। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি এককালে 'রাজা ও রাণী' এবং 'বিসর্জন' নামে দুইখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই যৌবনাবেগরঙ্গীন কবিস্বপ্ন—তাঁহার চিত্ত-ফুলবনের সেই নন্দন-বসন্ত এক অপূর্ব গীতিরাগে উৎসারিত হইয়াছে। এখানে এই প্রসঙ্গে সেই কাব্যগুলির নাটকীয় গুণ-দোষ পরীক্ষা করিলে কাব্য ও কবির প্রতি অবিচার করা হইবে, তথাপি পাঠকপাঠিকার সুবিধার জন্য নাটক বা ট্র্যাজেডির লক্ষণ বুঝাইবার জন্য আমি সংক্ষেপে কিছু বলিব। নাটকে উপন্যাসে যে objectivity বা আত্মনিরপেক্ষ বিষয়-কল্পনা কবির প্রধান সম্বল, রবীন্দ্রনাথের মত কবির তাহা ছিল না, থাকিতে পারে না বলিয়াই ছিল না। এজন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি বাহিরের মানুষ না হইয়া তাঁহারই অন্তরের মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। 'বৌ-ঠাকুরাণী'র উদয়াদিত্য, 'বিসর্জনে'র জয়সিংহ, 'রাজা ও রাণী'র কুমারসেন, এমন কি রাজা নিজেও কবির আত্ম-প্রতিবিম্ব। এই কাব্যগুলির ভাবমণ্ডল বাস্তব

জীবন-রঙ্গভূমির এতই বহির্ভূত যে তাহাতে মানব-মানবীর প্রেম বা অপ্রেম রক্তমাংস-ঘটিত কোন সংগ্রামে নিযুক্ত হয় না, সে প্রেমও প্রাণের নয়—মনের কামনা। রবীন্দ্রনাথের খাঁটি লিরিক-প্রেরণা ট্র্যাজেডির হৃদয়যন্ত্রটাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই, ভিতরের সেই অগ্নিকুণ্ডকে—মনুষ্যচরিত্ররূপ দেহ-বাষ্পযানের সেই বয়লারটাকে, তিনি কাজে লাগাইতে পারেন নাই। নরদেহের শোণিত-শিরায় সেই জ্বালা তাঁহার কাব্যে প্রায় কোথাও নাই; সেই আগুনের দূর-বিম্বিত আভা আছে, সেই জ্বালার ভাবোদ্ধৃত কাব্যরস আছে। 'বিসর্জন' নাটকে গীতিকবির আত্মভাব প্রচার আরও অকুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কাব্যে অতিশয় ভাব-গম্ভীর কবিত্বও যেমন পুনঃ পুনঃ ঝলসিয়া উঠিয়াছে, তেমন কবির আত্মভাব প্রচারের দুর্দমনীয় আবেগে ইহার পাত্রপাত্রীগণ ভস্ম হইয়া গিয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিসর্জন' এই দুইখানি নাট্যকাব্যেই কবির কবি-যৌবন শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়াও, একটি আইডিয়ার বা মত-প্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত আগ্রহে নিজ ধর্ম লঙ্ঘন করিয়াছে। 'চিত্রাঙ্গদা'য় যেমন নারীর অধিকার-বাদ, 'বিসর্জনে'ও তেমনই একটা ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাই কবির কাব্য-প্রেরণাকে নিরতিশয় খণ্ডিত করিয়াছে। তাই, ইহার কোন চরিত্রই নাটকোচিত হয় নাই, অর্থাৎ প্রকৃতি বা সমাজের অনুরূপ হয় নাই। রাজা গোবিন্দমাণিক্য রাজা না হইয়া একজন পরম-ভাগবত বাউল-বৈষ্ণব হইয়াছে। ক্ষত্রিয়-যুবক জয়সিংহ, রাজপুত-বাচ্চা না হইয়া মহাকবি ও দার্শনিক হইয়াছে; কতকটা হ্যামলেটের মত হইলেও সে হ্যামলেটও হইতে পারে নাই—হ্যামলেটের মত তাহার জন্মগত রাজরক্তের সংস্কার, শেষের কার্যটিতে ফুটিয়া ওঠে নাই। রঘুপতিও হিন্দু-মন্দিরের শাক্ত পুরোহিত না হইয়া, কবির অভিপ্রায়-সাধনের জন্য প্রাচীন মিসরের বা ফিনিসীয় দেবমন্দিরের পুরোহিত হইয়াছে; সে তেমনই ক্ষমতালোভী, রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী, ধূর্ত ও নাস্তিক; তার কারণ, সে পৃথিবীর সকল পৌত্তলিক ধর্মের প্রতিনিধি; সে ধর্মের যাহারা রক্ষক তাহারা জনগণের মূঢ় বিশ্বাসকে যেমন ঘৃণা করে, তেমনই তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকে। এই নাটকে কবির স্বগত অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য শাক্ত বাঙালী ব্রাহ্মণকেও ঐ চরিত্র স্বীকার করিতে হইয়াছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে, এই নাটকের একটি চরিত্রও ট্র্যাজেডির চরিত্র নয়, সকলেই অতিশয় দুর্বল, ভাবের আতিশয্যে আত্মহারা। জয়সিংহের আত্মহত্যার মধ্যেও যেমন কোন সহজ মানবীয় বুদ্ধি বা প্রবৃত্তির প্ররোচনা নাই, রঘুপতির

পরিণামও তেমনই একটা ভাববাষ্পপূর্ণ গোলকের বিস্ফোরণ মাত্র ; সে যেন এতদিন একটা স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহার সেই দুর্ধর্ষ সংকল্প, সেই আত্মাভিমান তাহার চরিত্রগত নয়—সে যেন একটা মুখোশ, তাই তাহার সেই স্বপ্নভঙ্গে ট্র্যাজেডি একটি মেলোড্রামায় পর্যবসিত হইয়াছে।

'রাজা ও রাণী'র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এ নাটকখানিকে প্রেমের ট্র্যাজেডি বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেই প্রেমও লিরিক-প্রেম ; ঐ লিরিক-প্রেম ইলা ও কুমারসেনের মধ্যে তাহার লিরিক-আবেগ নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ট্র্যাজেডির মূল নায়ক 'রাজা' ও নায়িকা 'রাণী'র চিত্রে সেই প্রেমের অভিমানই অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়াছে। এ ট্র্যাজেডিও রক্তমাংসঘটিত প্রবৃত্তির ট্র্যাজেডি নয়—ভাব-জীবনের ট্র্যাজেডি। 'রাজা' ও 'রাণী' প্রত্যেকেই আত্মনিষ্ঠ বা আত্মপরায়ণ Egoist—কাহারও ভালবাসায় আত্মদান নাই ; 'রাজা'ও যেমন নিজেকে অর্থাৎ তাহার মনের একটি ভাবকে ভালবাসে, 'রাণী'ও তেমনই, রাজাকে ভালবাসে না, সে ভালবাসে তাহার মনোগত ন্যায়-সত্যের আদর্শকে ; ইহাদের কেহই রক্তমাংসের মানুষ নয়—এক একটি ভাব-বিগ্রহ। তাই এই ট্র্যাজেডিও একখানি মনোহর গীতিকাব্য হইয়া উঠিয়াছে—ভাবের সৌরভে ও ভাষার ঝঙ্কারে রমণীয় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে এখানে এই পর্যন্ত।

৬

আমাদের সাহিত্যে ট্র্যাজেডির এই যে রূপান্তর বা ভাবান্তরের কথা বলিলাম, তাহাতে য়ুরোপীয় আদর্শের ট্র্যাজেডি যে আমাদের ধাতুবিরুদ্ধ ইহা স্বীকার করিতে হয়। আমি বলিয়াছি, এই অক্ষমতার কারণ জাতিগত সংস্কৃতি ও স্বভাবের মধ্যে নিহিত আছে। কোন জাতির সাহিত্যে যে উৎকৃষ্টতম কাব্য সৃষ্টি হয়, তাহা সেই জাতিরই জাতীয় রসসংবেদনার একটি পূর্ণ-বিকশিত পুষ্পিত রূপ। গ্রীক-জাতিই আদি ট্র্যাজেডির জন্মদাতা। সেই জাতির বিশিষ্ট জীবন-দর্শন হইতেই ঐ কাব্যরসের উৎপত্তি। গ্রীকজাতির যে মনোধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এই যথাপ্রাপ্ত পরিদৃশ্যমান জগৎটাই তাহাদের ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা ও কবি-স্বপ্নের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কোন গভীরতর আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা তাহাদের সেই প্রকৃতি-প্রেম ও জীবন-রস-রসিকতাকে বিস্মিত করে নাই। প্রকৃতির ভিতরে সেই জাতি যে-নিয়মের যে-সঙ্গতি ও

সুষমা এবং পরিমিতির পরিচয় পাইয়াছিল তাহার সেই শোভা ও সৌন্দর্যের নীতিকেই সে ধর্মনীতিরূপেও বরণ করিয়াছিল। মানুষের জীবনে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম বা ব্যভিচারকে সে ভয় করিয়াছে। মানুষ যেখানে, ন্যায় অন্যায় বোধের স্বাতন্ত্র্য, তাহার মমত্বাভিমান বা প্রবৃত্তির প্রাবল্যকে ঐ প্রাকৃতিক সুস্থ-সুন্দর সৌষম্য-নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্রয় দিয়াছে, সেইখানে সেই নীতিই কঠিন নিয়তির রূপ ধরিয়া তাহাকে শাস্তি দিবে ; সেই শাস্তিকে দেব-রোষ, 'নেমেসিস' (Nemesis) বা অলঙ্ঘনীয় প্রতিফল, অথবা 'ফিউরী' (Furies)—যে নামই দেওয়া হোক। জীবন-দর্শনের এই সরলতা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মেরই ঐ অলঙ্ঘনীয়তা বোধ, গ্রীকের চক্ষে মনুষ্য জীবনকে যতখানি ভয়াল করিয়া দেখাইতে পারে—প্রবৃত্তির এই নগ্নতা, ঘটনার অনিবার্য গতি এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এ সকলই তাহার ঐ নাটককে একটি অপূর্ব রস-রূপ দান করিয়াছে।

অতএব ঐরূপ ট্র্যাজেডি-রচনার পক্ষে একটি বিশেষ মনোধর্মের প্রয়োজন আছে। ঐ দ্বন্দ্ব বা প্রবৃত্তি-বিক্ষোভ, এবং ঐরূপ-শোকাবহ পরিণাম যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারিক জগতেরই অন্তর্গত বটে, কিন্তু সকল জাতির দৃষ্টি এক নহে ; এমন কি, উত্তরকালের গ্রীক-শিষ্য য়ুরোপীয় জাতিসকলের সাহিত্যেও ট্র্যাজেডির এই গ্রীক আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। মানব-জীবন ও মানব ভাগ্যকে, প্রকৃতির দ্বন্দ্ব ও তাহার মূলকে, মানুষের পাপ ও মানুষের দুঃখকে তাহারা কতরূপে ভাবনা করিয়াছে ; সমস্যা আরও অধ্যাত্ম-গভীর, আরও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রথম হইতেই জীবন ও জগৎকে আর এক দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাই তাহার রসানুভূতির মার্গও ভিন্নমুখী। সে এই পরিদৃশ্যমান জগৎটাকেই চূড়ান্ত মনে করে নাই, আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে সেই তত্ত্বকে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে নাই যে, দুঃখ-পরিণামী যাহা তাহা সত্য নহে—সকল দ্বন্দ্ব, সকল দুঃখই প্রাতিভাসিক। এইজন্য বহির্জগৎ ও জীবনের যতকিছু জটিলতা বা বিচিত্র বিস্তার তাহার চিত্তে একটি রস-চেতনায় সমাহিত হইতে চায় ; এইজন্য ভারতীয় কাব্যরস মূলে লিরিক না হইয়া পারে না ; সেই রস নাটকের সাহায্যে পরিবেষণ করিতে হইলেও তাহা কাব্যই হইবে —দৃশ্যকাব্য হইবে, নাটক হইবে না। রবীন্দ্রনাথও খাঁটি ভারতীয় কবি, ঐরূপ ট্র্যাজেডি রচনা করিতে গিয়া তিনি নিজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও কাজ তাহার নহে ; তাঁহার শেষ বয়সের নাটকগুলিতে তিনি আত্মসংশোধন করিয়াছিলেন।

তথাপি য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডি কাব্যকলায় উহার অভাব একটা দৈন্যই বটে। সাহিত্যে তত্ত্বই বড় নয়; ভারতীয় তত্ত্ববাদ যত উচ্চই হোক, সেই তত্ত্ব নিম্নতর ভূমিতে রসসৃষ্টির বাধা হইবে কেন? ইহার কারণ, ঐ তত্ত্বকে আমরা জীবনের সহিত জড়াইয়া লইয়াছি। আমাদের সমাজ-জীবনে ও সংসারযাত্রায় ঐ তত্ত্বের এমনই প্রভাব যে, আমরা এখন আর জীবন হইতে তত্ত্বে আরোহণ করি না, তত্ত্ব হইতেই জীবন আরম্ভ করি। নহিলে ঐ তত্ত্বেরই কোন একটা রূপ যে রস-রূপ ধারণ করিতে পারে, শেক্সপীয়রের অমর ট্র্যাজেডিই তাহার প্রমাণ। তাহাতে যে তত্ত্ব উঁকি দিতেছে তাহা ত হিন্দুদর্শন ও হিন্দু-সাধনারই অনুমত। সে তত্ত্ব হিন্দুরই আর এক রসতত্ত্ব-শক্তিলীলার তত্ত্ব। সেই শক্তি জীবনের ঊর্ধ্বে বা বাহিরে বিরাজ করে না; মানুষের জীবনে তাহার সহিত অদ্বৈতরূপে এক হইয়া যে লীলা করিতেছে, তাহাই শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলির রস; তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, য়ুরোপীয় জীবন-দর্শনও সেই গ্রীক জীবন-দর্শন হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে এবং শেষে তথাকার এক কবি-ঋষি যে রসরূপে যাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাও ভারতীয় সাধনার বিরোধী নয়। শেক্সপীয়রের নাটকে যদি কোন নিয়তির লীলা থাকে, তবে সে নিয়তি মানুষের প্রভু নয়, সে লীলা তাহার নিজেরই লীলা; এইজন্যই সেই এক জীবন, কমেডি হইতে ট্র্যাজেডিতে এবং ট্র্যাজেডি হইতে কমেডিতে—কখনো সূর্যালোকিত ঊর্মিমালায়, কখনো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে, তুঙ্গ তরঙ্গে—উল্লসিত বিলসিত হইতেছে। সেই একই শক্তি কখনো হাস্যপরিহাসাদিরসালাপ-বিনোদিনী, কখনো বিকীর্ণমূর্ধজা, বক্ষবালিঙ্গন ধূসরস্তনী। এ সকলেই মানুষের অন্তরবাসিনী সেই একেরই লীলা; সে যেমন নিজের ফুলশয্যা নিজেই রচনা করে, চিতাশয্যাও তেমনই তাহারই রচনা। এই জন্যই শেক্সপীয়রের নাটকে যে ধ্বংসের ছায়া ঘনঘোর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোন বহির্গত নীতি বা ধর্মের প্রশ্ন নাই; নাই বলিয়াই একদিকে তাহা যেমন নিদারুণ বলিয়া মনে হয়, আর একদিকে তাহাই একটি পরমরহস্যের বিস্ময়রসে হৃদয় আপ্লুত করে। শেক্সপীয়র প্রকৃতি পুরুষের ঐ দ্বন্দ্বকে লীলারূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই দ্বন্দ্বে পুরুষ প্রায় সর্বত্র পরাজিত হইলেও কুত্রাপি তাহার অসদ্গতি হয় নাই; 'হ্যামলেট' এ পুরুষ এবং 'অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা'য় প্রকৃতি কিছু অধিক প্রাধান্য লাভ করিলেও, শেষ পর্যন্ত পুরুষের মহিমা প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মহিমা পুরুষকে সমান মুগ্ধ করিয়াছে; প্রকৃতি বা পুরুষ কাহারও মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়

নাই। য়ুরোপ এই লীলাতত্ত্ব জানে না ; তাই শেক্সপীয়রের নাটকগুলিকে লইয়া এখনও রসিকসমাজে বিচারণার অন্ত নাই।

শেক্সপীয়রের নাটকে যদি কোথাও দৈব বা অদৃষ্টের স্পষ্ট ছায়াপাত থাকে, তবে তাহাও নাটকের বহিরঙ্গ মাত্র, সেইটাই প্রধান তত্ত্ব নয় ; তৎসত্ত্বেও নায়ক নায়িকার চরিত্র বা তাহাদের নিজশক্তির মহিমাই নাটকে রসোজ্জ্বল করিয়াছে ; এই অর্থে নাটকগুলির মুখ্য রস—'Romance of Character'। নায়কের সেই শোকাবহ পরিণাম, তাহার সেই সর্বনাশ, যদি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়, সেও ঐরূপ একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়তির কারণে নহে ; বরং ইহাই মনে হয়, যে, মানবীয় সত্তার সম্ভাবনা অসীম বলিয়া পার্থিব জীবনের গণ্ডি ঐভাবে বিদীর্ণ করাই তাহার গৌরব। ঐ সর্বনাশ সেই কারণেই অবশ্যম্ভাবী। এই কথাটাই একজন মনীষী সমালোচক আর এক ভাষায় বলিয়াছেন—

"The purest reality, the purest beauty, the purest love, cannot, by its own nature, manifest itself here on earth without disaster ; but in disaster it can."

—মানুষের সেই পূর্ণতম সত্তাই purest reality ; তাহাতে আমাদের ভারতীয় চিন্তা যোগ করিয়া বলা যাইতে পারে—ঐ সত্তার বাহিরে আর কোন reality নাই। 'Beauty in disaster it can'—ইহার অর্থ, তাহার সেই পূর্ণমহিমা প্রকাশিত করিয়া দেখাইতে হইলে, ঐ disaster বা সর্বনাশকেই চাই। শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির মূল তত্ত্ব ইহাই।

তথাপি যদি ঐ অদৃষ্টকে কোন অর্থে স্বীকার করিতে হয়, তবে একজন জার্মান মনীষী তাহার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই যথার্থ, অর্থাৎ—'Character is Fate'। ইহাতেও হিন্দুর আপত্তি নাই, কারণ, তাহারও মতে মানুষের ঐ character আর কিছু নয়—তাহারই ভোগায়তন মানস-দেহ, পূর্বার্জিত কর্মের দ্বারা উহা গঠিত হইয়াছে ; অতএব উহা তাহার নিজেরই সৃষ্টি ; সেখানেও সে নিজেই কর্তা, আর কোন শক্তির কর্তৃত্ব নাই। ইহাকেই রসদৃষ্টিতে দেখিলে যাহা হয় শেক্সপীয়রের নাটক তাহাই। আর একটি কথা প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হয় ; ট্র্যাজেডির সেই Villain, বা সর্বনাশ সাধনের জন্য যে একটি অতিশয় দুর্বৃত্ত চরিত্রের অবতারণা—আধুনিক ট্র্যাজেডি-কল্পনায় তাহাও আর আবশ্যক হয় না। এখন ট্র্যাজেডির তত্ত্ব আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছে, একজন আধুনিক ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিকের মতে—

In tragic life, God not,
No villain need be ! Passions spin the plot,
We are betrayed by what is false within.

—ইহাও হিন্দুর কথা এবং ইহাই যদি ট্র্যাজেডির একটা মূল তত্ত্ব হয় তবে আমাদের সাহিত্যে ট্র্যাজেডি-রচনার বাধা কি ?

আমি ট্র্যাজেডি-রচনায় তত্ত্ব-বিশেষের উপযোগিতার কথা বলিতেছিলাম, তাহাতো কেহ যেন মনে না করেন যে, কবিগণ আদৌ কোন একটা তত্ত্বকেই কাব্যের আকারে রূপ দিয়া থাকেন। কোন তত্ত্ব যদি কবি-চিত্ত স্পর্শ করে, তবে তাহা আর তত্ত্ব থাকে না, কবি তাহা হইতে একটা রস-প্রেরণা লাভ করেন মাত্র। আধুনিক কালে কবিমানসে তত্ত্বের প্রভাব কিছু বেশি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ফলে, একজন ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক ট্র্যাজেডিকে যেন একটা তত্ত্বেরই বাহন করিয়াছেন ; এই তত্ত্বও ভারতীয় চিন্তার একটা বিশেষ ধারাকে, সম্পূর্ণ না হৌক, আংশিক সমর্থন করেন। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়েরর ভারতীয় দর্শন হইতে ইঙ্গিত পাইয়া দুঃখবাদের যে নব্য বৌদ্ধ দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, ইংরেজ কবি টমাস হার্ডি তাহাকেই যেন কাব্যসৃষ্টিতে জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সেই উপন্যাস-গুলিতে, একটা অন্ধ অথচ সদাজাগ্রত, বিবেকহীন নির্মম শক্তি মানুষের সকল প্রয়াসকে নিষ্ফল করিয়া দিতেছে ; সেই শক্তির নিকটে, ন্যায়, সত্য, প্রেম কিছুরই কোন মর্যাদা নাই, মানুষের সকল মহিমাই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই নূতন ট্র্যাজেডিতে মানুষের আত্মস্ফূর্তির কোন অবকাশ নাই ; ইহার যে কাব্যরস তাহাকে কি নাম দেওয়া যায়? কিন্তু তাহাই আমার প্রশ্ন নয় ; আমার বক্তব্য এই যে ঐ ট্র্যাজেডির কাব্যরস যেমনই হৌক, উহার অন্তর্গত তত্ত্ব আমাদের চিন্তায় নূতন নয়—বেদান্ত না হৌক, বৌদ্ধ শূন্যবাদের সহিত উহার জ্ঞাতিত্ব আছে। কিন্তু ঐরূপ ট্র্যাজেডিও আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দেখা দেয় নাই। তাহার কারণ সেই একই,—আমরা এরূপ তত্ত্বকেও একেবারে রস-রূপে আস্বাদন করি, জীবনের ক্ষেত্রে তাহা বেশীক্ষণ থাকিতে পায় না, একটি ভাবস্থির অনুভূতিরূপে তাহা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গীতি-কাব্যের সৃষ্টি করে ; ঐ ধরনের নাটক বা ট্র্যাজেডি কোনটাই আমাদের আয়ত্ত নহে।

৫

এ পর্যন্ত আমি ট্র্যাজেডির শাস্ত্রসম্মত রূপ ও তাহার তত্ত্বই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ট্র্যাজেডির অর্থ আরও ব্যাপক করিয়া ধরিলে—তাহার নাটকীয়রূপ যেমনই হোক, জীবনে তাহাকে আমরা নানারূপে দেখিয়া থাকি এবং তাহাতেও এই রসের চকিত-চমক থাকে। ট্র্যাজেডি শব্দটির এখন যে বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার কারণ আছে। জীবনে যে দুঃখ আছে—সেই দুঃখের বৈচিত্র্য ও ভীষণতার অন্ত নাই, ইহা সর্ববাদিসম্মত। সেই দুঃখ সাহিত্যের কোন একটা বিশেষ রসরূপে নাটকীয় ঘটনাচক্রের সুবলয়িত আকারে, এবং তন্নিহিত একটি তত্ত্বরূপে ফুটিয়া না উঠিলেও, সেই দুঃখকে সহ্য করিবার খাঁটি ট্র্যাজিক চরিত্র আমরা জীবনে প্রায় দেখিয়া থাকি; অতএব আধুনিক কাব্যে উপন্যাসে তাহার প্রতিচ্ছায়া থাকিবেই। এ কালের রসিক-চিত্তে রসসঞ্চারের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট; জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবুকতা অনেক বাড়িয়াছে, এজন্য সবই আর চোখে দেখিতে হয় না, ঐ ইঙ্গিতই যথেষ্ট, তাহা হইতেই পুরা নাটকখানি মনের মধ্যে নানা আকারে গড়িয়া লওয়া যায়। ট্র্যাজেডির সেই খণ্ডরূপ আমাদের নব্য সাহিত্যে দেখা দিয়াছে; সে কেমন তাহারই কিছু দৃষ্টান্ত, এবং তাহাতেও আমাদের ভারতীয় মনোভাব কিরূপ সাড়া দিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া আমি বর্তমান আলোচনা শেষ করিব।

ইহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত, রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' নামক কবিতাটি। ঐ কবিতার ট্র্যাজেডি-কল্পনা অন্যরূপ—খাঁটি লিরিকের অনুরূপ; তথাপি সেই লিরিক-ট্র্যাজেডিকে ঘনঘোর করিয়া তুলিয়াছে যে একটি নাটকীয় ঘটনাবস্তু, কবি তাহাকে কেবল একটি বিদ্যুৎচমকের মত, ইঙ্গিতে শেষ করিয়াছেন—তাহাতেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। মূল কবিতার সেই লিরিক বায়ু-মণ্ডলকে বিদীর্ণ করিয়া সহসা এই বজ্রধ্বনি হইল—

"বালক কিশোর
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ-প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।"

লিরিক কবির পক্ষে ইহার অধিক প্রয়োজন হয় না, ঘটনার দারুণতাও তাঁহাকে ত্রস্ত করে। মূল কবিতাটির ট্র্যাজেডি অন্যরূপ, কবি সেই ট্র্যাজেডিকেই

বড় করিয়াছেন। ঐ ট্র্যাজেডি স্থূল, নায়িকার ট্র্যাজেডি আরও সূক্ষ্ম। তথাপি উহাই যেন মূল ট্র্যাজেডি, ঐ ক্ষুদ্র কলেবরেও সে যেন অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে, এবং তাহার ফলে মূল কবিতার রস-সংবেদনা ম্লান হইয়া গিয়াছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ ঐ 'উন্মত্ত অধীর' প্রেমকে, নিছক রক্ত-মাংসঘটিত একটা দুর্বার প্রবৃত্তিরূপেই দেখিয়াছেন; তাহার পরিণাম যতই শোকাবহ হউক, তাহার কোন moral সত্তা নাই বলিয়া, তিনি ঐ কবিতার অপরবিধ ট্র্যাজেডিতেই আকৃষ্ট হইয়াছেন; তাহার কারণ, সেই অপর ট্র্যাজেডির যে হাহাকার তাহাতে শান্তিরও একটা moral গৌরব আছে, অন্যটিতে সেই য়ুরোপীয় ট্র্যাজেডির বিরাট শূন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে।

এইবার শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'শ্রীকান্ত' হইতে এইরূপ একটি খণ্ডট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত দিব। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম খণ্ডে ইহার এমন একটি বাস্তব রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহা কল্পনাকেও পরাস্ত করে। তথাপি সে যে কল্পনা নয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লেখকের রচনাভঙ্গিতেই—তাঁহার কণ্ঠস্বরেই—পাওয়া যাইতেছে; লেখকের চক্ষেও সে যেন একটা হৃদয়স্তম্ভনকারী revelation বা দিব্যদর্শন। ঘটনাটি সেই 'অন্নদাদিদি'র চরিত্র ও জীবনসম্পর্কিত। এই ট্র্যাজেডিও উপরের ঐ কবি-কল্পিত ট্র্যাজেডি অপেক্ষা কম নিদারুণ নহে, বরং ভিতরে দৃষ্টি করিলে দুইটাই প্রায় একজাতীয় বলিয়া মনে হইবে। দুইটির মধ্যেই সেই এক frustration বা চরম ব্যর্থতার সান্ত্বনাহীন দুঃখ আছে। নাটক রচনা করিতে হইলে, উহাকেই যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ও কলাকৌশলে সাজাইতে হইত, এরূপ রচনায় তাহার অবকাশ নাই—প্রয়োজনও নাই। তথাপি এই কাহিনীতে action বা ঘটনাধারার প্রত্যক্ষ বাস্তবতাও কিছু আছে, সেই কারণেই ঐ চরিত্রের নাটকীয় রূপ কিছু অধিক ফুটিয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই ট্র্যাজেডিও খাঁটি লিরিক—উহার প্রেরণা শাক্ত নয়, বৈষ্ণব। এই গল্পটি হইতেও লেখকের সেই খাঁটি ভারতীয় তথা বাঙালী-চিত্তের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

কারণ, এই গল্পে লেখক বেদনার যে পাষাণ-কঠিন নারী-বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে ট্র্যাজেডির নির্মমতা আছে বলিয়াই তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না, তাহার একটা অর্থ করিতে না পারিলে তাঁহার ভারতীয় প্রাণ কিছুতেই আশ্বস্ত হইবে না। অন্নদা-দিদির সেই নির্মম আত্মনিগ্রহ যে শক্তির পরিচায়ক, সেই শক্তিকে পূজা করিলেও, তিনি তাহার সেই দুর্গতি, তাহার মহিমার প্রতি অন্যায়ের সেই অট্টহাস্য, কিছুতেই মানিয়া লইবেন না—

তেমন শক্তি কখনও শিবহীন হইতে পারে না। তত্ত্বঘটিত এই যে ক্ষুধা ইহাই খাঁটি আধ্যাত্মিক ক্ষুধা—এ ক্ষুধা সাহিত্যে লিরিক প্রেরণা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। ইহাই শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রকে আকুল করিয়াছে—সারা জীবনে সে একটা বহ্নিমান্ উল্কার মত ছুটিয়া চলিয়াছে, যতক্ষণ না সেই প্রশ্নের সদুত্তর মেলে ততক্ষণ জীবনের সকলই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ; সেই ক্রুশবিদ্ধ নারীর অসীম যাতনা, এবং যাতনার মধ্যেই তাহার মুখের সেই ততোধিক কঠিন প্রসন্নতা, তাহাকে একটা দুঃস্বপ্নের মত অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু বিচলিত হয় নাই একজন—সে ইন্দ্রনাথ ; সে যেন ঐ অন্নদাদিদির আধ্যাত্মিক সহোদর—দুইয়ের প্রকৃতি একই ধাতুতে গঠিত ; তাই অন্নদাদিদি ইন্দ্রনাথের দান গ্রহণ করিত, শ্রীকান্তের দান গ্রহণ করিতে পারে নাই ; শ্রীকান্তের দুর্বলতাকে সে পরম স্নেহের চক্ষে দেখিত, ইন্দ্রনাথকে সে সমকক্ষের মত শ্রদ্ধা করিত। ঐ ইন্দ্রনাথের প্রকৃতিই খাঁটি ভারতীয় আদর্শের অনুরূপ—ট্র্যাজেডি বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার চেতনার চতুঃসীমানায় তাহা নাই। সে মুক্ত পুরুষ, তাহার দয়া আছে—মমতা নাই, প্রেম আছে—আসক্তি নাই। শ্রীকান্তের প্রকৃতিও যদি ঐরূপ হইত তাহা হইলে আমরা এই 'শ্রীকান্ত'কেই পাইতাম না। শ্রীকান্ত বাঙালী বলিয়াই তাহার মমতা আছে, ভাবাকুলতা আছে ; আবার ভারতীয় বলিয়া সে সকল আকুলতা ও উৎকণ্ঠার একটা সমাপ্তি বা সার্থকতা চায় ; যতক্ষণ তাহা না পাইতেছে ততক্ষণ সেই জ্বালাকে সে পরিহার করিবে না, আবার চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণও করিবে না। শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের এই মজ্জাগত বাঙালী সংস্কার ও বাঙালী-হৃদয় ঐ উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ডে পূর্ণ চরিতার্থ হইয়াছে,—মুরারিপুরের আখড়ায় সেই দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হইয়াছে ; বৈষ্ণবী কমলতায় প্রেম-সাধনার সেই তটহীন সাগর-সঙ্গমে শ্রীকান্তের হৃদয়-নদীর অশান্ত আক্ষেপ চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

তখন অন্নদাদিদির জীবনের সেই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিও তাহার প্রাণকে আর আকুল করিবে না ; সে ট্র্যাজেডি যতই শোকাবহ হোক, যতই সহানুভূতির যোগ্য হোক, তাহার ট্র্যাজেডিত্ব লোপ পাইবে, তাহার অর্থই অন্যরূপ দাঁড়াইবে। ভারতীয় সংস্কারের সেই আইডিয়ালিজম্ প্রেমের ঐ ট্র্যাজেডিকে আর এক চক্ষে দেখিবে—এবং তাহাতে বাঙালী-প্রাণ মুক্ত হইবে, প্রেমের ব্যর্থতাকেও বৃন্দাবনস্বপ্নে সার্থক করিয়া তুলিবে। বাঙালীর অতি-নিজস্ব সেই বৈষ্ণব-ভাবসাধনায়—'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া'—সকল

আত্যন্তিক হৃদয়-বেদনার যে পরমৌষধি মিলিয়াছে, শ্রীকান্ত কমললতার মধ্যে তাহাই সাক্ষাৎ-দর্শন করিয়া তাহার প্রাণের সেই বিষম উৎকণ্ঠা নিবারণ করিল। রাজলক্ষ্মীর মত ইন্দ্রাণীও যাহা পারে নাই, এই ভিখারিণী বৈষ্ণবীই তাহা পারিল! তখন সে অন্নদাদিদির জন্যও আর দুঃখবোধ করিবে না—বুঝিবে যে, যে-বস্তুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই নারী জীবনের অতি দুর্গম পথে অভিসার করিয়াছে—পরমতীর্থে পৌঁছিয়া পরমসুন্দর প্রাণেশ্বরের পদে তাহা নিবেদন করিবার পূর্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই। এ যাত্রায় এ পর্যন্ত তাহার ভুল হইয়াছে, তাহার সেই প্রেম পাত্রভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি কোন মিথ্যা, কোন মৃত্যুই সেই প্রেমকে আত্মভ্রষ্ট করিতে পারিবে না, তাই সেই মোহের মধ্যেও সে আপন সত্যে আপনি অটল। তাহার সেই হৃদয়বহ্নি নিরাধার হইয়াই একদিন নিজের মধ্যেই আধার খুঁজিয়া পাইবে—সে আধার যে কি, কমললতাকে দেখিয়া শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল। অন্নদাদিদিও সেই একই পথের পথিক—একটু পিছাইয়া আছে মাত্র। প্রেমের, তথা জীবনের চরম সার্থকতার যে বাধা তাহাই ট্র্যাজেডির রূপ ধারণ করে; কিন্তু তাহাই ত' পূর্ণ সত্য নয়, এজন্য ট্র্যাজেডিমাত্রেই মিথ্যা; সেই বাধা দেহের বাধা মাত্র—আত্মার নয়; ইহাও যেন সেই কথা—

"The purest reality, the purest beauty, the purest love, cannot, by its own nature, manifest itself here on earth without disaster; but in disaster it can."

ইহাই ভারতীয় প্রকৃতির অতি গভীর অন্তর্নিহিত সংস্কার; এখানকার মানুষ যদি দুঃখের কঠোরতম মূর্তিকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করে, মনে তাহা স্বীকার করিতে বাধে। সেই দুঃখকে যেমন করিয়া হোক সে পরাস্ত করিবেই; যাহারা দুর্বল তাহারা পরাজয় স্বীকার করিলেও—কাঁদিবে, তবুও বিশ্বাস করিবে না; পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিবে, পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিবে না। যাহারা শক্তিমান তাহারা, হয় ইন্দ্রনাথের মত তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, নয় কমললতার মত, তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার সেই শিখা-শতদলেই আত্মার পদ্মাসন রচনা করিবে। আধুনিক কবি-শিল্পী বেদনার সেই মনোহরণকে রসসৃষ্টির কাজে লাগাইয়াছেন বটে—কিন্তু সেও তাহার ঐ লিরিক সৌন্দর্যটুকু মাত্র; "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought"—ইহার অধিক প্রয়োজন তাঁহাদের নাই, সাধ্যও নাই; প্রয়োজন

নাই এইজন্য যে, দুঃখ যদি মধুরই হইল তবে তাহার সেই ব্যবহারিক দুঃখরূপ আর রহিল কোথায়? বরং প্রমাণ হইল যে, দুঃখও দুঃখ নয়, আসলে তাহাও একটা রস। এজন্য আমাদের কবি-প্রেরণা মুখ্যত লিরিক বা গীতিপ্রাণ হইতে বাধ্য; ভাবের দিক দিয়া যাহা একটি সর্বদ্বন্দ্ববিরহিত তত্ত্বচেতনায় নিবৃত্তি লাভ করে, রসের দিক দিয়া তাহাই একটি অখণ্ড সুরমূর্ছনায় পর্যবসিত হয়। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি যিনি, সেই রবীন্দ্রনাথও কাব্যের এই আদর্শকে মহিমান্বিত করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন—

জগতের যত রাজা মহারাজ<br>
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ<br>
সকালে ফুটিছে সুখদুখ লাজ<br>
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা ;<br>
শুধু তা'র মাঝে ধ্বনিতেছে সুর<br>
বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর,<br>
চিরদিন তাহে আছে ভরপুর,<br>
মগন গগনতল।

এইজন্য আমাদের কাব্যে ঐ নাটক বা ট্র্যাজেডির রস পূর্ণমর্যাদা লাভ করে নাই, জীবনের বাস্তব-জটিল দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও তাহার নানা আকার ও প্রকারকে আমরা এমন মূল্য দিই না যে, কাব্যের মধ্যে ঐরূপ একটা মহিমায় তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যে দুইটি খণ্ড-ট্র্যাজেডির উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি, ঐরূপ ট্র্যাজেডিই আমাদের রস-চেতনার পক্ষে যথেষ্ট; উহারও রঙ্গস্থল বাহিরে নয়, ভিতরে; দ্বিতীয়টির মত যদি তাহাকে একটু বেশী বাহিরে টানিয়া আনা হয়, তবে তাহার জন্য কিরূপ রসায়নের প্রয়োজন—শ্রীকান্তরূপী খাঁটি বাঙালী কবি তাহা অতিশয় সত্য ও সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

---

# রোহিণী

সুশীলকুমার দে

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ইহা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন যে, প্রায় একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহার দুইটি উপন্যাসে, যেমন একদিকে সূর্য্যমুখী কুন্দ ও নগেন্দ্র, তেমনই অন্যদিকে ভ্রমর, গোবিন্দলাল ও রোহিণী পরস্পরের পুনরুক্তিমাত্র না হইয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। এখানে কেবল অবস্থাভেদের কথা নয়, অন্তর্গত ভাবের পার্থক্যে প্রত্যেক চরিত্র-চিত্রের মূল-কল্পনাটি বিভিন্ন আকারে পল্লবিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই বিষবৃক্ষের রোপণ, উদ্গম ও মূলোচ্ছেদ চিত্রিত হইয়াছে; কিন্তু পৃথ্বী-মৃত্তিকার এক প্রদেশে তাহা যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ হওয়া সকল সময়ে স্বাভাবিক নয়। কুন্দনন্দিনীর অবসান করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী, কিন্তু রোহিণীর বিনাশ ঘৃণ্য ও ভয়াবহ। বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অন্য কোন নায়িকার প্রতি এরূপ অপরিসীম নির্ম্মমতা দেখান নাই। শৈবলিনী ও রোহিণী এই উভয়কেই তিনি পাপীয়সী বলিয়াছেন, শৈবলিনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে কুৎসিত পরিণামের অতলে ডুবাইয়া রোহিণীর মত নিষ্ঠুরভাবে হত্যার হস্তে সমর্পণ করেন নাই।

কিন্তু রোহিণীর এই পরিণাম হইল কেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকে কঠোর নীতিদর্শী বলিয়াছেন, কিন্তু রোহিণীর দুর্ভাগ্যকে কেবল পাপের শাস্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গত হইবে না। তাহা যদি হয়, তবে নিষ্পাপ ভ্রমরও কেন শাস্তি ভোগ করিয়াছে? বিভিন্ন প্রকারে উভয়েরই ভাগ্যে অবশেষে মৃত্যুদণ্ড আসিয়াছে। রোহিণীর পাপ স্বীকার করিয়া লইলেও, অনভিজ্ঞ বালিকার অভিমান ও অবিমৃশ্যকারিতা তাহার সহিত কি সমান দণ্ডে দণ্ডিত হইবে? তাহা হইলে মূল প্রশ্ন হইতেছে, এই দুইটি জীবনের যে tragedy বা বিয়োগান্ত পরিণাম তাহার জন্য দায়ী কে?

গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা সমর্থন করিয়া অনেকে বলিবেন যে কৃষ্ণকান্তের উইলই সকল সর্বনাশের মূল। একদিক দিয়া দেখিলে ইহা সত্য বলিয়া মনে

হইবে ; কিন্তু জীবনের কোনও শোচনীয় পরিণতি কেবল বাহ্যিক ঘটনার অনির্দিষ্ট নিয়তির উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে মানুষের ভাব, চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির কোন মূল্যই থাকে না। মানুষ অবস্থার দাস বটে, কিন্তু অবস্থার নিয়ন্ত্রণ তাহার শক্তির একেবারে বহির্ভূত নহে। কেবল ঘটনা-পরম্পরা নয়, অন্তর্গত ভাবনাও মানুষের জীবন চক্রকে চালিত করে।

কৃষ্ণকান্তের উইলকে মুখ্যতঃ দায়ী না করিলে বলিতে হইবে যে, ভ্রমর, রোহিণী ও গোবিন্দলাল, ইহাদের মধ্যে একজন অথবা তিনজনই হয়ত সমান-ভাবে দায়ী। ইহা সত্য যে তিনজনই বিভিন্ন প্রকারে বিষবৃক্ষের ফলভোগী, এবং আংশিকভাবে নিজের ও পরস্পরের শান্তিকে স্থগম করিয়াছে। এক্ষেত্রে একের দোষ অন্যকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু সত্যই কি তিন জনে সমানভাবে দায়ী ?

বয়স ও সাংসারিক জ্ঞান হিসাবে ভ্রমর নিতান্ত বালিকা ; সুতরাং তাহার দুর্জয় অভিমান ও চিন্তাহীনতার পরিণাম যে কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা সে তাহার সরলতায় প্রথমে বুঝিতে পারে নাই ; পরে বুঝিয়াও বোঝে নাই। সে স্বামীকে ভালবাসিত, ভক্তি করিত, কিন্তু স্বামীকে চিনিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তাই, যখন তাহার অগাধ বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিতে আঘাত লাগিল, তখন সে আর কিছু বোঝে নাই, কেবল বুঝিয়াছিল যে তাহার কপাল ভাঙিয়াছে। ইহার বেশি কিছু বুঝিবার সময়, শক্তি বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। তাই ক্রোধে, দুঃখে, দম্ভে ও অভিমানে চিন্তাশূন্য হইয়া স্বামীকে লিখিল— "যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য ততদিন আমারও ভক্তি ; যতদিন তুমি বিশ্বাসী, ততদিন আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই।" এমন কি রোহিণীর মৃত্যুর পরও, গোবিন্দলাল যে পাপী ও হত্যাকারী এ কথা ভ্রমর ভুলিতে পারে নাই ; কোনও দিন বলিতে পারে নাই—হোক সে পাপী, হোক সে হত্যাকারী, তবুও সে আমার স্বামী, সে আমার আপনার। ভালবাসা দিয়া, দরদ দিয়া কোনও দিন সে কোনও ক্ষত ঢাকিয়া দিতে পারে নাই, কোনও অপরাধ অশ্রুজলে মুছিয়া দিবার চেষ্টা করে নাই। গোবিন্দলাল নিজেও প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে ভ্রমর এরূপ চিঠি লিখিতে পারে। সাবিত্রী যে শাড়ি ছাড়িয়া গাউন পরিবে, তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। ভ্রমর যদি তাহাকে বোঝে নাই, সেও কোনদিন ভ্রমরকেও বোঝে

নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই। তাহার মনে তখন অন্য চিন্তার বীজ পল্লববিস্তার করিয়াছিল; সুতরাং তাহার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না যে, ভ্রমরের এই মনের অবস্থার জন্য সে নিজে কত অপরাধী, বিশ্বাস-ভঙ্গের কত বড় আঘাত তাহার সরল নিশ্চিন্ত মনে লাগিয়াছে। ভ্রমরের আত্মঘাতী অভিমান হয়ত খুব বড় একটি ভুল করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার এই মনের অবস্থার জন্য প্রথম হইতেই গোবিন্দলাল দায়ী। গোবিন্দলালের প্রশ্রয়ে ও আদরে তাহার মনের বয়স কোনদিন বাড়ে নাই। ভ্রমর তাহার খেলার পুতুল ছিল—এ কথা ভ্রমর নিজেও বলিয়াছে; তাই সে হাসিতে পটু হইলেও কোনও দিন স্নেহের শাসনে পটু হয় নাই; গোবিন্দলালের অস্থির চিত্তকে আত্মবিস্মৃত নারীর গভীর প্রেমে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। ভ্রমরের পিত্রালয়গমন ও সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ—উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য রহিয়াছে। সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের ভাববন্ধনের মত ভ্রমর ও গোবিন্দলালের ভালবাসা বহুদিনের নিবিড়বদ্ধ পরিচয়ে পরস্পরের ভাবজ্ঞ ছিল না; নিজের বা পরের মর্যাদাশীল ও ক্ষমাপ্রবণ ত ছিলই না। ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের আকর্ষণ অসত্য ছিল না, কিন্তু বন্ধনের লঘুতায় তাহা সুপ্রতিষ্ঠ হয় নাই। ভ্রমরকে গোবিন্দলাল ক্ষমা করিল না, কিন্তু ভুলিতে পারিল না; অন্য আকর্ষণ প্রবলতর হইয়া ভাগীরথী-জলতরঙ্গে ক্ষুদ্র তৃণের মত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তাই নগেন্দ্রনাথের মত গোবিন্দলাল কোনও দিন বলিতে পারে নাই—"সূর্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্যমুখী আমার সব। ···আমার সূর্যমুখী কাহার ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী হৃদয়ে ধর্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে?" আত্মসংযমের অভাবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া কেবল বলিয়াছে—"আমি মরিব, ভ্রমর মরিবে।" এই নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া দুর্বল চিত্তের আত্মপ্রবঞ্চনা আছে, আত্মজয়ের আড়ম্বর আছে, কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা নাই। সে ইচ্ছাপূর্বক মনকে সান্ত্বনা দিল, ভ্রমরকে ভুলিবার, ভ্রমরের স্পর্ধা ভাঙিবার প্রকৃষ্ট উপায়—রোহিণীর চিন্তা।

তাই, 'পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' গোবিন্দলাল আগুনে ঝাঁপ দিল, কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিবার মত শক্তি ও দৃঢ়চিত্ততা তাহার ছিল না; দুঃসাহস

ছিল, কিন্তু তাহার অনুরূপ বলিষ্ঠতা ছিল না। স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া দেওয়া যেরূপ সহজ, তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করা সেইরূপ প্রয়াসসাধ্য ; গোবিন্দলালের পক্ষে সহজ পথই স্বাভাবিক। সেইজন্য, নগেন্দ্রনাথ বা ভবানন্দের যে নিকপট মর্মস্পর্শী আত্মসংগ্রামী ভাব দেখিতে পাই, গোবিন্দলালের তাহা নাই। রূপতৃষ্ণা অনেক দিন হইতে তাহার হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছিল। ভ্রমরের ভুল ও রোহিণীর আবির্ভাব তাহাকে যে সুযোগ দিয়াছিল তাহা চরিতার্থ করিতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হইল না। কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিবর্তন এই সুযোগের একটি উৎকৃষ্ট কৈফিয়ৎ হইয়া ব্যাপারটকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। দ্বিধার আর অবকাশ রহিল না ; "আলুলায়িতকুন্তলা, অশ্রুবিপ্লুতা, বিবশা, কাতরা, মুগ্ধা পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা" সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতার "ক্ষমা কর, আমি বালিকা" এই অসহায় ক্রন্দনের উত্তরে রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দলাল অনায়াসে বলিল—"আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।" সাবিত্রীর গাউন পরা সহিল না ; গাউনের নীচে যে চিরাভ্যস্ত শাড়ি উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, শেষে তাহাই তাহার দেহের ও মনের স্বাভাবিক আবরণ হইল। আধুনিক সত্যবান ক্ষমা করিল না, সাবিত্রীও স্বামীকে বাঁচাইতে পারিল না, মৃত্যুকে জয় করিতে পারিল না ; মৃত্যু জয়ী হইল। তথাপি মরণেও তাহার সাহসের অভাব ছিল না ; স্বামীর পদযুগল স্পর্শ করিয়া পদধূলি লইয়া অবশেষে বলিল—"আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিও, জন্মান্তরে যেন সুখী হই।"

গোবিন্দলাল ধনীর সন্তান হইলেও উচ্ছৃঙ্খল ছিল না ; কিন্তু সে নিজের প্রবৃত্তির পথে কখনও কোন বাধার সম্মুখীন হয় নাই, আত্ম-সংযমের ইচ্ছা বা অভ্যাস তাহার ছিল না। তাই প্রথম জীবন-সঙ্কটে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করিলেও নিজেকে সামলাইবার আন্তরিক প্রয়োজন সে অনুভব করে নাই, উপায়ও জানিত না। প্রথমে ভদ্রতা, সহৃদয়তা অথবা বংশোচিত মর্যাদা-জ্ঞানের অভাব ছিল না ; তাই সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে মরিতে হয় মরিবে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হইবে না। কিন্তু দুর্বল চিত্তের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ যৌবনের "উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য প্রবল" মনোবৃত্তির প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং ভ্রমররূপ অন্তরায় ক্রমশ অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বারুণীর তীরে যখন জলমগ্না রোহিণীকে সে বাঁচাইল, তখন তাহার স্বভাব-কোমল ও প্রলোভন-উন্মুখ চিত্ত বিচলিত হইলেও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয় নাই।

তখন তাহার মনে হইয়াছিল—এই অপরূপ সুন্দরীর আত্মঘাতের মূল সে নিজেই ; আত্মছলনার বশে এরূপ চিন্তার যে বেদনা, তাহাতেও সুখ আছে। সত্য হউক বা ছলনা হউক, দুঃখময় সুখের স্মৃতি কোমল ও দুর্বল চিত্তের কাছে এত মধুর যে তাহাকে জোর করিয়া তাড়াইলেও সে যায় না। কিন্তু এতটা হইত না, যদি ঘটনা-পরম্পরায় ভ্রমরের পিত্রালয়-গমন ও কৃষ্ণকান্তের উইল-পরিবর্তনের সুযোগ ও সুবিধা আপনা হইতে আসিয়া না জুটিত, এবং চঞ্চল প্রবৃত্তির পথ আরও সুগম করিয়া না দিত। যাহা স্মৃতিমাত্র ছিল, তাহা কাল্পনিক দুঃখে পরিণত হইল ; এবং দুঃখ হইতে কামনা আপন নগ্নমূর্তি পরিগ্রহ করিল। ভ্রমরের কাছে যে সে অপরাধী তাহা গোবিন্দলালের অজ্ঞাত ছিল না, তাই যাইবার পূর্বে ভ্রমরের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহস হইল না ; কিন্তু তখন আর তাহার ফিরিবার পথ ছিল না।

ভ্রমর ত মরিল, নিজের সর্বনাশের ত কিছুই বাকি রহিল না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল রোহিণীকেও ডুবাইল। যে আপনি ডুবিতে উন্মুখ ও অগ্রসর, তাহাকে অধঃপতনের সর্বনিম্নস্তরে লইয়া যাইতে তাহার দ্বিধা বা বিলম্ব হইল না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, রোহিণী প্রথম হইতেই কেবল কুৎসিত লালসার বশবর্তী হইয়া গোবিন্দলালের অনুগামী হইয়াছিল। তাহা যদি হয়, তবে উপন্যাসের প্রারম্ভে রোহিণীর বিবরণে যে কাব্যাংশের অবতারণা, তাহার কোনই অর্থ হয় না। বারুণীর তীরে, কোকিলের কুহুরবের সঙ্গে, মধুমাসের মাদকতার পরিবেষ্টনীর মধ্যে পরিপূর্ণ-যৌবনা রোহিণীর যে রূপচ্ছবি, তাহা সেই বসন্তের কুসুম-সম্ভার ও কোকিলের পঞ্চমে বাঁধা কুহুরবের সহিত একই সুরে বাঁধা। এই অপরূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনা যেরূপ চরম সীমায় গিয়াছে, তাহা তাঁহার উপন্যাসের অন্যত্র বিরল :

“রোহিণী চাহিয়া দেখিল—সুনীল, নির্মল, অনন্ত গগন—নিঃশব্দ অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল—নবপ্রস্ফুটিত আম্রমুকুল—কাঞ্চনগৌর—স্তরে স্তরে শ্যামল পত্রে বিমিশ্রিত, শীতল সুগন্ধপরিপূর্ণ, কেবল মধুমক্ষিকা বা ভ্রমরের গুনগুনে শব্দিত, অথচ সেই কুহুরবের সঙ্গে সুর বাঁধা। দেখিল, সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যান, তাহাতে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে, ফুল ফুটিয়াছে ; কেহ শ্বেত, কেহ রক্ত, কেহ পীত, কেহ কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ—কোথাও মৌমাছি,—কোথাও ভ্রমর—সেই কুহুরবের সঙ্গে

সুরবাঁধা, বাতাসের সঙ্গে তাহার গন্ধ আসিতেছে—ঐ পঞ্চমের বাঁধা সুরে। আর সেই কুসুমিত কুঞ্জবনে, ছায়াতলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল নিজে। তাহার অতিনিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম চক্র ধরিয়া তাঁহার চম্পকরাজিনির্মিত স্কন্ধোপরে পড়িয়াছে—কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর সেই উন্নত দেহের উপর এক কুসুমিতা লতার শাখা আসিয়া দুলিতেছে—কি সুর মিলিল। এও সেই কুহুরবের সঙ্গে পঞ্চমে বাঁধা। কোকিল আবার এক অশোকের উপর হইতে ডাকিল—"কু উ।" তখন রোহিণী সরোবর-সোপানে অবতরণ করিতেছিল; রোহিণী সোপান অবতীর্ণ হইয়া, কলসী জলে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল।"

যে সুন্দরীকে সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টা তাহার সৌন্দর্যে আপনি মুগ্ধ এবং কুহুরবের পঞ্চমের সঙ্গে আপনার উচ্ছ্বসিত কল্পনাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাকে শেষে তিনিই পাপীয়সী রাক্ষসী বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু এই গালিই শেষ কথা নয়। রমণীরূপলাবণ্য গোবিন্দলালকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, কিন্তু তাহার কবি-স্রষ্টাকেও আপনার অজ্ঞাতে আকৃষ্ট করিয়াছে; তাহাতেই এই গালির সার্থকতা। "অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র; দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, কিন্তু চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল।" কিন্তু শেষে যে কালিমা-লেপনের দ্বারা চিত্র ও চিত্রপট উভয়ই লুপ্ত হইল, তাহাতে মনে হয়, রোহিণীর চরিত্রে যে অপরূপ সম্ভাব্যতা ছিল, তাহা উপন্যাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ফুটিবার অবকাশ পায় নাই।

রোহিণী বৈধব্যের কোনই নিয়মশাসন মানিত না; তাহাকে শাসন করিবারও কেহ ছিল না। যৌবনের চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে নারীসুলভ ভাবভঙ্গি ও অশিক্ষিতপটুত্বের জন্য তাহার ব্যাপিকা-অপবাদ বিচিত্র নয়; কিন্তু হরলালের সহিত তাহার যে ব্যবহার তাহা হইতে জানা যায় যে, একটি নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইলেও অসৎপ্রবৃত্তি বা কুটিলতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অর্থের প্রলোভন তাহাকে লুব্ধ করে নাই; এমন কি, যখন সে হরলালের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল তখন আশাভগ্ন হইয়াও তাহাকে সম্মার্জনী দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু গোবিন্দলালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ যে পরিবেষ্টনীর মধ্যে হইয়াছিল, তাহাতে তাহার যৌবন-সুলভ কল্পনা তাহার মানসচক্ষে আঁকিয়া দিয়াছিল—"বাপীতীর-বিরাজিত, চন্দ্রালোকপ্রতিভাসিত, চম্পকদামনির্মিত" এক অপূর্ব দুর্লভ "দেবমূর্তি"। এই চিত্র দিন দিন নানা অনুকূল ঘটনার মধ্যে তাহার হৃদয়পটে গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত হইয়া একাধারে তাহার সর্বকামনার ও সর্বদুঃখের

মূল হইয়া দাঁড়াইতেছিল। কিন্তু যৌবনস্বপ্নের নেশায় মশগুল হইয়া তখনও সে ভাবিয়া দেখে নাই—এই দেবমূর্তি কি মৃত্তিকায় গঠিত। তখন সে ভাবিতেছে—"রাত্রিদিন দারুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে—সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না ; আশাও নাই।······চিরকাল ধরিয়া দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল।" আশাহীন দুঃখে সে মৃত্যুকে বরণ করাই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিল ; কিন্তু সংস্কৃত নাটকের রত্নাবলীর মত, মরিতে গিয়া সে বাঞ্ছিতের বাহুপাশে সঞ্জীবিত হইয়া আবার নূতন মরণে মরিল। পাপ-পুণ্যের কথা সে শেখে নাই, পাপ-পুণ্যের কথা সে জানিত না—এ কথা সে নিজেই বলিয়াছে। যে ভালবাসা তাহার হৃদয়ে প্রথম বহ্নিজ্বালা বিস্তার করিয়াছিল, তাহা পাপ-পুণ্যের অতীত ; কিন্তু তাহার পাবক-পরশ তাহাকে পোড়াইল, মনের কালিমা ঘুচাইল না। তাই নিদারুণ যন্ত্রণায় সে ডাকিল—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখিজনের একমাত্র সহায়, আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর ; আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না।"

বন্ধনহারা কিন্তু বন্ধনলিপ্সু যুবতীর তৃষ্ণাতাড়িত হাহাকার তাহাকে যে পথে লইয়া গেল, তাহা হইতে আর ফিরিবার উপায় তাহার ছিল না। ভ্রমরের চেয়ে রোহিণী গোবিন্দলালকে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, এবং সে বোঝা তাহার অনুকূলেই ছিল। তবুও সে জানিত, গোবিন্দলাল ভ্রমরকে সত্য সত্যই ভালবাসে, তাহার নিজের প্রতি যে আকর্ষণ, তাহা ক্ষণিকের মোহ মাত্র। তাই ভ্রমরের সুখ তাহার সহ্য হইল না ; ঈর্ষার পুঁটলি হাতে লইয়া ভ্রমরকে দেখাইয়া আসিল। আত্মসুখের কামনা তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। সে ভাবিল—"কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড?" অসামান্য রূপ, উদ্দাম যৌবন,—সকলই কি ব্যর্থ হইবে? তাহারও কি সুখের অধিকার নাই? যে সুখ তাহার রূপ ও যৌবনের প্রাপ্য, তাহা সে সহজে ছাড়িবে কেন? এদিকে অনুকূল পবনে চালিত, তরঙ্গভঙ্গে বিভিন্ন হইয়াও গোবিন্দলালের তরণী তাহারই কূলে আসিয়া ভিড়িল। ধৈর্যহীন কামনা বর্তমানের কথাই ভাবে, ভবিষ্যতের চিন্তা করে না ; রোহিণীও তাহা করে নাই।

তাহার অনিবার্য ফলভোগও তাহাকে করিতে হইল। নিতান্ত ক্ষোভে ও দুঃখে ভাঙিয়া পড়িলেও ভ্রমর গোবিন্দলালকে ঠিকই বলিয়াছিল—"তুমি যাও,

আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।" গোবিন্দলালের দুর্বলচিত্ত, সকল মানসমোহিনী রমণীর মত, রোহিণীর অজ্ঞাত ছিল না ; কিন্তু সুখের অতিরঞ্জিত আশায় সে অন্যরূপ ভাবিয়াছিল—"এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব।" কিন্তু রূপ-সেবাকে যে এরূপ লঘু করিয়া ভাবিতে পারে, তাহার নিকট একাগ্রতা বা আন্তরিকতা আশা করা যায় না। রূপ-সাধনার শক্তি তাহার ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, গোল্লায় যাইতেছি, যাইব ; কিন্তু গোল্লায় যাওয়াও নিতান্ত সহজ নয়। বক্ষের তলে যাহার প্রাণ নাই, চরিত্রে স্থৈর্য নাই, ত্যাগের কথা দূরে থাক, ভোগ ভুঞ্জিবার ক্ষমতা সে কোথায় পাইবে ?

ফলেও তাহা হইল। রোহিণীর প্রতি গোবিন্দলালের যে আকর্ষণ, তাহা অসত্য ও অসার ছিল বলিয়াই অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সেইজন্য ব্রাউনিং-এর কবিতার কোনও নায়কের মত, গোবিন্দলাল রূপ-সেবার স্পর্ধা করিলেও শেষে অকুণ্ঠভাবে বলিতে পারে নাই—

> **How sad and mad and**
> **bad it was**
> **But then, how it was sweet !**

যদি রূপ-সেবাই তাহার সঙ্কল্প হইল, যদি রোহিণীর জন্য ভ্রমরকে সে অনায়াসে ত্যাগ করিল, তবে রোহিণী ও রূপ-সেবা তাহার দেহপ্রাণমন পূর্ণ করিতে পারিল না কেন? তাহার কারণ, ভ্রমরকে যেরূপ, রোহিণীকেও সেইরূপ, সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করে নাই। প্রসাদপুরে গোবিন্দলাল যখন রোহিণীর সঙ্গীতস্রোতে ভাসমান, তখনও ভ্রমরের চিন্তা তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিত। তাহার চঞ্চল চরিত্রে ভাবের বিস্তার বা ঐকান্তিকতা ছিল না ; অতি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ঊর্ধ্বে তাহার কামনা পক্ষ বিস্তার করিয়া মুক্ত হইতে পারে নাই। ক্ষুদ্র দাবিদাওয়ার তুচ্ছতা ছাড়িয়া দিয়া প্রসন্ন প্রীতির অবাধ আলোকে সে কোনদিন নিজে দাঁড়াইতে পারে নাই, রোহিণীকেও দাঁড় করাইতে পারে নাই। সে মানসিক বল, সে idealism, সে অতীন্দ্রিয় কল্পনা, পরিমার্জিত চিত্তের সে সহজ উৎকর্ষ তাহার ছিল না ; তাহা যদি থাকিত, তবে নিজেও অধঃপতিত হইত না, রোহিণীকেও অধঃপতিত করিত না। রোহিণীকে সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছিল ; তাহার বেশি দিবার প্রবৃত্তি বা সঙ্গতি তাহার ছিল না। উভয়ের সম্বন্ধের

মধ্যে কোনও শ্রদ্ধা, কোনও মায়া, কোনও সত্য ছিল না। রোহিণী জানিত যে যতদিন গোবিন্দলাল তাহাকে পায়ে রাখিবে, ততদিন সে তাহার দাসী, তাহার বিলাসের সামগ্রী, নহিলে কেহ নয়। ইহাতে তাহার নিজের সম্মান বাড়ে নাই, বরং দিন দিন নিম্নস্তরে নামিয়াছিল। গোবিন্দলাল রোহিণীকে লঘু করিয়া দেখিয়াছিল বলিয়াই নিজে লঘু হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে রোহিণীকেও লঘু হইতে লঘুতর করিয়াছিল। তাই যে-রোহিণী একদিন তাহার চক্ষে ছিল "তীব্রজ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্তপ্রভাশালিনী, প্রভাতশুক্রতারারূপিণী, রূপতরঙ্গিণী" আজ তাহাকে সুরুচিবিগর্হিত-চিত্র সজ্জিত কক্ষে সামান্য গণিকার মত ওস্তাদজীর তম্বুরার সঙ্গে তবলা বাজাইয়া, অলস ক্ষণের বিলাসের ক্রীড়াপুত্তলী করিতে তাহার কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় নাই। ইহাই বোধ হয় তাহার আমোদ-প্রমোদের চরম ধারণা। অবশ্য রোহিণী ঠিক গ্রামের লজ্জাশীলা বধূ ছিল না; কিন্তু যৌবনচঞ্চলা ও স্বভাবচতুরা হইলেও, গোবিন্দলালের আশ্রয়ে শহরের বাইজীর মত জীবন-যাপনও তাহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। যখন সে বাধাবিঘ্নহীন হইয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিল, গোবিন্দলাল বুঝি পারাবার; কিন্তু অতলে ডুবিতে গিয়া সর্ব দেহে ও মনে পঙ্কের ভার মাখাই তাহার সার হইয়াছিল। যে-রোহিণী একদিন মরিতে ভয় পায় নাই, আজ তাহার নিষ্কৃতির সহজ উপায় যে-মরণ, তাহাতে আর সাহস নাই। দুঃখ-ক্রোধের বেগে গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি রোহিণী, যে তোমার জন্য ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, সুখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত যে ভ্রমর—তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম!" ভ্রমরের জন্য আক্ষেপ স্বাভাবিক হইলেও যেমন নিরর্থক, রোহিণীর উপর দোষারোপও সেইরূপ অবিচারিত ও অমনুষ্যোচিত। সুতরাং, যাহাকে পঙ্কে টানিয়া আনিয়া দেহে মনে নগ্ন করিয়াছে, সে অসহায় জীবন-ভিক্ষায় কাতর স্ত্রীলোক হইলেও, তাহাকে অনায়াসে হত্যা করিয়া বৈরাগীর বেশে বৃন্দাবনে পলাইয়া বাস করা তাহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। তাহার মনুষ্যত্বহীনতা সেইদিন চরম সীমায় উঠিল, যেদিন সামান্য ভিক্ষুকের মত ভ্রমরের নিকট আশ্রয় ও অর্থ ভিক্ষা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না।

রোহিণীর এই অধঃপতনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র বিবৃত করেন নাই, আভাসে দিয়াছেন মাত্র। কিন্তু "মহাপাপিষ্ঠা" বলিয়া ছাড়িয়া দিলে, তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। এ কথা বলিতেছি না যে রোহিণী নিরপরাধ, কিন্তু

ইংরাজীতে যাহাকে more sinned against than sinning বলে, হতভাগ্য রোহিণী তাহার শোচনীয় নিদর্শন। যে দুইটি নারীর করুণ জীবন-কাহিনী লইয়া সমগ্র ঘটনাচক্রের গভীর tragedy বা বিয়োগান্ত পরিণাম, গোবিন্দলাল মূলে না থাকিলে সে চক্র ঘুরিত না। কিন্তু তাহারা মরিল, গোবিন্দলাল শেষে পরম শান্তির অধিকারী হইল,—ইহাই কি নিয়তি?

## শিল্প-কলা

### সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ—এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে যখন একাধারে রূপের অনুকৃতি এবং রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্প-সৃষ্টি। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক বা আধিমানসিক জগৎ—ইহাদের বিরোধ কল্পনা করিলে, রূপ-শিল্পের সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। কেবল অনুকৃতিতে শিল্প হইতে পারে না ; এবং ভৌতিক জগতের আধারে বিদ্যমান চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রতীককে আশ্রয় না করিলে, আধ্যাত্মিক বস্তুর শিল্পময় প্রকাশও অসম্ভব। অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তি—প্রতিস্পর্ধন ও প্রকাশ—এই দুইটিই শিল্পের মৌলিক বা মুখ্য প্রেরণা। বিশ্বপ্রকৃতি এবং জাতি ও সভ্যতার পারিপার্শ্বিক অনুসারে শিল্প-রচনা বিভিন্ন-দেশে ও জাতিতে বিভিন্ন কালে নানা বিশিষ্টতা বা স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত হয়। কিন্তু এই বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও, মূল প্রেরণাদ্বয় এক অখণ্ড মানব-জাতির মধ্যে সর্বত্রই মিলে বলিয়া, এবং অনুকৃতি ও অভিব্যক্তি বিষয়ে সমগ্র মানব-জাতি এক-ই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া, মানবের মনের শিল্পময় প্রকাশও অখণ্ড এবং এক। তদনুসারে, সার্থক শিল্প দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ নহে—তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি, সকল দেশের রসিকজনের আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য। মানব-সমাজের কৃত্রিম জাতি-বিভাগের ঊর্ধ্বে যেমন সাধারণ একটি মানবিকতা বিদ্যমান, তেমনি বিভিন্ন জাতিতে ও কালে মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে এমন নানাপ্রকারের শিল্পের পার্থক্যের ঊর্ধ্বে, শ্রেষ্ঠ শিল্প-রচনার মধ্যে একটি সার্বজনীনতা বিদ্যমান আছে, তাহার অস্তিত্ব ফেলা চলে না। মানসিক অন্য নানা ব্যাপারের মতো, শিল্পকে 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্য' Greek and Gothic, Western and Oriental, Ancient and Modern প্রভৃতি বিভিন্ন বিরোধী শ্রেণীতে রাখা কঠিন। শিল্পের প্রকাশ-ভঙ্গী নানা প্রকারের, কিন্তু ইহার মুখ্য প্রাণ-বস্তু এক এবং দেশকালাতিগ—কোনও জাতির শিল্প

আলোচনার কালে, বিশেষ করিয়া একাধিক জাতির শিল্পের তুলনা মূলক আলোচনার কালে, আমাদের ইহা স্মরণে রাখিতে হইবে।

* * * *

শিল্প অনুকৃতিময় হইবে কিংবা ছন্দোময় হইবে, অথবা প্রতীকময় হইবে কিংবা ভাবময় হইবে, অথবা এই একাধিক প্রকাশ-ভঙ্গীর মিশ্রণ-জাত হইবে—ইহা নির্ভর করে, শিল্পের আবশ্যকতা, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের উপর। অনুকৃতি ও প্রকাশ, এই মৌলিক প্রেরণাদ্বয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তৃতীয় প্রেরণারূপে আবশ্যকতা, উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনকে উল্লেখ করিতে হয়। সকল যুগে বা সকল জাতির মধ্যে শিল্পের প্রয়োজন এক-ই প্রকারের থাকে না। আদিম প্রত্ন-প্রস্তর যুগে মানুষ যখন হাড় বা শিঙের উপরে পাথরের ছুরি চালাইয়া হরিণ, মাছ বা বুনো ঘোড়ার ছবি খুদিত, রঙ দিয়া পাহাড়ের গায়ে ঘোড়া, গোরু, মহিষ বা শূকরের ছবি আঁকিত, তখন তাহার যে উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য আজকালকার পরের মুখ চাহিয়া যাহাকে থাকিতে হয় না এমন প্রচুর বৈভবশালী স্বাধীন শিল্পস্রষ্টার নহে; এবং যাহাকে ফরমাইশ মতো বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতে হয়, তাহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন ইহাদের উভয়ের উদ্দেশ্য হইতে পৃথক্। প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিল্পী মূর্তি খুদিত বা ছবি আঁকিত, এই মূর্তি বা ছবির magic বা মায়াজাল বিস্তার করিয়া বন্য পশুকে সহজে মৃগয়া করিবার উদ্দেশ্যে; ছবির জাদুতে বা সম্মোহনী শক্তিতে পশু-মৃগয়াকে সহজ করিয়া আহার্য সুলভ করাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পীর মুখ্য প্রেরণা—ইহা-ই নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত। কিন্তু মৃগয়ার জন্য মায়াজাল বুনিবার উদ্দেশ্য একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিতে পারে নাই—অলংকরণ এবং সৌন্দর্য-বোধের প্রেরণাও যে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীর মনে ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত আছে। উত্তর-কালে বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগে মানুষের হাতের কাজ শিল্প-বস্তুতে, সম্মোহনী ও সৌন্দর্য্যবোধ, উভয় প্রকারের তাগিদ, পৃথক বা মিলিত-ভাবে, শিল্প রচনায় কাজ করিয়া আসিয়াছে। আদিম যুগে যে জাদু বা সম্মোহনীর প্রয়োজন শিল্পপ্রাণের বা শিল্প-রচনার আবাহন করিয়াছিল, পরবর্তী কালে মানবের আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই জাদু বা সম্মোহনী, দেবীপ্রতীকের এবং ধর্মানুষ্ঠান-সম্বন্ধীয় শিল্প-চেষ্টায় উন্নীত হইল। আদিম মানবের জাদুবিদ্যার প্রয়োগে যে বাক্য, যে মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত, তাহার আধারের উপরে সংগীত—বিশেষ করিয়া ধর্ম-সংগীত এবং স্তোত্রাদি আধ্যাত্মিক

সাহিত্য—গঠিত হইল। চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় মানুষের হৃদয় ও মন, মানুষের ভাব-জগৎ—অপার্থিব অনুভূতির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সঙ্গীত, পাঠ ও অনুষ্ঠানের ন্যায়, শিল্পও হইল ধর্মের সেবায় আত্মনিয়োজিত।

সৌন্দর্য-বোধ দ্বারা উদ্বোধিত অপার্থিব সত্তার অনুভূতি অথবা অনুভূতির আভাস—সুসভ্য জন-সমাজে এখন ইহা-ই হইতেছে শিল্পের চরম উদ্দেশ্য। শিল্পের এই উদ্দেশ্য প্রাচীন মিসরে, বাবিলনে, এবং বিশেষ করিয়া প্রাচীন গ্রীসে, ভারতবর্ষে ও বৃহত্তর ভারতে—বৌদ্ধ চীন ও জাপানে এবং মধ্যযুগের খ্রীষ্টান জগতে দেখা যায়। যে-সকল জাতি সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল এবং লক্ষণীয় শিল্প রচনা করা যাহাদের দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শিল্পের আদর হইয়াছে ধর্মের বা আধ্যাত্মিক সাধনার পথ হিসাবে। তাহারা মানব-জাতির গৌরব-স্বরূপ বিভিন্ন শিল্প-শৈলী বিশ্বমানবকে উপহার দিয়া গিয়াছে। যে-জাতি বাস্তব সভ্যতায় পিছনে পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যেও শিল্পের আকর্ষণ দেখা যায়—ধর্মানুভূতি তাহাদের মধ্যেও শিল্পের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে; যেমন আফ্রিকার নিগ্রোজাতীয় লোকেরা। কিন্তু সভ্যতার পথে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর য়িহুদী ও আরবদের আদি পুরুষ উত্তর-আরবের মরুবাসী শেমীয় জাতির মধ্যে আদিম যুগেই তাহার ধর্ম-বোধে প্রতীকের ভীতি আসিয়া যায়। শেমীয় জাতির মধ্যে প্রাচীনতম কালে সভ্যতার উন্নতি তেমন হয় নাই, তাই শিল্পকলা তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; শিল্প-সম্বন্ধে অক্ষমতা, এই জাতির মনে প্রতীক বা মূর্তির সম্মোহনী শক্তি বিষয়ে একটা ভয়ও আনিয়া দিয়াছিল; এবং আদিম মনোভাবের পরিচায়ক এই ভয়, পরে কল্পনান্তর-অসহিষ্ণু দেবকল্পনা-বিশেষের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে, আরও সুদৃঢ় হইয়া, মূর্তি-প্রতীকের বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। অহৈতুক ভয় হইতেই অহৈতুক বিদ্বেষের উদ্ভব ঘটিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ এবং কচিৎ নাসিকা—এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের সহযোগে আমরা চিত্তকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া লইতে পারি। এই জন্যই ধর্মানুষ্ঠানে মূর্তি বা চিত্রের এবং সঙ্গীত বা পাঠের স্থান অল্প-বিস্তর সকল ধর্মই স্বীকার করিয়া লইয়াছে, মন্দিরে ও দেবায়তনে ধূপ-ধুনা, সুগন্ধি কুসুম প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ধর্ম-সাধনায় যাঁহারা মূর্তি বা রূপ-শিল্প বর্জন করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রোত্র ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে প্রশ্রয় দিয়া নিতান্ত অযৌক্তিকতার সহিত চক্ষুরিন্দ্রিয়কে পরিহার করেন।

শিল্প-সম্বন্ধে সুসভ্য হিন্দু, গ্রীক ও চীনা জাতির ( এবং এই তিন জাতির শিষ্য-স্থানীয় আরও কতকগুলি জাতির ) মনোভাব সম্পূর্ণ পৃথক্—এই তিন প্রাচীন জাতি রূপ শিল্পকে মানবের এক প্রধান কৃতিত্ব বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। গ্রীক-জাতির শিল্প-প্রাণতার কথা আমরা সকলেই জানি ; বিশ্বমানবকে গ্রীক-জাতির প্রতিভা অপরূপ শিল্পের মহিমায় উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে। চীনা ও জাপানী জাতিদ্বয়ের শিল্প-চেতনাও পৃথিবীতে অপূর্ব এবং আধুনিক জগতে একক। ভারতবর্ষে শিল্প সেদিন পর্যন্ত জীবনের অঙ্গভূত হইয়া-ই ছিল— দৈনন্দিন জীবন হইতে শিল্পকে পৃথক্ করিয়া দেখা হইত না। তাই, ভারতীয় জনগণের শিল্প-বোধ স্বত-উৎসারিত হইয়া-ই বিদ্যমান থাকিত, তাহার পৃথক্ বিশ্লেষের জন্য পণ্ডিতগণ চেষ্টিত হন নাই। সাহিত্য-বিচারে, দর্শনে ও অন্য কতকগুলি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের চিন্তানেতৃগণ যেমন শক্তি দেখাইয়াছেন, রূপ-শিল্পের চর্চায় তেমন শক্তি দেখান নাই। গুপ্তযুগে ভারতীয় শাস্ত্রের ও শিল্পের স্বর্ণযুগ অতিবাহিত হইয়া গেল, তথাপি ভরত, দণ্ডী, মম্মট প্রভৃতির মতো রূপ-শিল্পের সমালোচক পণ্ডিত দেখা দিলেন না। এইখানে ভারতীয় সংস্কৃতির বাঙ্ময় প্রকাশের একটা দিক অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

* * *

কিন্তু প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য-বোধ ও শিল্প-চেতনা সম্বন্ধে ভারতীয় বাঙ্ময় একেবারে নীরব নহে। সৌন্দর্য-বোধ ভারতের আর্যজাতির মধ্যে যথেষ্ট ছিল—এবং সুসভ্য অনার্য জাতিগুলির মধ্যেই যে ভারতের রূপ-শিল্প জন্মগ্রহণ করে, ও প্রথম বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করে, আজকাল একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। জগতে কোনও কিছুকে ভালো বা লক্ষণীয়, প্রধান বা তুলনায় উৎকর্ষযুক্ত হইতে হইলে, তাহার প্রধান উপলব্ধি-যোগ্য গুণ থাকিবে তাহার সৌন্দর্য ; ভারতের আর্যজাতির সুপ্ত চেতনায় সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষের পরস্পরের সংযোগ সম্বন্ধে এই প্রকার বোধ বা বিচার ছিল। সেইজন্য 'শ্রী'-শব্দ হইতে সাধিত, 'শ্রী'-র তারতম্য বা অতিশায়ন-বাচক দুইটি শব্দ 'শ্রেয়স্, ( শ্রেয়ান্, শ্রেয়সী, শ্রেয়ঃ )' এবং 'শ্রেষ্ঠ', সংস্কৃত ভাষায় সর্ববিধ উৎকর্ষের, এমন কি চরম বা পরম উৎকর্ষের অর্থে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। 'শ্রী' শব্দের প্রধান ও প্রাচীনতম অর্থ, নেত্রের সাহায্যে দর্শনীয় দ্যুতিমান্

সৌন্দর্য ; যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে এই 'শ্রী' বা 'সৌন্দর্য' আছে, তাহা-ই 'শ্রেয়স', তাহা-ই 'শ্রেষ্ঠ'—সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ দুই যেন মিশিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু কোনও পদার্থ 'সুন্দর' হইলেই মঙ্গলময় হইবে—এই বোধেই সৌন্দর্য-বাচক 'কল্যাণ ( কল্য )'—শব্দের প্রাথমিক অর্থ 'সুন্দর' ( যে অর্থ 'কল্য'-শব্দের গ্রীক প্রতিরূপ kalos, kallos-এ পাই ), 'মঙ্গল, ক্ষেমংকর' এই অর্থে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যের মনোভাব যেন গ্রীক আর্যের মতোই ছিল—গ্রীকদিগের kaloskagathos আদর্শের অনুরূপ—'যাহা সুন্দর, তাহা-ই ভালো'। আবার, যাহা ভালো করিয়া বুঝা যায়, চিৎশক্তির দ্বারা গ্রহণ করা যায়, তাহা-ই 'চিত্র ( চিৎ-র )' অর্থাৎ 'সুন্দর'। এইরূপ কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করিয়া জর্মান পণ্ডিত Oldenberg ওল্‌ডেন্‌ব্যার্গ ভারতের আর্য্যজাতির চিত্তে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মতো একটি সৌন্দর্য-বোধের ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সহজ সৌন্দর্য-বোধের স্রোতস্বতী আর্য ও অনার্য নির্বিশেষে ভারতের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কখনো অবলুপ্ত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম ধর্মানুষ্ঠান তাহার মূর্তি বা রূপবিরোধী ভাব সম্পূট ভারতে লইয়া আসিলেও, রূপরসিক পারস্যের প্রভাবে ইতিপূর্বেই এই ধর্মের রূপ-বিরোধিতা অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তুর্কী, ঈরানী ও অন্য বিদেশীয় মুসলমানের আগমনে এদেশে রূপ-শিল্পের ধ্বংস ঘটে নাই ;—বরঞ্চ, পারস্যের মুসলমান সভ্যতার সহিত ভারতের হিন্দু মনোভাবের আশ্চর্য সাহচর্য ঘটায়, ভারতে মোগল চিত্রকলার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে।

*   *   *

শিল্পের উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যুগের ঋষিদের চিন্তা বা ধারণা কত উচ্চ ছিল, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই বচনটি হইতে অনুধাবন করা যাইবে—

॥ আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে ॥ ( ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ষষ্ঠ পঞ্চিকা, পঞ্চম অধ্যায়, প্রথম মন্ত্র )।

নিশ্চয়-ই, শিল্প-সমূহ আত্ম-সংস্কৃতির কারণ। যজমান বা শিল্পানুষ্ঠাতা নানা প্রকার শিল্পের দ্বারা নিজ আত্মাকে পরিপূর্ণরূপে ছন্দোময় করিয়া থাকেন ॥

মানুষকে উন্নত ও উন্নীত করিতে যে শিল্পেরও সামর্থ্য আছে, তাহা ব্রাহ্মণ-স্বীকার করিয়াছেন। উপরে প্রদত্ত মন্ত্রাংশের পূর্বে ঋষি বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন—'হস্তী, কংসো, বাসো, হিরণ্যম, অশ্বতরীরথঃ

শিল্পম্'—হাতীর দাঁতের কাজ ( মূর্তি, ফলক প্রভৃতি ), কাংস্য বা তামা, কাঁসা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতে প্রস্তুত শিল্প-দ্রব্য, বিচিত্র বসন, স্বর্ণালংকার ও নানা প্রকার স্বর্ণ-শিল্প, অশ্বতরী যুক্ত রথ—এই প্রকারের শিল্প। এই সব শিল্প রচনায় বা দর্শনে মানুষের মনকে সংস্কৃতিযুক্ত করে, উদার করে, বিশ্বাত্মার সহিত মিলিত-ভাবে ছন্দোময় করে।

জগতে নিসর্গ-জাত বস্তুর পরেই, মানুষের হাতের শিল্প-রচনাকে ভগবানের সত্তার এবং তাহাতে নিহিত শাশ্বত সৌন্দর্যের অংশ-স্বরূপ বলা যায়। গীতায় বলা হইয়াছে—

যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ( ১০।৪১ )

তুমি ইহা জানিও যে, বিভূতি বা ঐশ্বর্য-যুক্ত, শ্রী-বা শোভা-যুক্ত এবং শক্তিমান্ বা প্রভাবশালী যে-যে পদার্থ আছে, সে-সমস্ত-ই আমার-ই তেজ বা শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন॥

—এ কথা শিল্প-সম্বন্ধেও বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য।

* * *

ব্যক্তি-গত ও সমাজ-গত জীবনে শিল্পের প্রভাব লইয়া অনেক কথা বলা হইয়াছে, অনেক কথা বলা যায়। সৎ বা উচ্চ কোটির শিল্প আমার কাছে আধ্যাত্মিক অনুভূতির আভাস আনয়ন করে। যাঁহারা সহজ ভক্তি অথবা দার্শনিক বিচারের দ্বারা পরমার্থ বা শাশ্বত সত্তাকে জীবনে উপলব্ধ করিয়াছেন, যাঁহারা বলিতে পারেন—'বেদাহমেতম্ পুরুষম্ মহান্তম্'—তাঁহাদের চরণে আমাদের প্রণাম। কিন্তু আমাদের মতো অনেকে আছে, যাহাদের উপলব্ধি বা অনুভূতি হয় নাই এবং যাহারা বিচার এবং তত্ত্বালোচনার পথ উন্মুক্ত রাখিয়া অনুভূতির আবাহন করিতেছে, যাহাদের কাছে তত্ত্ব গুহানিহিত হইয়া-ই আছে, উপলব্ধি বা অনুভূতি তাহাদের কাছে জ্ঞান বা বিচারের সিংহদ্বার দিয়া আসিতে চাহে না, emotion বা ভাবাবেগ অথবা রসাবেশের খিড়কি-দ্বার দিয়াই তাহাদের চিত্তে অনুভূতির ছায়া বা আভাস কখনও চকিতের ন্যায় উঁকি দিয়া চলিয়া যায়। এই emotion বা ভাবাবেগকে দৌর্বল্যের পরিচায়ক বলিয়া অনেকে বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃতি-জাত এবং দেহেন্দ্রিয়াশ্রয়ী emotion বা ভাবরাজিকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টায়, প্রায়-ই দেখা যায় যে প্রতিক্রিয়ার ফলে আধ্যাত্মিক বা মানসিক কুফল

ঘটিয়া থাকে। বরং ইহা-ই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, কী করিয়া চিত্তের ভাবরাজিকে আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবনে শ্রেয় ও কল্যাণের পথে শাশ্বত বস্তুর উপলব্ধির পথে চালিত করিতে পারি। এই ভাবরাজিকে শোধন করিয়া লইতে একমাত্র সুকুমার কলাই সমর্থ হইয়া থাকে।

সংগীতকে তাবৎ সুকুমার কলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐশীশক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল বর্ণনা করিয়াছেন। সংগীত বা বাদ্য শ্রবণে মানুষের চিত্ত বাস্তব হইতে উর্ধ্বে উন্নীত হয়, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বা উদাহরণ আছে, এ বিষয়ে আমাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। ধ্রুপদ চৌতাল সংগীত শ্রবণে অনেকের ভাবাবেশ হয়, দেবারাধনার এবং দেব-সান্নিধ্যের অনুভূতি আইসে; বৈষ্ণব কীর্তনে বা সুফী গজলে ভক্ত বা মজজুব জনের 'হাল' বা 'দশা'-প্রাপ্তি ঘটে। স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুরে সংস্কৃত বা লাতীন বা আরবী মন্ত্র উচ্চারণে, অথবা ইংরেজী বা অন্য আধুনিক ভাষায় পাঠে, অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য মনের উন্নয়ন ঘটিতে দেখা যায়।

* * *

সংগীতে যাহা হয়, শিল্প-কলা বা রূপ-কলার দ্বারাও তাহা-ই হয়। শ্রেষ্ঠ গ্রীক বা ভারতীয়, চীনা বা জাপানী ভাস্করের কৃতিত্ব কোনও দেব-মূর্তি; চীনা বা জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যপট; বিজাতীয় মোসাইক কাজ; পারস্য-দেশীয় গালিচার অপূর্ব চিত্র এবং বর্ণসমাবেশ; মধ্যযুগের হিন্দু অথবা খ্রীষ্টানী চিত্র-কলা; এবং পার্থেনন, তাজ-মহল, শার্ত্র্-এর গির্জা, সান্-মার্কোর গির্জা—প্রভৃতি বাস্তু-শিল্পের বিরাট কীর্তি: —এ সমস্ত দর্শনে ও অনুধ্যানে অনেক সময়ে প্রার্থনার দ্বারা ভাবরাজির উদ্বোধনের মতো মনকে আবিষ্ট করে। তখন শিল্প-জগৎকে লক্ষ্য করিয়া বলা যায়—

'রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি'।

* * *

শিল্পের প্রকৃষ্টভাবে আলোচনা মানব-চিত্তের সাধারণ-ভাবে উৎকর্ষ-বর্ধনের এক প্রধান পথ। শিল্পের মধ্যে জাতির উৎকর্ষের, জাতির আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং জাগতিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ ভাবধারা কী ভাবে একটি বিশিষ্ট জাতির শিল্পকে উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করিল, ইহাকে পুষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিল; যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির জাতীয় শিল্পে লক্ষণীয় ভঙ্গী বা বৈশিষ্ট্য কী; কী ভাবে শিল্প হইতে জাতির সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করিল, কিংবা

জাতির চরিত্র ভ্রষ্ট বা বিক্ষিপ্ত হইল ; জাতির মৌলিক প্রকৃতি তাহার শিল্পের মধ্যে কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং এই মৌলিক প্রকৃতি কী উপায়ে বিদেশীয় অথবা ভিন্ন জাতির প্রকৃতি-জাত শিল্প-রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত—প্রবর্ধিত বা ব্যাহত হইল ; বিভিন্ন যুগের সামাজিক, ধর্মীয় এবং বাস্তব সভ্যতা কী ভাবে শিল্পে প্রকটিত হয় ; —এই সমস্ত বিষয় লইয়া বিচার, জাতির রাষ্ট্রনৈতিক বা দার্শনিক, সমাজনৈতিক বা অন্তবিধ ইতিহাস আলোচনা অপেক্ষা কম উপযোগী এবং চিত্তের পরিপোষক বিদ্যা নহে। বিদ্যালয়ে আমরা ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করি, কিন্তু জাতির আত্মার সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ের ক্ষেত্র-স্বরূপ তাহার শিল্প-কলার আলোচনা-সম্বন্ধে আমাদের কোনও উৎসাহ বা আকাঙ্ক্ষা নাই। অথচ, জাতির মধ্যে উদ্ভূত দ্রব্য অবলম্বনে আমরা সহজেই সুন্দর-ভাবে তাহার ইতিহাসের ও চিন্তার, সভ্যতার ও নৈপুণ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিতে পারি। নানা যুগের শিল্প-দ্রব্য দর্শনে এই পরিচয় ঘটিতে পারে, সুতরাং ইহা মনের উপরে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায়, ভাসা-ভাসা থাকিতে পারে না।

আমাদের বিদ্যালয়ে শিল্পেতিহাস এবং শিল্পাস্বাদন উভয়-ই অল্প-বিস্তর পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া উচিত। মানসিক সংস্কৃতির পথে এই বিষয় দুইটি অপরিহার্য। বিদেশে নানা স্বাধীন জাতির মধ্যে শিক্ষা-জগতের নেতৃস্থানীয় মনীষীদের চিত্ত এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—Art Education-কে সকলেই সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া লইবার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করিতেছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও তেমন উৎসাহ নাই। দেশের বা বাহিরের শিল্প-সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, এরূপ 'শিক্ষিত' ব্যক্তি এ দেশে প্রচুর। আমার মনে হয়, প্রথমটায় কেবল ইতিহাস বা মানব-সভ্যতার অঙ্গ-স্বরূপ শিল্পেতিহাসের চর্চা আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে প্রবর্তিত হইতে পারে। তৎপরে এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি পড়িতে পারে, এবং সাধারণ উচ্চ শিক্ষার মধ্য দিয়া, কাব্যাস্বাদনের সঙ্গে-সঙ্গে শিল্পাস্বাদন করাইবারও চেষ্টা হইতে পারে।

* * *

ভারতের শিল্পের ঐতিহাসিক যুগের ধারাটি—অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের শিল্প-কাহিনী—মোটামুটি আমরা ধরিতে পারিয়াছি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আলেক্সান্দর কানিঙ্‌হাম, জেমস্ ফর্গুসন, ঈ. বী. হাভেল্, আনন্দ কুমারস্বামী, গ্রান্‌ভেডল্, ফুশে,

গোলুবিএভ্, বাখ্হোফর্, জন্ মার্শাল, গ্রিফিথ্স্, স্পুনর, পার্সি ব্রাউন্, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উইলিয়াম্ কোন্ ডিএট্স্, গোট্স্, গোপীনাথ রাও, স্তেল্লা ক্রামরিশ, কোগেল্, ডোবিং, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, আলিস্ গেটি, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নানালাল চমনলাল মেহ্তা, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অজিত ঘোষ, ঝু- তো-হ্যারোাই, কৃষ্ণশাস্ত্রী, রয়টার, রানে গ্রুসে, নলিনী কান্ত ভট্টশালী, সভার খয়্রী, নর্ম্যান ব্রাউন্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায়, ভারতের প্রাচীন ও মধ্য-যুগের শিল্পের ইতিহাসের গতি আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু সব কথা জানা যায় নাই। ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তির কথা, এবং ইহার প্রাথমিক অর্থাৎ মৌর্য-পূর্ব যুগের ইতিহাস—সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও স্পষ্ট ধারণা এখনো হয় নাই। অতীতের অন্ধতমিস্রাময় প্রাগৈতিহাসিক যুগে কোন্-কোন্ জাতির রক্ত মিশিয়া প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু জাতিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল ;—অস্ট্রিক বা অস্ট্রো-এশিয়াটিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গোল, সম্ভবতঃ ফিন্নো-উগ্রীয় বা উরালীয়, এবং আর্য জাতি,—ভারতের হিন্দু সভ্যতার গঠনে কে কোন্ উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এ-সমস্ত তথ্য এখন অজ্ঞাত, অবলুপ্ত। আদিত্তনল্লুর ও মোহেন্-জো-দড়োর যুগ হইতে মৌর্য-যুগ পর্যন্ত তিন-চারি হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পের ইতিহাস এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এই কার্যে ভারত এবং ইউরোপের নৃতত্ত্ববিৎ, সমাজতত্ত্ববিৎ, প্রত্নবিৎ, ভাষাতত্ত্ববিৎ এবং ঐতিহাসিকগণের সমবেত চেষ্টা অপেক্ষিত। কত দিনে ভারতের প্রাচীন শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ দিগ্দর্শন ঘটিবে, তাহা আমরা জানি না। বস্তুর অভাবে এখানে বিচারের বিশেষ অবকাশ নাই।

* * *

ভারতের অংশীভূত আমাদের বঙ্গদেশের শিল্পের কথাও আমরা তেমন জানি না। বাঙ্গালী তাহার সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া, তাহার ভাষার ইতিহাস লইয়া কাজ করিতেছে—সুফলও তাহাতে যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গীয় বাঙ্ময়ের অতিরিক্ত, বঙ্গদেশের বাস্তব-সংস্কৃতির প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি না। বাঙ্গালা ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ ধরিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে, আমরা বাঙ্গালী জাতির কল্পনা করিতে পারি না। আমার মনে হয়, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি যখন বঙ্গ ও মগধে পাল-রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটিল, তখন বাঙ্গালা ভাষাও রূপ ধারণ করিল ; তখন হইতেই বাঙ্গালী বা বঙ্গভাষী জাতির

উদ্ভব হইয়াছে, ইহা ধরিয়া লইতে পারি। এই নব-সৃষ্ট বা সৃজ্যমান বাঙ্গালী জাতি প্রথম হইতেই মানসিক ও বাস্তব উভয় প্রকার সংস্কৃতিতে লক্ষণীয় কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয়। বঙ্গদেশের তুর্কী-পূর্ব যুগের সংস্কৃত-চর্চা ভারতের সংস্কৃত-বিদ্যার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে—বঙ্গদেশের পণ্ডিতদের "গৌড়ী-রীতি"র রচনাকে সারা ভারতবর্ষও সম্মান করিয়াছে। বঙ্গদেশ হইতেই বৌদ্ধ আচার্যগণ ভোট-দেশ বা তিব্বত, সুবর্ণভূমি বা বর্মা, এবং দ্বীপময় ভারতে গিয়া বৌদ্ধ-ধর্মকে সংস্কৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও শৈব সাধকেরা সারা উত্তর-ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তীর্ণ করেন। শিল্প-জগতেও নিখিল-ভারতের জাতীয় শিল্প—ভাস্কর্য ও চিত্র-কলা—এই দুইটিকেই নূতন ভাবধারায় অভিষিক্ত করিয়া, বঙ্গীয় শিল্পিগণ একটি নূতন শিল্প-ধারার প্রবর্তন করেন,—ষোড়শ শতকের তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারনাথ সে-কথা আমাদের জানাইয়া গিয়াছেন, এবং রীতি-প্রবর্তক দুইজন প্রধান শিল্পীর নামও আমাদের বলিয়া গিয়াছেন—বীতপাল ও ধীমান্। পাল-যুগের গৌড়-মগধ শিল্প ভারতীয় ভাস্কর্যে এক নবীন বস্তু আনয়ন করিল, ভারতের শিল্প-জগতে ইহা পূর্ব-ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, বিশিষ্ট দান। পাল ও সেন যুগের বিষ্ণু, হরগৌরী, দুর্গা, সূর্য, বুদ্ধ, বোধি-সত্ত্ব, তারা, মারীচি প্রভৃতি মূর্তির মতো ধ্যান-স্থির দেবতামূর্তির এমন অপরূপ ভাব-শুদ্ধ বিলাস মধ্য-যুগের ভারতের শিল্পে আর কোথায় পাওয়া যায়? এই গৌড়-মগধ শিল্পের প্রভাব বাঙ্গালা ও বিহারের বাহিরে, দেশ-দেশান্তরে প্রসৃত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ধ্যানতা দেব-মূর্তি, নেপালে, এবং ভারতের বাহিরে ভোট-দেশে, ব্রহ্মে, চীনদেশে, যবদ্বীপে, সমস্ত বৌদ্ধ-ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী দেশে, ভক্ত ও সাধকগণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতের শিল্পের এই অভিনব ধারা গৌড়-মগধ শিল্প, বৃহত্তর ভারতের মধ্যে এক আন্তর্জাতিক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

* * *

প্রথম যুগের শিল্প-কলার আলোচনা রসজ্ঞ শিল্প-তত্ত্ববিদ্গণের চেষ্টায় সুস্থাপিত হইলেও, পরবর্তী কালের বাঙ্গালীর শিল্পময় প্রকাশ সম্বন্ধে এখনও আমরা অবহিত হইতে পারি নাই। তুর্কিদের আগমনের পূর্বের যুগের বঙ্গদেশীয়—গৌড়-মগধ-জাত—শিল্প-রীতির মধ্যে, বাঙ্গালার বাস্তু-শিল্প প্রাচীন মন্দিরাদির তেমন আলোচনা হয় নাই। মুসলমান-পূর্ব যুগের পাথরের বা ইটের তৈয়ারী যে অল্প কয়েকটি বাঙ্গালার বাস্তু-শিল্পের নিদর্শন-স্বরূপ

বিদ্যমান আছে, সেগুলিকে আশ্রয় করিয়া, প্রথম যুগের বাঙ্গালার গৃহ-শিল্পের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা এখনও হয় নাই। মুসলমান রাজাদের আমলে পাথরে দেউলে তোলার পাট বাঙ্গালাদেশের হিন্দুদের মধ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গেল—পাথরের স্থাপত্যের সঙ্গে-সঙ্গে পাথরের ভাস্কর্য ও প্রায় শেষ হইয়া গেল। মন্দির ও ইমারতের ইট কাটিয়া, নূতন ধরনের পোড়া-মাটির ভাস্কর্য আরম্ভ হইল—হিন্দু মন্দিরের দেব-দেবী নর-নারী পশু-পক্ষী লতা-পাতা প্রভৃতির ছবি, মুসলমান মসজিদে নানা রকমের নকাশি কাজের অলংকার। বাঙ্গালার এই নবীন স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের চর্চা, বা ইহা লইয়া গবেষণা, এখনও হয় নাই; যে স্থাপত্য পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের সুন্দর মন্দিরাবলী, উত্তর-বঙ্গের অন্য নানা মনোহর মন্দিরের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আলোচনা—এবং বাঙ্গালী কলাবিদের হাতে তাহার আলোচনা—না হওয়া লজ্জার কথা। বাঙ্গালীর মধ্য-যুগের চিত্র-শিল্প ও মূর্তি-শিল্প রাজসভায় আদৃত মহিমময় শিল্প-স্বরূপ এখন আর বিদ্যমান নাই—ইহা এখন পল্লী-অঞ্চলে অনাদৃত অখ্যাত গ্রাম্য শিল্পের কোঠায় নীত হইয়া, স্বদেশী ও বিদেশী ছাপা ছবি এবং সেলুলয়েড পুতুলের প্রতিযোগিতায় আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে। মধ্য-যুগের বাঙ্গালার চিত্র-শিল্প লইয়া—পুঁথির পাটার ছবি, পট, চাল-চিত্র ও অন্য ছবি, এবং কালীঘাটের পট প্রভৃতি বাঙ্গালীর বিশিষ্ট শিল্প-প্রকাশের নিদর্শন লইয়া বাঙ্গালী শিল্পবিদ্‌গণের আলোচনা এখনও অপেক্ষিত। বাঙ্গালার গ্রাম-শিল্পের আধারে বিগত খ্রীষ্টীয় শতকের শেষ-পাদে কলিকাতায় একটি ইউরোপীয়-ভাব মিশ্র নূতন শিল্প-ধারা ধীরে-ধীরে প্রবর্তিত হয়। পাথরের-ছাপা রঙ্গীন দেব-দেবী-চিত্রে এবং পৌরাণিক ও ক্বচিৎ ঐতিহাসিক ও সামাজিক চিত্রে ইহার একটি লক্ষণীয় এবং সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছিল। ইহারও সম্যক আলোচনা আবশ্যক; কিন্তু ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে কাগজের উপরে ছাপা এই-সব রঙ্গীন লিথোগ্রাফের ছবি এখন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য—আধুনিক যুগের বাঙ্গালীর একটি বিশেষ শিল্পময় আত্মপ্রকাশের নিদর্শন এইরূপে প্রায় অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। বহু প্রাচীন পরিবারে পুরাতন আমলের ছবি-রূপে ফ্রেমে বদ্ধ হইয়া এই সব ছবি এখনও দুই চারিটা থাকিতে পারে—এগুলিকে রক্ষা করিয়া, সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য অবহিত হওয়া উচিত।

* * *

বাঙ্গালীর শিল্পকে জীবন্ত করিতে হইলে, বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যে নিহিত

সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, আদর্শবাদ ও বাস্তবিকতা—এই সমস্তকেই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই ফুটাইয়া তোলার সার্থকতা থাকিবে—অজন্টা বা মোগল শিল্প, অথবা পুঁথির পাটার ছবির ভঙ্গীতে নহে, ইহার অন্তর্নিহিত সত্য-দর্শনের মধ্যে এবং শক্তিময় প্রকাশের মধ্যে। "যে হউক সে হউক ভাষা —কাব্য রস লয়্যা"—কবি ভারতচন্দ্রের সাহিত্য-বিষয়ে এই উক্তি আমাদের মনে রাখিতে হইবে। ভঙ্গী যাহা-ই হউক না কেন—সারল্য ও সততা-ই হইতেছে সার্থক শিল্পের প্রাণ। বাঙ্গালীর জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আশঙ্কার মধ্যে যদি কিছু বড়ো জিনিস থাকে—এমন জিনিস যাহা সত্য-সত্যই সমগ্র জাতির দেহ মন ও প্রাণকে নাড়া দেয়, তবে সবদর্শী এবং কৃতী শিল্পী থাকিলে তাহার উপযুক্ত শিল্পময় প্রকাশ হইবেই। আর বাঙ্গালীর জীবন যদি ক্ষুদ্র ও নগণ্য থাকে, হাজার অজন্টার ভারত বা রেনেসাঁস ইটালী, আধুনিক ইউরোপ বা জাপানের অনুপ্রেরণা তাহাকে শিল্পে বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। শিল্প ও সাহিত্য, এ-সমস্ত-ই জীবনের অংশ—এ কথা আমাদের অহরহঃ মনে রাখিতে হইবে। বাঙ্গালীর জীবনে মহাকাব্যের অনুরূপ রচনার বস্তু না পাইতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালা-শিল্পী বাঙ্গালীর ঘরোয়া জীবন লইয়া, ওলন্দাজ শিল্পীদের মতন অথবা জাপানী Ukiyo-yo 'উকিয়ো-য়ে' শিল্পীদের মতন এক অভিনব গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন-সংপৃক্ত চিত্রণ-রীতি তাঁহার আয়ত্তের বাহিরে হওয়া উচিত নহে। এখানেও সত্যতা ও সত্যদৃষ্টি চাই, চোখ ও হাত চাই।

* * *

বাঙ্গালা শিল্প-ক্ষেত্রে এখন কোনও আদর্শ, কোন বিশেষ রীতি নাই; জাতীয়তার নামে, Indian Art-এর দোহাই পাড়িয়া, ইউরোপীয় নকল-শিল্পের উপরে এক পোঁছ প্রাচ্যামির রঙ লেপিয়া, এখন সাধারণতঃ বাঙ্গালী শিল্পী আত্মপ্রকাশ বা আত্ম-বঞ্চনায় ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে একমাত্র দিগ্‌দর্শন আসিতে পারে, —প্রথমতঃ শিল্পীদের মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্ধনে—শিল্পেতিহাসের আলোচনায়, মিশরীয়, গ্রীক, বিজাতীয়, প্রাচীন ভারতীয়, গথিক, চীনা, জাপানী, রেনেসাঁস প্রভৃতি শিল্পের বড়ো-বড়ো সৃষ্টির অনুধ্যানে; দ্বিতীয়তঃ—বহুবর্ষব্যাপী সাধনার দ্বারা সৌন্দর্যগ্রাহী দিব্যদৃষ্টি লাভে, এবং দিব্যদৃষ্টির প্রকাশক তুলিকা বা ছেনী চালনার শক্তি অর্জনে। দেশের শিল্পের ধারাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিজ প্রচেষ্টাকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে

-না দিলে, দেশের মাটি হইতে রস পাইয়া তবে নিজ শিল্প প্রাণবন্ত থাকিবে। যুগ-প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথ, সিদ্ধ-শিল্পী রূপপতি নন্দলাল, ভাবুক রূপকার যামিনীরঞ্জন—নবীন বাঙ্গালার শিল্প-জগতের এই ত্রয়ী শক্তির অনুপ্রেরণা, তরুণ বাঙ্গালী শিল্পীকে অমৃতের সন্ধান দিতে পারিবে, মানসিক ও শিল্প-বিষয়ক সংস্কৃতি ও উপলব্ধি, শক্তি ও দৃঢ়তা, সত্য-দর্শন ও সত্যপ্রকাশনের সাধনায় তাহার জন্ম যুগোপযোগী পথ নির্দেশ করিতে পারিবে ॥

[ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ ]

# ছোটগল্প

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ছোটগল্প ঘটনা-শুক্তিতে নিহিত একটি ক্ষুদ্র, নিটোল মুক্তা, ছোট ঝিনুকে পরিবেশিত এক বিন্দু জীবন-রসনির্যাস, ললাটলিপিতে উৎকীর্ণ একবাক্যাত্মক একটি গাঢ়বদ্ধ জীবনানুশাসন। মানুষের জীবনে কত এলোমেলো, বহু-বিস্তৃত, অসংবদ্ধ অভিজ্ঞতার সমাবেশ। ঔপন্যাসিক সেই ইতস্ততবিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল উপাদানরাশিকে তাৎপর্য-সূত্রে গাঁথিয়া এক বৃহৎ পরিণতির দিকে লইয়া যান। ছোটগল্প-রচয়িতা সেগুলিকে নিজ ক্ষুদ্র অঞ্জলিতে তুলিয়া লইয়া উহার দ্বারা অঙ্গুলি পরিমিত বেদীতে জীবনদেবতার অর্ঘ্য রচনা করেন। ছোটগল্পে জীবন অভিজ্ঞতার যেটুকু তুলিয়া লওয়া হয় আর যে বৃহৎ অংশ ফেলিয়া রাখা হয় উভয়ে উভয়ের পরিপূরকরূপে প্রতিভাত হয়। যাহা চোখের বাহিরে থাকিল তাহা ব্যঞ্জনার রঞ্জনরশ্মিতে বোধশক্তির বিষয়ীভূত হয়। একটি ক্ষুদ্র আখ্যান-খণ্ডে সমগ্র জীবন-তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ইহার উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পের কারুকার্য-খচিত একটি ছোটপাত্রে সমগ্র জীবন-প্রবাহের গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা; বৃহদাকার ঘটনা ইক্ষুদণ্ডের অন্তর্নিহিত সুমিষ্ট রসসারটুকুকে নিষ্কাসন করিয়া বস্তুভার-অসহিষ্ণু অথচ রসপিপাসু ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া ধরা। ছোটর মধ্যে যে বড়র বীজ প্রচ্ছন্ন, সমগ্র জীবনের অভিপ্রায় যে দুই একটি ঘটনার রেখাবেষ্টনীর মধ্যে সংহত থাকে, অনেক জল জমিয়া যে এক টুকরা স্ফটিকস্বচ্ছ বরফ আমাদের পিপাসা তৃপ্তি ঘটায়— এই নিগূঢ় জীবন-সত্যটি ছোটগল্পে বিধৃত।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম সার্থক প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ একাধারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি ও ছোটগল্প রচয়িতা ছিলেন। এই অসাধারণ ও সৌভাগ্যসূচক গুণসমবায়—আমাদের ছোটগল্পের রূপকল্প ও শিল্পরীতি নির্ধারণে অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। অন্য দেশের সহিত তুলনায় বাংলা

সাহিত্যের ছোটগল্প যে বেশী কাব্যধর্মী ও ব্যঞ্জনাগর্ভ ইহা অনেকটা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কল্পনাদৃষ্টির প্রভাব-প্রসূত। তিনি ছোটগল্পের ঘটনা-খোলসে গীতি কবিতার রসব্যঞ্জনাপূর্ণ শাঁস পুরিয়া ইহাকে একটি বিশিষ্ট স্বাদ ও আবেদনধর্ম দান করিয়াছেন। ছোটগল্প অনেকটা গীতিকবিতার সুরসমন্বিত ও উহার গদ্য প্রতিরূপবেশেই আমাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব যেটুকু আছে তাহা উগ্রভাবে প্রকট না হইয়া রসসরোবরে প্রস্ফুটিত শতদলের অবলম্বন, জলতলে অদৃশ্য মৃণালরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য প্রধানতঃ চরিত্র-সৃষ্টিতে ও জীবন পর্যবেক্ষণে নহে, জীবনের মধুর, কাব্যময় পরিবেশে চারিত্রিক লীলার স্ফূর্তি ও বিকাশে। তত্ত্বের দ্রবীভূত রস ও সৌন্দর্যরূপেই তাহার প্রধান আকর্ষণ। অনেক সময় গল্পের ছোট খাপে সাঙ্কেতিকতার তরবারি-দীপ্তি ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। 'সমাপ্তি', 'মধ্যবর্তিনী', 'দৃষ্টিদান' প্রভৃতি গল্প যেন এক একটি গীতি কবিতার রেশে অনুরণিত, জীবন সত্যের এক একটি লীলারহস্য যেন ঘটনার পত্রাবরণে পদ্মের ন্যায় বিকশিত। বাঙালীজীবনের ছোটখাট আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আনন্দ-বেদনার মৃদু সঞ্চরণ, মধুর স্বপ্ন-কল্পনা ও সুকোমল বাস্তব স্পর্শ, অন্তরের সুকুমার কাব্যনির্যাস যেন এই গল্পগুলিতে কখনও কৌতুকস্নিগ্ধ, কখনও অশ্রু-করুণ পরিণতিতে কান্ত অঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ছোটগল্পগুলিতে কবিদৃষ্টির পরিবর্তে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-দৃষ্টিই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সমাজ-সমস্যা, আদর্শ-বৈষম্যমূলক মতবাদ, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সহিত পারিপার্শ্বিকের অসামঞ্জস্য ও সংঘর্ষ যুদ্ধোদ্যত সঙ্গিনের ন্যায় মাথা উঁচাইয়া দাঁড়াইয়াছে ও তাঁহার পূর্ববর্তী পর্যায়ের ছোটগল্পের ভাব-সুষমা ও আঙ্গিক-পারিপাট্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। সমস্যা-কণ্টকিত, বাদ-প্রতিবাদে উষ্ণ, সংগ্রামী আবহাওয়ার ঝটিকাসংক্ষুব্ধ পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট এই ছোটগল্পগুলি যুগচিত্তের উত্তেজিত অসঙ্গতিবোধের যথাযোগ্য প্রকাশ। এখানে সৌন্দর্যতন্ময়তার পরিবর্তে আছে আঘাত তৎপরতা, ভাবাদর্শের পরিবর্তে আছে উগ্র বাস্তবচেতনা, আত্মার গভীরে অন্তঃপ্রবেশের পরিবর্তে আছে উপরিভাগের রেখাবৈচিত্র্যের মধ্যে বিচরণ-কুশলতা। ছোটগল্প যে কাব্যপরিবেশভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশ জটিল বস্তুসংস্থান ও তীক্ষ্ণ সমস্যাসঙ্কুলতার দিকে ঝুঁকিতেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্পগুলি তাহারই নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালীন আর একজন ছোটগল্প লেখক—প্রভাতকুমার

ইহার অপর একটি রূপ বিকশিত করিয়াছেন। উনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশের প্রারম্ভে বাঙালী জীবনের প্রসন্ন-নির্মল প্রবাহ, উহার সমস্যামুক্ত, আনন্দময় ছন্দ ও কৌতুকসিক্ত হাস্যরসের লীলাচপল গতিভঙ্গী তাঁহার গল্পে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাঁহার গল্পের উৎকর্ষ উহার হৃদয়-বিশ্লেষণের গভীরতায় নহে, উহার সুষ্ঠ আঙ্গিক-গঠনে ও বিন্যাসরীতিতে। আমাদের মেয়েদের ক্রতহস্তে ও লঘু রং ও রেখায় আলপনা আঁকার সহজ পটুত্বের ন্যায় প্রভাত-কুমারের ছোটগল্পে ঘটনা-বৈচিত্র্যপ্রসূত জীবনের হালকা বিচিত্র রস ফুটাইয়া তোলার একপ্রকার অনায়াসলব্ধ পারদর্শিতা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' কাব্যের জীবনের হাস্যপরিহাসমুখর, খেয়ালবিলাসী, লঘু-চঞ্চল সুরছন্দটির অবিকল প্রতিধ্বনি প্রভাতকুমারের গল্পে শোনা যায়। তখন বাঙালীর বাস্তব জীবনে প্রথম প্রণয়াবেশমুগ্ধতা, কল্পনাবিলাসের প্রথম উচ্ছ্বাস, প্রাণোচ্ছলতার প্রথম বীচিবিক্ষেপ, খেয়াল খুশীমত চলিবার প্রথম স্বাধীনতা, রীতিনির্ধারিত গণ্ডী অতিক্রমের প্রথম দুঃসাহস, জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদনের প্রথম মাদকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের যে বেদনাময়, আশাভঙ্গে বিস্বাদ অভিজ্ঞতা, তাহা তখনও বাঙালীর সাধারণ জীবনে পৌঁছায় নাই। সেখানে বিপদ সহজেই কাটে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা হাস্যকৌতুকে অবসিত হয়, প্রেমের বাধা মিলনকে মধুরতর করে, এমন কি বিয়োগান্ত, করুণ পরিণতিও হৃদয়বিদারক যন্ত্রণায় দগ্ধ না করিয়া স্নিগ্ধ অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে। প্রভাতকুমারের গল্প বাঙালী জীবনের কৈশোর-সরলতা ও আনন্দের একটি উজ্জ্বল চিত্র, সে-যুগের ভারমুক্ত জীবনযাত্রার একটি স্বচ্ছ দর্পণ। সে জীবন আর ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু এই গল্পগুলি উহাদের সুরসঙ্গতি ও সুললিত গঠন-সুষমার জন্য উহার স্মৃতিকে চিরকাল উজ্জ্বল রাখিবে।

ব্যক্তি ও সমাজ-চেতনার মধ্যে যে ক্ষণস্থায়ী সৌহার্দ্যমিলন প্রভাতকুমারের ছোট গল্পে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাহা পরবর্তী যুগে বিপর্যস্ত হইল। এই বিরোধের সূচনা রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের গল্পে দেখা গিয়াছে। শরৎচন্দ্র আরও তীব্র ও ব্যাপকভাবে সমাজ-সচেতন ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প তাঁহার গৌণ রচনা। তাঁহার অনেকগুলি ছোটগল্পকে সংক্ষিপ্ত উপন্যাস বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। কেননা সে সমস্ত রচনা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্রকৃতিতে ছোটগল্পের এককেন্দ্রিকতার অনুবর্তন করে নাই। ঘটনাবাহুল্যে ও মানবিক দ্বন্দ্বের বহু-বিস্তৃত প্রসারে ইহারা অনেকটা

উপন্যাসধর্মী। যে কয়েকটি বিশুদ্ধ ছোটগল্প তিনি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে প্রধানতঃ পারিবারিক জীবনের স্বার্থ ও স্নেহসংঘাতধারাই স্বল্প পরিসরে একটি দ্রুত অথচ প্রত্যাশিত পরিণতিতে পৌছিয়াছে। ছোটগল্পের আঙ্গিক ও বিষয়-বিন্যাসে শরৎচন্দ্র খুব বেশী সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না—উপন্যাস-রীতির প্রয়োগই তাঁহার উভয়বিধ রচনাতেই পরিস্ফুট।

২.

শরৎচন্দ্রের পর যে যুদ্ধোত্তর সমাজ-বিপ্লব ও নীতিবিপর্যয় ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতম প্রকাশ ঘটিয়াছে ছোটগল্পে ও তাহার পর গীতি-কবিতায়। গীতি-কবিতার শিল্পসার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর আছে, কিন্তু ছোটগল্প তাহার বিষয়বস্তুর গ্লানিকরতা ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর নির্মম বস্তুতন্ত্রতা সত্ত্বেও যে শিল্পরসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। যাহা পূর্বযুগে কাব্যসৌন্দর্যে রমণীয় ছিল ও লঘু ভাবোচ্ছ্বাসে মনকে খুশি রাখিত ও অবসরকে উপভোগ্য করিত, তাহা এখন সমগ্র জীবনযাত্রার দুর্বহ চাপে, গ্লানিকর অভিজ্ঞতার ও নিরানন্দ মনোভাবের প্রচণ্ড পীড়নে ভারী ও শ্বাসরোধকারী হইয়া উঠিয়াছে। ভাঙ্গিয়া-পড়া জীবন-ব্যবস্থার প্রতিটি ধূলিকণা, বিপর্যস্ত সমাজবোধের পুঞ্জীভূত আবর্জনা, উদভ্রান্ত, উদ্দেশ্যহীন চিত্তের অস্থির, অস্বস্তিকর আত্মরতি, দৃশ্যতঃ সুস্থ মানবজীবনে দুর্নিরীক্ষ্য ব্যাধি-বীজাণুর আনাগোনা—এই সবই পরিণত কলাকুশলতার সহিত ও মূল উদ্দেশ্যের অস্খলিত অনুসরণে ছোটগল্পের ক্ষুদ্র দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কার, অর্থনৈতিক শোষণের সূক্ষ্মতম প্রক্রিয়া, সমাজ ও ব্যক্তিমনে সবচেয়ে ঘুণধরা অবক্ষয়ের পচনশীলতা, উন্নততম আদর্শবাদের মধ্যে নিম্নতম দুষ্প্রবৃত্তির গোপন সঞ্চার, ছোটগল্পের স্বল্পসংখ্যক পাতা-কয়টিতে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করিতেছে। অতি-আধুনিক ছোটগল্পে জীবনের যে রূপ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে তাহা সত্য হইলেও বীভৎস ও গ্লকারজনক; আর যদি সত্য না হয়, তবে ইহা জীবনের সবটুকু মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করিয়া জীবন-ধারণের উদ্দেশ্যেরই মূলোচ্ছেদ করিতেছে। ইহার শিল্পকুশলতা ইহার বীভৎসতাকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। বিষপাত্রের উপর অপরূপ কারুকার্যের ন্যায় ইহার বাহিরের রূপ ইহার অন্তরের বিকৃতিকে যেন আরও অতিরঞ্জিত করিতেছে। সংসারের পবিত্রতম সম্পর্ক দাম্পত্য প্রেম—উহার

সুস্থ, স্বাভাবিক শ্রী হারাইয়া ফেলিয়াছে, পূর্বপ্রেমের তিক্তস্মৃতি, পূর্ব আকর্ষণের চলচ্চিত্রতা উহার স্বভাবমাধুর্যকে পলে পলে বিস্বাদ, উহার বন্ধন দৃঢ়তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষয় করিয়া আনিতেছে। আধুনিক ছোটগল্পের সাক্ষ্যে আস্থা স্থাপন করিলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হয় যে, আমাদের জীবনের আর কোনও স্থির আশ্রয়ভূমি নাই। প্রতি মুহূর্তে বিপরীত প্রবৃত্তির ধাক্কা সামলাইতে সামলাইতে পায়ের তলায় মাটির ভূমিকম্প-বিপর্যয়ে ইতস্ততঃ তাড়িত হইতে হইতে কোন নির্ভরযোগ্য আদর্শের অবলম্বন ব্যতিরেকে আমরা মাতালের ন্যায় অস্থির চরণে এক অনির্দিষ্ট জীবনসীমার দিকে অগ্রসর হইতেছি। শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প এখন একটা নেতিবাচক, ধ্বংসাত্মক জীবনবেদের ভাষ্যরূপে শুধু আমাদের রসগ্রাহিতার উপর দাবী জানাইতেছে না, আমাদের সামগ্রিক জীবন-নিয়ন্ত্রণেরও অধিকার ঘোষণা করিতেছে। সাহিত্যের লঘুতম বিভাগ হইতে ইহা এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যবিশিষ্ট বিভাগে উন্নীত হইতে চলিয়াছে।

অবশ্য আধুনিক গল্পের সমগ্র ধারা সম্বন্ধে এই চিত্র হয়ত প্রযোজ্য নহে। ছোটগল্পের সব ধারাই যে একই প্রণালীতে প্রবাহিত বা একই উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত তাহা বলা ঠিক হইবে না। ছোটগল্পের বিষয়ানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যাইবে যে কেহ কেহ—যথা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রভৃতি—পূর্ব ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করেন নাই। বিভূতিভূষণ অতীত যুগের পল্লীজীবনের সরলতা, ধর্মবিশ্বাস ও অলৌকিক সংস্কারের মনস্তাত্ত্বিক-জটিলতাহীন ছবি আঁকিয়াছেন; মনোজ বসু অনেকটা তাঁহারই সহধর্মী, তবে মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের দিকে তাঁহার ঝোঁক বেশী। তারাশঙ্কর পল্লীজীবনের জমিদারশ্রেণীর প্রাণদুর্মদ স্বেচ্ছাচারিতা ও উহার প্রত্যন্তবাসী—বেদে, রাজমিস্ত্রী, সাঁওতাল প্রভৃতি—মানবগোষ্ঠীর পরিচয় দিয়াছেন। একদল হাস্যরসিক লেখক—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথ বিশী প্রভৃতি—জীবনের খুব গভীরে প্রবেশ না করিয়া উহার বহিরঙ্গ ঘটনা ও আচরণের মধ্যে যে বিচিত্র অসঙ্গতি লক্ষিত হয় বা মানুষের যে উদ্ভট, উৎকেন্দ্রিক খেয়াল বাঁকা পথে উঁকি মারে তাহাদিগকেই হাস্যরসসৃষ্টির উপাদানরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। সুবোধ ঘোষ অনেকটা শ্রেণীনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। তিনি ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের অনেক অভিনব, অপরিজ্ঞাত দিককে ছোটগল্পের বিষয়ীভূত করিয়া উহার বৈচিত্র্য ও প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার বিষয়-বিন্যাস ধারাবাহিকতার

পরিবর্তে সাঙ্কেতিক রীতির অনুসরণ করিয়াছে। ঘটনাবিবৃতির ফাঁকগুলি তিনি ইঙ্গিতময়তার সার্থক প্রয়োগে একাধারে তথ্যানুগ ও কল্পনাভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন। গল্পের বস্তুনির্ভরতা অনেক স্থলে রূপকদ্যুতিদীপ্ত হইয়াছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোট গল্পের অন্তঃপ্রকৃতির রূপান্তর-সাধনে সবচেয়ে বেশী সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মানিকের বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধিৎসা ও মার্কসবাদ-সানুগতা আমাদের প্রচলিত জীবন-ধারণার প্রতি কঠোর আঘাত হানিয়াছে ও জীবনের অভাবনীয়তাকে চমকপ্রদভাবে অবারিত করিয়াছে। তাঁহার অনেক শ্রেষ্ঠ গল্প আছে; কিন্তু মনে হয় যেন গল্প-রচনা অপেক্ষা জীবনের নূতন তত্ত্ব-উদ্ঘাটনের দিকেই তাঁহার অধিক অভিরুচি। প্রেমেন্দ্র মিত্র ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে সর্বাধিক কুশলী শিল্পী ও একনিষ্ঠ জীবনদর্শনের উদ্গাতা। সমস্ত রোমান্সের আতিশয্য, আবেগবিহ্বলতা, মধুর রসের বাস্তববিস্মৃত মাদকতা এই সমস্ত জীবনোচ্ছ্বাসকে তিনি সূক্ষ্ম-সংযত, অথচ মর্মভেদী ব্যঙ্গে বিদ্ধ করিয়া উহাদিগকে এক বর্ণহীন, ধূসর মোহভঙ্গের ঈষৎ-বিষণ্ণ সুরে নামাইয়া আনিয়াছেন ও সমস্ত জীবনের উপর এক অবিচ্ছিন্ন গোধূলি-ম্লান, করুণ-স্তিমিত অনুভূতির আস্তরণ বিছাইয়াছেন। তাঁহার লেখার মধ্যে উদ্ভট, অসম্ভব বা অতিরঞ্জিত কিছু নাই—আধুনিক জীবন যেন উহার সমস্ত নৈরাশ্যক্লিষ্ট, সংশয়মন্থর, বিকারজীর্ণ মনোভাব লইয়া তাঁহার ছোটগল্পে মৃদু-কুণ্ঠিতস্বরে কথা কহিয়া উঠিয়াছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ লেখকদের উপর মানিক ও প্রেমেন্দ্রেরই প্রভাব বেশী দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অপেক্ষাকৃত প্রবীণ লেখক হইলেও তাঁহাদের সাধনাক্রমের বহুমুখিতার মধ্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁহাদের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের তীক্ষ্ণাগ্র মনীষার বঁড়শিতে ছোটগল্পের যে মাছটি গাঁথা গিয়াছিল তাহাকে খেলাইয়া ডাঙ্গায় তুলিতে বা কোন বিশিষ্ট জীবনদর্শনের চার দিয়া এই বঁড়শি-বেঁধা মাছকে প্রলুব্ধ করিয়া বশীভূত করিতেও তাঁহারা সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হন নাই। আরও অনেক তরুণ লেখক এই বিভাগে তাঁহাদের শিল্পকুশলতা ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট জীবনবোধ হয়ত এখনও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

প্রমথ চৌধুরী আধুনিক সাহিত্যের বিচারপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে এখন আর সাহিত্যে নবসূর্যোদয় সম্ভব নয়, তবে অসংখ্য সূর্যকিরণের স্বর্ণসূত্রঅবলম্বনে ষাট হাজার বালখিল্য সাহিত্যিকের আবির্ভাবই প্রত্যাশিত। এক্ষেত্রে

'বালখিল্য' শব্দটি সাহিত্যিকের অবয়ব-নির্দেশক না হইয়া সাহিত্যাকৃতির ক্ষুদ্রতা নির্দেশ করিলেই এই মন্তব্যটি ছোটগল্প সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে। লেখকগণ বামনাবতার নহেন ; তবে তাঁহাদের নির্মিত বাণীশিল্প অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, কারুকার্য-খচিত পানপাত্রের ন্যায়। বর্তমান যুগের আদর্শবিভ্রান্তি ও চিত্তচাঞ্চল্যের মধ্যে কোন মহৎ সৃষ্টি, জীবনবোধের কোন সার্বভৌম রূপায়ণ সম্ভব হইতেছে না। এখন জীবন লইয়া নানা পরীক্ষা চলিতেছে, ইহার মধ্যে নানা অপ্রত্যাশিত মনোবৃত্তির স্ফুরণ দেখা যাইতেছে, মানবিক সম্পর্কের উপরকার পালিশ উঠিয়া গিয়া ইহাতে নানা ফাটল ও জোড়াতালির চিহ্ন লক্ষ্যগোচর হইতেছে অভ্যস্ত বাঁধনগুলি জীর্ণ হইয়া গিয়া, নূতন মিলন-বিচ্ছেদ-নীতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলিতেছে। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পরিধিতে এই পরিবর্তনছন্দের সবটুকু স্পন্দন বিধৃত হইতেছে, জীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানগুলিকে আবার নূতন করিয়া জুড়িবার চেষ্টা হইতেছে ও ইহার ভাঙ্গা টুকরাগুলি লইয়া আবার একটি সত্যতর, পূর্ণতর জীবনদর্শন—রচনার আয়োজন চলিতেছে। আমাদের চাউলে যেমন তুষ, ক্ষুদ, কাঁকর প্রভৃতি নানা ভেজাল মিশিয়া আমাদের খাদ্যদ্রব্যকে বিস্বাদ ও পুষ্টিগুণহীন করিতেছে, আমাদের জীবনেও তেমনি নানাবিধ মেকী উপাদান, অসত্য সংস্কার মিশ্রিত হইয়া উহার শক্তি ও আনন্দহ্রাসের কারণ হইতেছে। ছোটগল্পের কুলায় এই অবিশুদ্ধ উপাদান-গুলিকে ঝাড়িয়া-বাছিয়া সুস্থ জীবন-কণিকাগুলিকে আবার পৃথক করিতে হইবে ও উহাদের প্রাণোচ্ছলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। যদি কোনদিন আধুনিক জীবনের মহাকাব্য আবার রচিত হয়, তবে এই ছোটগল্পগুলিই তাহার উপকরণ যোগাইবে। প্রাচীন যুগের বিশালকায় মহাকাব্যগোষ্ঠির পিছনে যেমন বিচ্ছিন্ন বীরগাথাগুলি ক্রমোপচীয়মান জাতীয়তাবোধের আকর্ষণে একীভূত হইয়া উহাদের মেরুদণ্ড ও অস্থি-সংস্থান গঠন করিয়াছিল, তেমনি বর্তমান যুগে হয়তো ছোটগল্পের জীবন-নিরীক্ষাই এক ব্যাপকতর জীবন-সংশ্লেষের প্রেরণা সঞ্চার করিবে। ইহাই হয়তো ইহার যথার্থ তাৎপর্য ও মহাকাল-নির্দিষ্ট ভূমিকা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবালকীটের একত্র সমাবেশে মহাকায় প্রবালদ্বীপের নির্মাণের ন্যায়, এই 'অণোঃ অণীয়ান' হইতে 'মহতো মহীয়ানে'র উদ্ভব-কল্পনা নিতান্ত অবাস্তব না হইতেও পারে।

## বর্তমান সাহিত্যের মূলকথা

### ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান সাহিত্যের ধারা আলোচনায় প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে—বর্তমান কথাটির তাৎপর্য কি ? প্রশ্নটি উঠত না যদি আধুনিক সাহিত্য, প্রগতিশীল সাহিত্য প্রভৃতি কথাগুলির চলন না থাকত। সর্বপ্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিরই আবেগ কোনো-না কোন ঘটনাঘাতের স্মৃতি থেকে উৎপন্ন হয়। ঘটনা-কেন্দ্র যদি যথা-সর্বস্ব মনে হয়, যদি তার তীব্র উজ্জ্বলতায় চারিপাশের তমসা, পূর্বের কারণ, পরের ফলাফল ও প্রতিবেশের সম্বন্ধকে আবৃত করে, তবে সেই প্রকার ঘটনাশ্রিত সাহিত্যকে আধুনিক কিম্বা সাময়িক সাহিত্য বলাই সঙ্গত। কিন্তু এক্ষেত্রে অধুনা সময় কালপ্রবাহের অংশ নয়, এবং সময়ও কালপ্রবাহ নয়। বর্তমান সাহিত্যসৃষ্টির প্রকৃতি ভিন্ন। তারও স্মৃতিকেন্দ্র নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটি অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। ঘটনা-পরম্পরা, কার্যকারণ-সম্বন্ধ, নিকট ও দূরতর অর্থ তার বর্ণালী সম্পাতে উদ্‌ভাসিত। বর্তমান সাহিত্যের ঘটনা তাই সাময়িক না হলেও চলে। চিন্তা ও ভাবের ধারা—চিন্তা ও ভাব আমাদের মানসিক ঘটনা—বরঞ্চ অধুনা থেকে একটু দূরে সরে গেলেই যেন বেশী স্পষ্ট হয়। তাই এক অর্থে বলা যায় যে, আধুনিক সাহিত্যের মৃত্যুই বর্তমান সাহিত্যের জন্মলাভের সুবিধা। আধুনিক সাহিত্যের প্রধান উপকরণ ভাব, বর্তমান সাহিত্যের মূলধন অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ; হৃদয় যদি থাকে, স্নায়ু যদি কার্যকরী হয় তবে ঘটনার আঘাতে দুটিই চঞ্চল হবে, এবং সাহিত্যিকের দু'টি বস্তুই অত্যন্ত সক্রিয় ; কিন্তু তারপর যদি ভাবের শক্তি ফুরিয়ে যায় তখন অন্য উত্তেজনার প্রয়োজন ওঠে, সাহিত্যিক অন্য নতুন ভাবের সন্ধানে ঘোরেন এবং যদি মেলে তবে পূর্বভাবকে হারিয়ে ফেলেন কিম্বা স্বেচ্ছায় মনন-কেন্দ্র থেকে তাকে সরিয়ে দেন। ফলে তাঁর সময় হয় ক্ষণিকের জঞ্জাল আর তাঁর আবেগ হয় ভাবের ভিড়ের ধাক্কা। কিন্তু বর্তমান সাহিত্যের অভিজ্ঞতা যেন অনুভূতির মালা। সাময়িক কি আধুনিক সাহিত্যের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই,

সাহিত্যিক যখন মানুষ তখন মন্বন্তরের মতন কোন বিশেষ ও গভীর দুঃখ তাঁর হৃদয়কে আঘাত করবেই এবং তার ফলে তিনি নিশ্চয়ই ভাবপ্রকাশে ব্যস্ত হবেন। এই পর্যন্ত এসে তিনি যদি বিরত হন তবে তিনি আধুনিক কি সাময়িক সাহিত্যিকই থেকে গেলেন। আর যদি তিনি ঐ মন্বন্তরের কোন একটি ঘটনার অবলম্বনে মানুষের চিরন্তন দুঃখ, পীড়ন, নিরাশার কথা আমাদের সকলকে স্মরণ করাতে পারেন তবে তিনি সমসাময়িক, আধুনিক হয়েও বর্তমান সাহিত্যের স্রষ্টা, এবং যে কালে অপেক্ষাকৃত বিশাল পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন, ঘটনার আদি ও অন্ত, অতীত ও ভবিষ্যৎ, কারণ ও কার্য বোঝা যায় না, এবং যখন সেটি না বুঝলে কর্ম ফলপ্রসূ হয় না, তখন একমাত্র বর্তমান সাহিত্যই প্রগতিশীল সাহিত্য হতে পারে। বর্তমান সাহিত্যসৃষ্টির জন্য চাই প্রবল জীবন-শক্তি, প্রশস্ত জীবনবোধ ও সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি। এদেরই কল্যাণে আপাত প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করা, তার অবান্তরের রূপকে সরিয়ে দেওয়া, সংযত ও সজ্জিত করা সহজ হয় ও সেই সঙ্গে অন্তরের অস্পষ্ট ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে আসে, বিশেষ ক্ষণের গণ্ডী ভেঙে মানুষের সাধারণ ব্যবহারে পরিণত হবার সুবিধা পায়।

ঠিক এই হিসাবেই বাংলার বর্তমান সাহিত্য একাধারে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যে বহু তৎকালীন ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে। তাদের মধ্যে একাধিক ঘটনা স্বদেশী আন্দোলন ও মহাযুদ্ধের মতন নাটকীয়, আবার বেশীর ভাগই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবহারের অন্তর্গত, নতুনত্ব কেবল দেখবার ও প্রকাশের ভঙ্গীতে। যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা জ্বলে উঠেছিল তার মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটে, কিন্তু তাই বলে তাঁকে যুদ্ধের সাহিত্যিক নাম দেওয়া যায় না। যে জন্য মহাযুদ্ধের আরম্ভ সেই কারণই ছিল তাঁর কবিতার আগ্রহ। তিনি সেই কারণকে আপন ভূয়োদর্শনের মধ্যে এনে সমগ্র মানবেতিহাসের উত্থান-পতনকে রূপ দিলেন আপন কবিতায়। তেমনই অন্যধারে পাড়াগাঁয়ের পোস্টমাস্টার, বোষ্টমি, শহরের গিরিবালা, সুচরিতা, মক্ষিরাণী, সিসি-লিসি-কিটি সকলেরই জীবন সাধারণ। কিন্তু সেই সাধারণ জীবনধারায় দু'একটি ঘূর্ণি দেখা দিল, স্রোতে চাঞ্চল্য এল, রবীন্দ্রনাথ তাই লক্ষ্য করলেন ও সেই-সব ব্যাপারকে একটি অবিশেষ জীবন-বহতার অঙ্গ হিসাবে রূপ দিলেন। ফলে রবীন্দ্র-সাহিত্য কোনো প্রকার শ্রেণী-সাহিত্য হল না বটে, কিন্তু সাহিত্য হল এবং বর্তমান সাহিত্য হল এবং আজও রইল।

আমার মনে হয় রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুর্জোয়া সভ্যতা ও শ্রেণীর প্রতিভূ বলার মধ্যে বিচারের অভাব রয়েছে। বিষয় ও প্রতিজ্ঞা—Subject ও theme, তথ্য ও মূল্য, অর্থাৎ fact ও value, অধুনা ও বর্তমান, এই প্রত্যয়গুলির পার্থক্য না বুঝলে সাহিত্যালোচনায় বড় বিপদে পড়তে হয়।

বর্তমান সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যকে অতিক্রম করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্তর্ধারে জীবনের সমস্যা ক্ষণে ক্ষণে তিলে তিলে বাড়ছে এবং কোনোদিন সাধারণের অজ্ঞাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতেও পারে। কোনো সাহিত্যিক যেকালে অমর নন তখন নতুন রূপের, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সম্ভাব্যতা ও অস্তিত্ব মানতেই হবে তাঁকে ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্যিককে। রবীন্দ্রনাথ আজ জীবিত নেই—এটুকু স্বীকার করাই ভালো এবং জীবন সেজন্য চলা বন্ধ করেনি আমরা দেখছি। অতএব রবীন্দ্রোত্তর জীবনের সমস্যা যদি নতুন সমস্যা হয়, তবে রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। আমি এখন পঞ্জিকা ধরে কোনো কথা বলছি না, নতুন সমস্যা, কিম্বা পুরাতন সমস্যার নতুন রূপের নতুন ঢঙেরই উল্লেখ করছি। আমার বিশ্বাস যে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য-প্রয়াসে অন্ততঃপক্ষে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। তার সাহায্যে প্রয়াস সার্থক হয়েছে কি না আমি বিচার করছি না। নতুনত্ব তিনটি ব্যাপারে লক্ষণীয়।

প্রথম ব্যাপার হল মৌলিক বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্পর্কে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যয়ের মধ্যে সত্য, শিব, অদ্বৈত, আনন্দ ও সুন্দরই প্রাথমিক। এগুলো ভারতবর্ষের সনাতন প্রত্যয়। সবগুলো মিলে যে ছকটি তৈরী হয় সেটাই ভারতীয় ঐতিহ্য। সেখানে একটি প্রত্যয়ের সঙ্গে অন্যটির গরমিল সমন্বিত হয় ব্রহ্মের স্বরূপে, একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই সংজ্ঞায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূলধন এই উত্তরাধিকার। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই উত্তরাধিকারকে গুদামজাত না করে, না জমিয়ে নতুন সুযোগে খাটান। সেজন্যে তাঁর নকশায় জীবন, মানুষ, গতি প্রভৃতি নতুন প্রত্যয়ের আমদানি দেখি। সংস্কৃত কিম্বা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রত্যয়গুলো ছিল না বলছি না, কিন্তু অত জীবন্তভাবে নিশ্চয়ই নয়। চরৈবেতি সংজ্ঞার প্রভাব সংস্কৃত সাহিত্যে কোথায়; এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে মানুষের অপেক্ষা কেউ কি বড় নয়, তার উপরে কি কেউ নেই? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন, বৈষ্ণব সাহিত্যের গতি বাসকসজ্জার দিকে, আর বৈষ্ণব দর্শনের গতি তো কেবল বৃন্দাবনের দিকে! সেখানে পৌঁছবার আনন্দ আছে, কিন্তু চলার জন্য চলার আনন্দ কৈ? সে আনন্দের সুর কীর্তনে ধ্বনিত, কিন্তু গতিরাগের গানের

পদ্ধতি ভিন্ন, গায়ন ভিন্ন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ছকের মানুষও একটু কম অবিশেষ, যদিও সেটি বিদেশী সাহিত্যের রক্তমাংসে গড়া, অন্য জীব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, বিশেষ ব্যক্তি নয়।

এখন, কেবল নকশা থাকলেই সাহিত্য হয় না। যদিও তা ছাড়া কোনো রচনা সাহিত্য পদবাচ্য নয়। প্রত্যয়গুলো প্রতীতিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হল না। সত্য, আনন্দ, অদ্বৈত, জীবন, গতি, পুরুষ—যাকে তিনি পার্সন্যালিটি বলতেন, প্রভৃতিতে তাঁর নিজের বিশ্বাস ছিল অগাধ ও এতটাই সক্রিয় যে, অসত্য, নিরানন্দ, দ্বিধা, মৃত্যু, স্থিতি ও ব্যক্তিত্ব প্রভৃতিকে এক এক সময় তিনি প্রায় দূরে ঠেলে রাখতেন। তার কারণও আছে: তিনি তাঁর প্রাথমিক বিশ্বাসগুলিকে অনির্বিশেষ কালাতীত তাৎপর্য দিতেন আমাদেরই ঐতিহ্য অনুসারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও আমরা তাই দেখি; সেখানে জরা, মৃত্যু, দুঃখ, দারিদ্র্য, যেসব ব্যাপার দেখে বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন, সে সবই আপেক্ষিক, অর্থাৎ চিরন্তনের উপকরণ কিংবা ব্যত্যয় হিসাবে সহনীয় হয়েছে। এখন পরম মূল্যে বিশ্বাস ও আপেক্ষিক মূল্যে বিশ্বাস এক ধরনের হতেই পারে না। প্রথম বিশ্বাসের ফলে সাহিত্যসৃষ্টি শান্ত, ব্যাপক, প্রসন্ন হয়; দ্বিতীয় বিশ্বাসের ফলে আসে চাঞ্চল্য, দ্বন্দ্ব, জটিলতা; যার চরম পরিণতি বস্তুতান্ত্রিক ট্র্যাজেডীতে, সেখানে একটি ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ কিম্বা প্রকৃতির ক্রমাগত সংঘাত হচ্ছে। প্রথম বিশ্বাসে গঠিত সাহিত্যের সুর মেলডি, মিড়প্রধান, তৈলধারাবৎ: তার বেধ (dimensions) সাধারণতঃ দু'টি, সাধারণ নিয়ম, ও সাধারণ মানুষ, অন্য ভাষায় জীবাত্মা আর পরমাত্মা। তাদের সম্বন্ধেই গতি, উন্নতি, যেটা প্রকৃতপক্ষে নিমজ্জন, কারণ জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হয়, সাধারণ মানুষ সাধারণ নিয়ম মানতে বাধ্য ও মানাই তার ধর্ম। অতএব রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব অনেকেই অনুভব করেন। আপেক্ষিক মূল্যে বিশ্বাস বরাবরই অস্থির, বিচিত্র, হার্মণিনির্ভর বিলেতী সঙ্গীতের মতন মূল 'থীম্' থাকা সত্ত্বেও গতিশীল। আর যদি নতুন 'থীম' এসে পড়ে—এবং বর্তমান সভ্যতার জটিলতা ফোটাবার জন্যে যেটা স্বাভাবিক—তবে স্থায়িভাব ব্যভিচারী ভাবের ভিড়ে হারিয়ে যায়। অর্থাৎ প্রথম প্রকার প্রত্যয়ের ফলে একঘেয়েমি, আর দ্বিতীয় প্রকার প্রত্যয়ের ফলে অরাজকতার বিপদ রয়েছে। যিনি যতটা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন তিনি ততটাই সাবধানী আর্টিস্ট। তাই বলি, জোর-জবরদস্তি করে যেমন বিশ্বাস আনা যায় না, অর্থাৎ যেমন স্ব-ইচ্ছায়

আধুনিক সাহিত্যিক হতে পারলেও বর্তমান সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তেমনই অধিক বিশ্বাসের ফলে সাহিত্য ধর্মের কোঠায় উঠেও বহু প্রতিজ্ঞার প্রতি আস্থার জন্য সাহিত্য সুবিধাবাদী (প্রপাগাণ্ডার) স্তরে নেমে যায়। রবীন্দ্র সাহিত্যের দোষগুণ সবই চরম পরিমাণে প্রতীতির জন্য; আর আধুনিক সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও অস্থিরতার জন্য দায়ী আপেক্ষিকতার উপর আস্থা।

অতএব সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকেও দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকতে বাধ্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচিত; অর্থাৎ সেখানে গোটাকয়েক বিষয় সাহিত্যের বহির্ভূত। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে অমন কোন গণ্ডী নেই। রবীন্দ্রনাথ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি নিয়ে কবিতা লিখেছেন জানি, কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীর ধারেই তিনি স্বাভাবিক। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের ইঙ্গিত তবু মেলে রবীন্দ্র সাহিত্যে, বিশেষতঃ নভেল ও কখনও কখনও ছোট গল্পে, কিন্তু কবিতায় তাদের বালাই নেই। ভয় একটা মস্ত বড় ভাব, সেটাও বাতিল। কাম নাম মাত্র, তাও দেহগন্ধী নয়। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ খুঁতখুঁতুনি নেই; বস্তি, আস্তাকুড় থেকে শুরু করে প্রাসাদ পর্যন্ত, ঝি-চাকর কুষ্ঠরোগী থেকে ক্রোড়পতি, বেনের লাভ থেকে পুঁজিপতির লোভ, প্রায় সবই আছে সেখানে। যদি খুঁতখুঁতুনি থাকে তো কেবল আদর্শের প্রতি। এবং বর্ষাধারায় মন যদি ব্যাকুলও হয় তবে সে ব্যাকুলতাকে আদর্শবিলাস নাম দিয়ে বহিষ্কৃত করবার একটা ঝোঁক থাকে। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্য এই প্রকার বিষয়ে সন্দিহান, একটু লজ্জিত।

এখন বিষয়ের যদি সীমা না থাকে তবে একটু ভিড় জমবেই। অথচ সাহিত্য-বস্তটার প্রকৃতিই হল নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীতে নানা বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়কে আঘাত করছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাই বলে যদি প্রত্যেককে প্রবেশাধিকার দিতে হয় তবে নিজের কোন দাঁড়াবার স্থান থাকে না। যদিও ধরা যায় যে, সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন, তবু আরশি ধরতে তো হবে কাউকে, ক্যামেরার কাজ করবে কে! আরশির পেছনে পারার প্রলেপ থাকে, নয়তো প্রতিফলন হয় না। আর ক্যামেরা বসাবার জন্য আলো ও স্থানের নির্বাচন চাই। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক এসব কথা বোঝেন না বলছি না; তিনিও বুদ্ধিমান। তাঁর বিচক্ষণতার নিদর্শন ইমেজ-ব্যবহারে। সাহিত্যের সব রূপেই ইমেজ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কবিতাতেই বেশী। অনেক কবির মতে ইমেজই কবিতার

স্বরূপ। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও ইমেজ, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যেও ইমেজ—তবে নতুনত্ব কোথায়?

নতুন অপ্রচলিত, অ-পূর্ব, এমন কি অদ্ভুত সম্বন্ধ স্থাপনে। প্রচলিত ইমেজ যেন ঘষা পয়সা, বহু ব্যবহারের ফলে সেটি উত্তেজনার শক্তি খুইয়েছে। তাই মনকে জাগাবার জন্য অদ্ভুত ইমেজের প্রয়োজন। সূর্য, সমুদ্র, পর্বত, শ্বেত, অশ্বত্থ প্রভৃতি প্রতীক এখন শক্তিহীন। আজ চাই এটম্, প্রোটোন, কলের জল, চিমনি, ধূসরতা, মরশুমী ফুল, বনতুলসী, আশ-শেওড়া, বুনো ফুল, শেওলা, মরুপ্রান্তরের ফণীমনসা; আর কোকিলের পরিবর্তে দাঁড়কাক, উটপাখি। হাঁ, তাতেও যদি না চলে, তবে বহু পুরাতন পৌরাণিক ইমেজের ব্যবহার অন্যায় হবে না, তবে নতুন ভঙ্গীতে তাকে দেখাতে হবে। অবশ্য তখন তারা হবে প্রতীক, সীম্বল, primordial images, archetypes. যেমন জেসন, ট্রয়লাস, মহাশ্বেতা, সবিতা ইত্যাদি। ইমেজ-সৃষ্টির পর তার ব্যবহার। রবীন্দ্র-সাহিত্যে কেবল পরিচিত ইমেজ আছে তাই নয়, তাদের বিন্যাসে একটা সহজ প্রাঞ্জল পরম্পরা থাকে। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে এই প্রকার পারম্পর্য নেই। সেখানে একটি ইমেজ বিড়ালছানার মতন কখনও অন্যটির ঘাড়ে পড়ছে, কখনও এতই ঘেঁসাঘেঁসি রয়েছে যে, মধ্যে কোনও ফাঁক নেই যেখানে কাব্যের বাক্য (poetic statement) ঢোকানো যায়। উদ্দেশ্য অবশ্য ঘনতা আনা ও ইমেজ-স্তূপের সাহায্যে কবিতার সাধারণ মেজাজটি তৈরী করা। কিন্তু ঠিক এইখানেই বিপদ ঘনায়। যদি কবিতার পিছনে কোনো স্থায়িভাব, কোনো basic passion না থাকে তবে কবিতা হয়ে যায় ইমেজের ভগ্নস্তূপ। কেবল তাই নয়, স্থায়িভাবেরও পিছনে একটা না একটা ভূয়োদর্শন থাকা চাই। ইমেজের দু'টি স্তর। প্রথমটির সম্বন্ধ মূল থীম-এর সঙ্গে। কিন্তু যদি মূলটাই কোনো সাধারণ সত্যের প্রতীক কি প্রতিভূ না হয়, তবে সেই ইমেজগুচ্ছ সমন্বিত কবিতার কোনো দাম থাকে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কবিতাই একটি ইমেজ, তার অন্তর্গত ইমেজের সংখ্যা কম ও রঙও একটু ফিকে। উপমা, রূপক, কখনও কখনও দৃষ্টান্তের সামিল, তবে সেখানে সাধারণ সত্যের সঙ্গে থীমের যোগ আছে, যদিও সে সাধারণ সত্যে বর্তমান মানুষের বুদ্ধি হয়তো সায় দেয় না। রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে ইমেজের সংখ্যা বেশী। তবে পাকা হাতে তাদের বিন্যাস ঘন, রঙ গাঢ় হতে পারে, ও হয়। আর যখন হল না তখন কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেল। তাতেও দোষটা

ততটা হয় না যতটা হয় নিতান্ত ব্যক্তিগত ইমেজের ব্যবহারে। তখন আর সাহিত্যের কোনো সার্থকতা থাকে না, কবি তখন রোগী। এই প্রকার সাহিত্যে সাধারণ সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ সাধারণ বলে কোন বস্তু কি প্রত্যয় এখানে নেই।

এই হল রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের মোটামুটি পার্থক্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্বাস, প্রত্যয়গ্রন্থি ভিন্ন; অথচ পাঠকদের মনে সেগুলো পুর্ব-পরিচিতির জন্য অত্যুজ্জ্বল হলেও বর্তমান। অন্তধারে জীবন নতুন ধারায় বইছে, সেখানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আসছে, নতুন সমস্যা, বিষয়, ব্যাপার উঠছে। তাদের জন্য নতুন প্রত্যয়, নতুন প্রতীক, নতুন ইমেজের প্রয়োজন। দু'ধরনের প্রতীকের মধ্যে বিরোধ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মুহূর্ত যখন কাল ছাড়া নয়, মানুষের ব্যবহারে যখন তার ইতিহাসটাই প্রাথমিক, অপরিত্যাজ্য সত্য, তখন বিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই সমন্বয়ের কার্য চলবে। বাংলার বর্তমান সাহিত্যে সমন্বয় চলছে, যদিও আধুনিক সাহিত্যিকের রচনায় বিরোধের নিদর্শনই বেশী চোখে পড়ে।

মহারথীদের অবর্তমানে বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে হতাশ হবার কারণ দেখি না, যদিও কোনো কোনো সাহিত্যিকদের রচনা পড়লে অন্য ভাব মনে আসে। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কটাক্ষপাত করছি না, কিন্তু তাঁরা যত প্রয়োজনীয় কাজই করুন না কেন, তাঁদের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাগুলো এখনও রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাগুলোকে উচ্ছেদ করে জনসাধারণের মনে অধিষ্ঠিত হতে পারছে না। এবং কেন হচ্ছে না যদি তাঁরা আলোচনা করেন, তবে বোধ হয় সাহিত্যের অনেক উপকার হয়। প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা অন্য প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞাসমষ্টি স্থাপনা করতে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে প্রত্যয়ের চেয়ে প্রতীতি এবং প্রতিজ্ঞার চেয়ে প্রতিশ্রুতিটাই স্পষ্ট। আমার একান্ত বিশ্বাস, রবীন্দ্রোত্তর বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আদি প্রত্যয়, প্রতিজ্ঞা, বিষয়, ইমেজ-ব্যবহার ও অন্যান্য আঙ্গিকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সময় এসেছে। বাংলা দেশের আছে তো ঐ সাহিত্য, তাও যদি দৈনিক সংবাদে পরিণত হয় তবে থাকবে কি বুঝি না।

## বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা

### কাজী আবদুল ওদুদ

১.

বাংলার লোকদের দোষ-ত্রুটি নিশ্চয়ই খুব কম নয়। তবু মনে হয়, এদেশের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, কেননা, অপেক্ষাকৃত অল্পকালের ব্যবধানে মানুষের চিত্তের অপূর্বতার নব নব প্রকাশ এদেশে ঘটেছে। কিন্তু বাংলার ঐতিহাসিককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বাংলার গৌরবসামগ্রী এই যে সমস্ত আন্দোলন, যেমন বৈষ্ণব আন্দোলন, ব্রাহ্ম আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি, এ সমস্তের অন্তরে মুসলমান নামধেয় বাংলার এক বিশাল মানবসমাজের কি দান, তাহলে মোটের উপর তুষ্ণীভাব অবলম্বন ভিন্ন তাঁর হয়ত আর গত্যন্তর থাকে না।

বাংলার মুসলমানের আত্মপ্রকাশের এই দীনতা লক্ষ্য করেই আমাদের কোনো কোনো সমালোচক বলতে চান—বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা আর্থিক সমস্যা শিক্ষা-সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিচার করে দেখবার অবসর কোথায়? সেই গোটা সমাজটাই যে এক সমস্যা!

এই শ্রেণীর সমালোচকদের কথার গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করবেন সন্দেহ নেই। বাংলার মুসলমান সমাজের বয়স কম নয়, অন্যূন সাত আট শত বৎসর হবে; এই দীর্ঘ কালেও সে-সমাজ যদি এমন কোনো শক্তিমানের সূতিকাগার না হ'য়ে থাকে যাঁর কর্ম-প্রেরণায় সেই সমাজের লোকদের অন্তরে নব নব আশা ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে ও অন্যান্য সমাজের লোকের চিত্তে শ্রদ্ধা ও আনন্দ জেগেছে, তাহলে তার অবস্থা শুধু শোচনীয় নয় অত্যন্ত চিন্তনীয়। তারই ইঙ্গিত ক'রে যদি কেউ বলেন, বাংলার মুসলমানসমাজ হীন উপকরণে গঠিত, তবে তাতে শুধু অসহিষ্ণু হয়ে আর কি লাভ হবে।

কিন্তু বাস্তবিক কি বাংলার ইতিহাসে মুসলমানের কিছুমাত্র দান নেই? সেকালের মুসলমান নবাব-বাদশাদের দানের কথা ধরতে চাই না; বাংলার

সাধারণ মুসলমান, যাঁরা পুরুষানুক্রমে এই বাংলার মাটির উপরে জন্মেছেন ও শেষে এই মাটিতেই দেহরক্ষা করেছেন, তাঁরা কি সর্বপ্রকারে এতই দরিদ্র ছিলেন যে শুধু প্রাণ-ধারণের অতিরিক্ত কোনো-কিছু কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করবার ক্ষমতা তাঁদের হয় নি, যাতে করে' শনৈঃ শনৈঃ গ্রথিত দেশের ভাব-ও কর্মসৌধে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত থাকতে পারে? এই প্রশ্নটি একসময়ে আমাকে কিছু বিব্রত করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই কথাটি বুঝে আনন্দিত হয়েছিলাম যে, বাংলার মাটির উপর মুসলমান-তরু শুধু নিষ্ফল হয়ে দাঁড়িয়ে নেই। অতীতের কুক্ষি ঘেঁটে দেখবার তেমন সুযোগ আমার হয় নি, তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দেখতে পাই, বাংলার স্মরণীয় নীল-বিদ্রোহে প্রধানত মুসলমান চাষীই লড়েছিল, অন্যায়ের সামনে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে প্রাণপণ বলে সে-ই বলেছিল—'মান্‌ব না'। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণে' এক 'তোরাপ'কে অমর করেছেন। কিন্তু মুসলমান চাষীসম্প্রদায়ে 'তোরাপ' একশ্চন্দ্র নয়, বহু নক্ষত্রের অন্যতম। আর বহুদেববিহীন অস্পৃশ্যতা-নির্মুক্ত মুসলমান সমাজের কোলেই এই 'তোরাপ'-এর দল শোভে ভাল।

এই নীলবিদ্রোহের মুসলমান চাষীর কথার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষা বিস্তারে মোহসীনের দানের কথা,* ঢাকা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ঢাকার নবাবদের দানের কথা মনে হয়েছিল, আর তারই সঙ্গে মনে হ'য়েছিল, এ'রা তো মুসলমান সমাজে নিঃসঙ্গ নন। কি কারণে নিশ্চয় করে বলা শক্ত, ধনবান্ মুসলমানেরা ধনকে কোনোদিন বহুমূল্য মনে করতে পারেন নি, তাই দানের ধারা অনায়াসে তাঁদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে বাধা পায়নি; আর তাতে করে, মানুষের অঙ্গনে নিত্যই নব নব আনন্দ-কুসুম ফুটেছে। একালের চাঁদমিয়া, ফাজেল মোহম্মদ, মোহম্মদ হোসেন প্রভৃতিরও দানের কথা যখন ভাবতে যাই তখন বুঝতে পারি, অর্থব্যয়ে চিরঅকাতরচিত্ত মুসলমানের এ'রা অযোগ্য উত্তরাধিকারী নন।—এই যে মানুষের দল, মুখের ভাষা যাদের ভিতরে অকর্মণ্য, কিন্তু যাদের জীবনের ভিতরে উপলব্ধি করা যায় যেন আদিম যুগের নীরব বীর্য, অথবা আদিম প্রকৃতির প্রাচুর্য, এদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনবগত থাকা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু দেশের জীবনোৎসবে এদের সেবার স্পর্শ লাগে নি, অথবা ভবিষ্যতে এদের এই প্রাণ-অবদান জাতির আঙিনায় 'রঙিন হ'য়ে গোলাপ হয়ে উঠবে' না, একথা অবিশ্বাস্য বলে ভাবতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়।

* তাঁর দানে প্রথম ৩০ বৎসর হিন্দু মুসলমান সমভাবে উপকৃত হয়েছেন।

২.

সাহিত্য জীবনবৃক্ষের ফুল, জাতি বা সমাজ-বিশেষের মগ্নচৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে। সেই গূঢ় রস বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সঞ্চিত আছে কি না তাদের সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা সম্পর্কে তার সন্ধান নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় নয়।—কিন্তু শক্ত প্রশ্ন এই হবে, সাহিত্যে সেই রসের যোগ্য স্ফূর্তি আমরা কবে দেখব? এর উত্তরে যদি বলা যায়, তা কি করে' বলব, তাহলে অনেকে শুধু বিরক্তই হবেন না, ক্ষুণ্ণও হবেন। কিন্তু এ ভিন্ন এ প্রশ্নের আর কিইবা উত্তর আছে? সাহিত্যের বিকাশকে কতকটা তুলনা করা যেতে পারে ফুল-ফোটার সঙ্গে। ফুলগাছের মূলে আমরা পরম যত্নে জল ঢালতে পারি, দেশবিদেশ থেকে তার জন্য ভাল সারও আনতে পারি, তবু ফুল ফুটবে কি না অথবা ভাল ফুল ফুটবে কি না সে সম্বন্ধে যেমন হুকুম করতে পারি না, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনি সমাজের ভিতরে স্কুল-কলেজ লেবরেটরির স্থাপনা, বিচারবিতর্কের সৌকর্যসাধন ইত্যাদির পরও পরম আগ্রহে কালের পানে চেয়ে থাকা ভিন্ন আর আমাদের কি করবার আছে?

সাহিত্য-সমস্যা বাস্তবিকই কোন সমাজের সত্যকার সমস্যা নয়। সাহিত্যের বিকাশ যখন কোনো সমাজের ভিতরে মন্দগতি অথবা হতশ্রী হয়ে আসে তখন বুঝতে হবে, হয়ত তার এক মৌসুম শেষ হয়ে গেছে তারপর কিছুদিন কতকটা নিষ্ফল ভাবেই কাটবে।—অথবা, তার জীবনায়োজনে বড় রকমের ত্রুটি উপস্থিত হয়েছে।—এই শেষের অবস্থা কোনো সমাজের পক্ষে মারাত্মক।

বাংলার মুসলমানসমাজে এ পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের উদ্গম হয় নি, শুধু এই ব্যাপারটিই তার আত্মসম্মানের পক্ষে হয়ত মারাত্মক নয়। কিন্তু সে সমাজের লোক যে এপর্যন্ত জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তেমন গৌরবের আসন লাভ করতে পারে নি, বরং তাদের মর্যাদা সম্বন্ধে আশঙ্কা আপনা থেকে এসে পড়ে। আর, তার অবস্থা ভাল করে' চেয়ে দেখতে গেলে চোখে পড়ে, সত্যই বাংলার মুসলমানের জীবনায়োজন মারাত্মক ত্রুটিতে পরিপূর্ণ, যাতে করে' মনুষ্যত্বের পর্যাপ্ত বিকাশই যেখানে সম্ভবপর হচ্ছে না,—সাহিত্যসৃষ্টির কথা আর সেখানে ভাবা যায় কি করে।

এই সম্পর্কে নানা গুরুতর কথার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। বলা যেতে পারে, সে-সমস্তের কেন্দ্রগত কথা এই:—ইসলাম কিভাবে মানুষের জন্যে কল্যাণপ্রসূ হবে সেই কথাটাই হয়ত আগাগোড়া আমাদের নূতন করে

ভাবতে হবে :—আমাদের পূর্ববর্তীরা ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন তা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন ; অন্তত তাকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যে ভাবে লাভ করেছি তার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অপবাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্পষ্টভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয়রূপে-বিধৃত ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান-প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিতকলার চর্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে ব'লে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা। এই সমস্ত কথাই আমাদের নূতন ক'রে ভেবে দেখতে হবে, —ভেবে দেখতে হবে, মুসলমানসমাজের মানুষের কর্ম ও চিন্তার স্বাধীনতায় এইভাবে যে অনেকখানি নূতন রকমের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করা হ'য়েছে এতে ক'রে কী সত্যকার কল্যাণ লাভ হয়েছে। —এই সমস্ত ব্যবস্থার পিছনে যে সাধু উদ্দেশ্য আছে একথা বুঝ্‌তে পারা কষ্টসাধ্য নয়। সংযম ও পবিত্রতা, পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতা, এবং সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা—এ সমস্তের কথা যাঁরা মানুষকে বলতে চেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু আমাদের নূতন ক'রে ভেবে দেখবার প্রয়োজন এই জন্য যে, সংযম ও পবিত্রতাকে নারীর অবরোধের দ্বারা, পরিশ্রম ও করুণপ্রাণতাকে সুদের আদানপ্রদান নিষেধের দ্বারা, ও সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাকে মানুষের বুদ্ধি শৃঙ্খলিত করার দ্বারা, সম্ভবপর ক'রে তুলতে প্রয়াস পেলে অসম্ভব-কিছুর প্রতি হাত বাড়ানো হয় কিনা, অন্য কথায় তাতে করে মানবপ্রকৃতির উপর অত্যাচার করা হয় কিনা, যার জন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

যতটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের হয়েছে তাতে মনে হয়, ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে, অথবা মানুষকে ইসলামের সার সত্য গ্রহণের উপযোগী করবার জন্য যে পথে চালিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে ক'রে মানুষের উপর সত্যই অত্যাচার করা হয়েছে। যে ব্যবস্থায় বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্তের আকর্ষণ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থায় তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি ; সে ব্যবস্থায় যতখানি বিজ্ঞান-দৃষ্টি আছে তার চাইতে অনেকখানি বেশী আছে ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করব। ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য তৌহীদ মানবচিত্তের চির মুক্তির বাণী। বার বার মানুষ তার কীর্তির শৃঙ্খলে আদর্শের

শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, "every idea is a prison, every heaven is a prison"* আর সেই বন্ধনের সামনে বার বার দাঁড়িয়ে বলবার যোগ্য এই বাণী 'নাই, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ উপাস্য নাই' ; আর সাম্য এই মুক্তি ও অগ্রগতির চিরসহচর। মানুষের এই অগ্রগতিতে সংযমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই কিছুমাত্র কম নয়,—যেমন নদীর জন্য কূলের বাঁধের প্রয়োজন কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু কূলের বাঁধের পত্তন ক'রে তো নদীর সৃষ্টি হয় না, নদীর প্রবাহ আপন প্রয়োজনে কূলের বাঁধের সৃষ্টি ক'রে চলে। মানুষের অগ্রগতির জন্যও প্রয়োজনীয় যে সংযম তারও তেমনিভাবে ভিতর থেকে জন্ম হওয়া চাই, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংযমের সত্যকার মূল্য মানুষের জীবনে কত সামান্য! তাই মানুষের যে বন্ধু চান, ইসলামের এই বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্ত উন্মুখ হোক, তাঁর কাজ কি এই হওয়া উচিত নয় যে মানুষের সর্বাঙ্গীন পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের সহায়তা তিনি করবেন ? কেননা সর্বাঙ্গীন পরিপোষণ ও পরিবর্ধন যার হয়নি এই দূরের পথের যাত্রী হবার সামর্থ্য তার কোথায় ? তার পরিবর্তে বাইরে থেকে বিধি-নিষেধ ও অবরোধ চাপিয়ে চাপিয়ে যে সব মানুষকে সংগত করবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্তিরই তো কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হয় নি। তারা যে বড় জোর অর্ধ-বিকশিত মানুষ! তারা কি ক'রে হবে মুক্তিপথ-যাত্রী।

তারপর ললিতকলার চর্চাকে যে মুসলমানসমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে, কোন্ মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তি একে সমর্থন করতে পারেন ? নিশ্চয়ই নেতাদের এই হুকুমে মুসলমান তার এত দীর্ঘ জীবন সৌন্দর্য ও আনন্দ-বিহীন হয়েই কাটায় নি, কিন্তু আমাদের ভেবে দেখবার দিন এসেছে যে, সাধারণ মুসলমান সমাজের সম্মতিক্রমে আনন্দ ও সৌন্দর্য-চর্চা করতে পারে নি ব'লে তার সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তিতে কতখানি বাধা পড়েছে।

এখানে হয়ত কথা উঠবে, ইসলামে অনেকখানি Puritanism আছে এবং তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার দরকার করে না। আমি নিজেও ইসলামের এই রসবাহুল্যবর্জিত ধাতের জন্য লজ্জিত নই। শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে Puritanism এক বৃহৎ মানবসমাজের শ্রেণী-বিশেষের বরণীয় হ'তে পারে, তাতে ক'রে সেই সমাজের স্বাস্থ্যের ও সৌন্দর্যের কিছু আনুকূল্যই ( সম্বৎসরের ঋতুর সমাহারে গ্রীষ্মের যেমন এক অনুপম সার্থকতা ), কিন্তু Puritanismকে

* এক একটি ধারণা এক একটি কারাগার ; প্রত্যেকটি স্বর্গও কারাগার।

বৃহৎ মানবসমাজের সমস্তের বরণীয় ক'রে তুলতে প্রয়াস পেলে Puritanismতো ব্যর্থ হয়ই সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজেরও দুর্ভাগ্যের অবধি থাকে না।

এর একটি দৃষ্টান্ত প্রায় সমসাময়িক কালের বাংলাদেশে আমরা পাই। বাংলা সাহিত্যে বাংলার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য কোন দান নেই, অর্থাৎ এমন দান যার জন্য বাংলার চিত্তে শ্রদ্ধা জেগেছে, তা আপনারা জানেন। কিন্তু বাংলার লোকসঙ্গীতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের দান সাদরে গৃহীত হয়েছে—যেমন পাগলা কানাইয়ের গান, লালন ফকিরের গান, ইত্যাদি। এইসব গানের ভিতরে বুঝতে পারা যায়, ইসলামের একেশ্বর-তত্ত্ব গানরচয়িতাদের মনে স্থান পেয়েছিল। আর তারই সঙ্গে তাদের চারপাশের বাউল সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা, ইত্যাদি মিশেছিল,—সব মিলে কেমন এক অসীমের সংবাদে তাদের চিত্ত তৃপ্ত ও মধুর হয়েছিল। মাতৃভাষায় রচিত এই সব গান এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছে, চাষীদের অভাবগ্রস্ত জীবনে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে—তাদের অনন্তের ক্ষুধা অনেক পরিমাণে মিটিয়েছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের বেদনার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন আমাদের আলেম-সম্প্রদায় শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে শিক্ষা ও সাধনাহীন সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করে পল্লীর মুসলমান চাষীর এই গানের ফোয়ারা বন্ধ করে দিয়েছেন। পরিপূর্ণ ইসলাম ( কোরআনের ব্যবস্থার সমগ্রতা ) মানুষের জন্য যে কল্যাণ ও শান্তি বহন করে এঁদের সাধ্য নেই সেই সম্পদ এই চাষীদের দ্বারদেশে এঁরা পৌঁছে দেন ; শুধু মাঝখান থেকে হালাল হারাম সম্বন্ধে দুই একটা হুকুম শুনিয়ে, ও Puritanismএর গোঁয়ার্তুমিতে এদের জীবন নিরানন্দ ক'রে দিয়ে, তাঁরা কর্তব্য শেষ করেছেন। —এই চাষীদের জীবনকে কিছু সুন্দর ও উন্নত করবার জন্য এই সব গানের কতখানি সামর্থ্য ছিল আমাদের পুনরায় সে কথা ভাবতে হবে না কি ?

এ সম্পর্কে একটি ভাববার মতো কথা আমাদের সামনে এসে পড়েছে। সেটি এই যে, কি নিজের সমাজে কি অন্য সমাজে নিষ্ঠাবান্ মুসলমানের চেষ্টা হোক তাঁর উপলব্ধ ইসলামের স্বরূপ মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলা। সেই চেষ্টায় তাঁর কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ না পাক। কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে অপরের ইসলাম বা ইসলামের অংশ-বিশেষের গ্রহণ-ব্যাপারেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকুক। "ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষেধ" কোরআনের এই মহতী বাণী মুসলমানের জন্য সত্য হোক।

একথাটি বলবার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অন্য সমাজের লোকদের উপরে ধর্মের ব্যাপারে কিছুতেই আমরা জবরদস্তি করতে পারি না একথা আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মনে স্থান দেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের ভিতরকার লোকদের জন্যও যে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য সে কথা ভাবতে আমাদের অনেকেই হয়ত রাজি নন। এ সম্বন্ধে বাংলার মুসলমান-সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এক সময়ে আমার কথা হয়েছিল। ধর্মবিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা মানতে হবে, আমার এই কথার উত্তরে তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে মুসলমান কাকে বলব? আমি বলেছিলাম—যাদের সাধারণত বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যারা এ সমাজে জন্মেছে অথবা এতে আশ্রয় নিয়েছে। নইলে চোর ভণ্ড স্বেচ্ছাচারী প্রভৃতি যারা প্রতিনিয়ত তাদের আচরণের দ্বারা কোরআন ও হজরত মোহম্মদের উপদেশ-আদেশ অস্বীকার করছে তারা মুসলমান ব'লে নিজেদের পরিচয় দিতে পারত না, সমাজও তাদের মুসলমান ব'লে স্বীকার করতে পারত না। —তাঁর সঙ্গে এই তর্ক হচ্ছিল আমাদের উভয়ের জনৈক বন্ধুর কোনো তথাকথিত অনৈস্লামিক কথার আলোচনা সম্পর্কে। কিন্তু তিনি আমার মত মানতে কিছুতেই রাজি হতে পারছিলেন না। শেষে একটি কথা বলে তাঁকে ভাবিয়ে তুলতে চাইলাম—বললাম, দেখুন আজ উনি যা বলছেন হয়ত দুদিন পরে নিজেই ওখান থেকে ফিরে আসবেন; নিজের সঙ্গে যার ধ্বস্তাধ্বস্তি চলেছে তার মনের বেদনা আমাদের সমাজ বুঝবে না? —কিন্তু তিনি অম্লানবদনে বল্লেন, তা তাঁর ধ্বস্তাধ্বস্তি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন যেন তিনি মুসলমানসমাজে ফিরে আসেন।

মুসলমানসমাজের কর্মকর্তারা যে কি আশ্চর্যভাবে পাষাণ-প্রতিমার সেবক পাণ্ডাদের মতো পাষাণচিত্ত হয়ে পড়েছেন, মানুষের মনের কত কামনা কত বেদনা কত ভাঙাগড়া এ সম্বন্ধে তাঁরা যে কত চেতনাহীন হ'য়ে পড়েছেন, সে সব কথা আজ না ভাবলে আমাদের দুর্দশার পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে না। মানুষের জীবন সুন্দর হোক, কল্যাণময় হোক, সেখানে যেন আমি আমার সশ্রদ্ধ সেবা পৌঁছে দিতে পারি, এভাব যেন তাঁদের মনের ত্রিসীমায়ও ঘেঁষে না। তার পরিবর্তে মানুষের মাথায় কতকগুলো বিধি-নিষেধ ছুঁড়ে মেরেই আল্লাহ্‌র সৈনিক হওয়ার গৌরব তাঁরা উপলব্ধি করতে চান!

মুসলমানসমাজে যে সমস্ত নরনারী বাস করে তারা শুধু মুসলমান নয়, তারা মানুষ—দেশবিদেশের নানা ধর্মের নানা বর্ণের মানুষের আত্মীয়।

সেই বিশ্ববৃহৎ মানব-সমাজের নানা আশা আকাজ্ক্ষার চেষ্টা-বিফলতার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হচ্ছে এই বাণী যে,—মানুষ দুঃসাহসী, তার অনন্ত ক্ষুধা, জড় জগতের বন্ধনই সে মানতে রাজি নয়, চিন্তার জগতের তো কথাই নেই।—মানুষের এই বাণীর সার্থকতার কোনো আয়োজন কি মুসলমানসমাজে করতে হবে না? যা সুন্দর শুধু তাই দিয়ে দৃষ্টি আবৃত ক'রে কি মুসলমান তার সৌন্দর্য বুঝতে পারবে? না, একথাও সে বুঝবে যে এর জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সেই সুন্দর বস্তুকে কিছু দূরে স্থাপন করা, যাতে ক'রে সমস্ত জগত তার চোখে প্রতিভাত হবে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সেই বস্তুর সৌন্দর্য সে উপলব্ধি করবে?—চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির মুক্তি, এতে শুধু মানুষের অধিকার থাকাই উচিত নয়, এই হচ্ছে তার জীবন-পথে বিধাতার দেওয়া পাথেয়। যেমন করেই হোক এই পাথেয়ের ব্যবহার মানুষ করে, তবে অনেক সময়ে ভয়ে ভয়ে করে ব'লে তার অন্তর-প্রকৃতির যথোপযুক্ত পুষ্টিলাভ হয় না।

কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভূমি থেকে দেখে বলা যেতে পারে, সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি, তাই জ্ঞানচর্চা সমাজে অব্যাহত থাকলে সাহিত্যের জন্য আর কোনো ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেই জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্ত বুদ্ধির, অথবা তারও চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় সমাজজীবনে বৈচিত্র্যের—মুক্ত বুদ্ধি যার সন্ততি, অবরোধ ও নিরক্ষরতার চাপে আমাদের সমাজের অর্ধেক শক্তি ব্যক্তিত্বহীন ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে; সেই অর্ধেকের সংস্পর্শে এসে অপরার্ধেরও চিত্তবিকাশের অবকাশ কোথায়? মানুষের চিত্ত যার আঘাতে জেগে উঠ্‌বে সেই বৈচিত্র্য এমনি করেই আমাদের সমাজে দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

সুন্দর ও সবল জীবনের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন তার এত অভাব বাংলার মুসলমান কি ক'রে পূরণ করবে, এ কথা ভাবতে গেলে সত্যই অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আশার অবকাশও যে নেই তা নয়। বাংলার মুসলমানসমাজের অন্তরে সেই গূঢ় জীবনরস যদি সত্যিই সঞ্চিত থাকে, তবে তার সঙ্কটসময়ে তার কোলে তার বীরপুত্রদের জন্ম হবে, যারা তার সমস্ত অভাব সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের যোগ্য সূতিকাগাররূপে, তৌহীদের যোগ্য বাহনরূপে। ইস্‌লামের যে তৌহীদ, মুক্ত নির্বারিত জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের শিখরই তার যোগ্য অধিষ্ঠানভূমি। মুসলমান অকারণে ভীত হয়ে সেই অমূল্য মানিককে অন্ধবিশ্বাসের গুহায় লুকিয়ে রেখে তার সার্থকতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

সাহিত্যের বিকাশের জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সুব্যবস্থিত সমাজ-জীবনের, জীবনের বহু ভঙ্গিমতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধার। সেই দিক দিয়ে যেসব ত্রুটি বাংলার মুসলমানসমাজে রয়েছে তার মারাত্মকতা কত বেশী তাই একটু বিস্তৃতভাবে বলতে প্রয়াস পেয়েছি। তবু হয়ত পরিষ্কার ক'রে বলা হয় নি। আপনারা নিজেদের চেষ্টায় সেই অসম্পূর্ণতা পুষিয়ে নেবেন।*

কিন্তু কেউ কেউ বলতে পারেন, কালের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের পরিদৃষ্টির ও সমাজ-ব্যবস্থার আবশ্যক পরিবর্তন আপনা থেকে হয়ে যাবে; কাজেই সে-সব কথা না তুলে বর্তমানে সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব কথা বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে তার যোগ্য মীমাংসার চেষ্টা করাই সমীচীন—তাতে করেই ধীরে ধীরে আমাদের সব ত্রুটি ক্ষালিত হয়ে যাবে। এ কথার উত্তরে শুধু এই বলেই যথেষ্ট হবে যে, কালের ভাণ্ডারে অনন্ত রত্ন রয়েছে, কিন্তু প্রাণপণে না চাইলে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যায় না। এই প্রাণপণ চাওয়ারও পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কখনো যেন আমাদের ভুল না হয় যে, যারা পেয়েছে তারা সমস্ত দেহমন দিয়ে চেয়েছে।—তা ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণত যে সব সমস্যা আজকাল বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে বলে বোধ হচ্ছে সে সব বাস্তবিকই তাঁদের সামনে প্রবল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। উর্দু বাংলা সমস্যা সে সত্যই তাঁদের জন্য কোনো সমস্যা নয় তার প্রমাণ তো বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা তাঁদের সামান্য ক্ষমতার ভিতর দিয়েও প্রতিনিয়তই দিচ্ছেন। আর বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারের অনুপাতসমস্যাও সাহিত্যে বাঙালী মুসলমানের খুব অল্পদিনের শিক্ষানবিশীর পরিচায়ক; আরো কিছুদিন গেলেই ও সম্বন্ধে তাঁদের খেয়াল আপনা থেকে দুরস্ত হয়ে যাবে এমন আশা করা যায়, কেননা সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন শুধু শব্দের নয়, বর্ণ ও গন্ধযুক্ত শব্দের, অন্য কথায়, শব্দের গায়ে বর্ণ ও গন্ধ মাখিয়ে দিতে পারে এমন চিত্তের, এতটুকুও বুঝবার ক্ষমতা বাঙালী মুসলমানের হবে না এ ধারণা নিয়ে তাঁদের সাহিত্যসমস্যার আলোচনা করা নিশ্চয়ই

* এ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে পড়ছে। ইসলামের ইতিহাসের অমৃত ফল ব'লে মুসলমান যা সব নিয়ে গর্ব করেন সেই মোতাজেলা দর্শন, সুফি সাহিত্য, মোগল স্থাপত্য যাঁদের কীর্তি তাঁদের জীবনের দিকে চাইলে বোঝা যায় তাঁরা আধুনিক মুসলমানের অবলম্বিত ইসলাম-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নি।

বিড়ম্বনা। তবে এই সব সমস্যার সম্পর্কে একটি কথা ভাববার আছে ; —এই সব সমস্যার ভিতর দিয়ে বাংলার আধুনিক মুসলমানের একটি বিশেষ কামনা ফুটে বেরুতে চাচ্ছে, সেটি এই—'বাংলার মুসলমানকে সত্যকার মুসলমান হতে হবে।'

মুসলমানের এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করলে প্রধানত দুটি চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তার একটিকে বলা যেতে পারে প্রতিক্রিয়া, অন্যটি ক্ষোভ অথবা অনুশোচনা। বাংলা সাহিত্য আজ জগতের দৃষ্টি একটুখানি আকর্ষণ করতে পেরেছে এবং তাতে এর সত্যকার অধিকার আছে। কিন্তু তবু সত্যের অনুরোধে সাহিত্যরসিকদের নিশ্চয়ই বলতে হবে, এ সাহিত্য এখনো খুব বেশী পরিমাণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য, মানুষের দুঃখ ও আনন্দের প্রকাশের চাইতে হিন্দুর বিশেষ দুঃখ ও বিশেষ আনন্দের চর্চাই এতে বেশী। "বাংলার মুসলমানকে মুসলমান হতে হবে", এ হচ্ছে অনেক পরিমাণে মুসলমানের অন্তরে বাংলা সাহিত্যের হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়া। এখানে হয়ত তর্ক হবে—হিন্দুও মানুষ, আর বিশেষকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার ; কিন্তু তাতে করে' আমার কথাটির ঠিক উত্তর দেওয়া হবে না। আমি এখানে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্বন্ধে এই কথাটুকু বলতে চেয়েছি যে, বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর যে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকখানি অস্বাভাবিক রকমে হিন্দু, অর্থাৎ বিশ্বের আঙিনার এক পাশে তার বিশেষ রুচি ও বিশেষ দুঃখ নিয়ে ফু'টে উ'ঠে যে হিন্দু জগতের সঙ্গে তার অবস্থার মোকাবেলা করতে চাচ্ছে সে-হিন্দু নয়, কিন্তু বিশ্বের মানব-যাত্রীদের পাশ কাটিয়ে তার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় ব'সে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কূটতর্কে সময় কাটাচ্ছে যে হিন্দু সেই হিন্দু। —অবশ্য যারা একবার নীচে পড়ে গেছে তাদের উদ্ধারের ইতিহাস অনেক পরিমাণে যে ঘুরপাক খাওয়া ইতিহাস হবে এ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের দুর্ভাগ্যের জের যে আমরা কতকাল টেনে চলব তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এইখানে যে হিন্দুর হিন্দুত্বের সংঘাতে তার প্রতিবেশী মুসলমানের অন্তরে শুধু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই জেগেছে।

ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভাবটিকে এই প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত ক'রে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভিতরে যে আর একটি কথা আছে সেটি না বুঝলে আধুনিক মুসলমানের উপর অনেক খানি অবিচার করা হবে। সেটি তার মনের এই একটি বেদনার কথা যে ইসলাম সুন্দর

ইসলাম মহান্, কিন্তু তার যোগ্য প্রকাশ আমরা আমাদের সাহিত্যে দেখছিনে কেন? —এই যে বাঙালী মুসলমানের অন্তরে একটুখানি সত্যকার বেদনা জেগেছে এ তার শুভাদৃষ্টের পরিচায়ক—

"আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে।
তুমি আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তারে॥"

কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের সামান্য একটু নিবেদন করবার আছে। সাহিত্যে যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান নেই ঠিক তা নয়; কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের আর সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের এক চেহারা নয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দু অথবা মুসলমান তার দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে প্রধানত জগতকে এই বোঝাতে প্রয়াস পায় যে, সে আগে হিন্দু অথবা মুসলমান তার পরে মানুষ। কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান অন্তরে অন্তরে জানে, সে আগে মানুষ তারপর হিন্দু অথবা মুসলমান। মানুষের অন্তরের গভীরতম আনন্দ ও বেদনা নিয়েই সাহিত্যের কারবার, সেইখানে সাহিত্যিক মানুষকে তার সম্প্রদায় ও জাতির আবরণ উন্মোচিত ক'রে দেখেছে, অথবা সম্প্রদায় ও জাতির আবরণ তার সামনে ফিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই মানুষে মানুষে আত্মীয়তাই সে বেশী করে উপলব্ধি করে। সুতরাং সাহিত্যে জাতি ও ধর্ম-ভেদ যেন কতকটা একই ফুলের দেশ ও কালের ভেদ—ভেদ, শুধু পাপড়ির বিন্যাস ও রঙের গাঢ়তার বৈচিত্র্যে।

তাই বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান আজ ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ও কতকটা সত্যকার বেদনায় ইসলামের যে চিত্র মনে মনে আঁকছেন, বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানের হাত দিয়ে তারই প্রতিচ্ছবি নাও বেরুতে পারে, বরং সেই সম্ভাবনাই বেশী। তবে ইসলাম সম্বন্ধে সত্যকার বেদনা যদি তার চিত্তে জেগে থাকে তবে সাহিত্যে তার এক অনুপম রূপ নিশ্চয়ই ফুটে উঠ্‌বে। কিন্তু সাহিত্য যেমন চিরদিন অনুপম তেমনি অভিনব, তাই সাম্প্রদায়িক মুসলমান তার এই কামনার ধনকে প্রথমে নাও চিনে উঠতে পারে।

সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী মুসলমানের মনের গোপনে আরো বহু সমস্যা আছে, —যেমন ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের কোন্ কোন্ পর্যায়ের দিকে

আমাদের আজ বেশী ক'রে চাইতে হবে. অথবা আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যের কোন্ কোন্ অংশ আমরা সাদরে গ্রহণ করব, কোন্ কোন্ অংশ বর্জন ক'রে চলব, ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিচারে প্রবৃত্ত হতেও আমরা প্রস্তুত নই, কেননা আগে থাকতে এসব বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আর টাকা পাবার আশায় টাকার থলি তৈরী করা সমান রকমের বিড়ম্বনা। এসব বিচার করবে প্রত্যেক সাহিত্যস্রষ্টা নিজে, আর কি গ্রহণ করবে আর কি বর্জন করবে সেটি নির্ভর করবে তার রুচি ও শক্তির উপরে। তবে একটি কাজ করে বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানদের কিছু সাহায্য করতে পারেন, সেটি হচ্ছে, কোরআন হাদিস ও প্রাচীন মুসলমান গ্রন্থকারদের ভাল বইয়ের বাংলা তর্জমা প্রকাশ করা। অনেক সময়ে দেখা গেছে, অতি সামান্য উপকরণ থেকেও সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে অনেক বড় সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে,—একটি ফুলকি তাঁদের কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য যেন যথেষ্ট। কিন্তু সেই সামান্য উপকরণটুকুও তো হাতের কাছে চাই।

আর একটা কথা ব'লে এই আলোচনা শেষ করব। আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য আমাদের আজকাল চাইতে বল্‌ছেন উর্দু সাহিত্যের দিকে। সে-চাওয়াটা মোটেই দূষণীয় নয়, বরং যত বেশী চিত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু এর ভিতরের যে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অনুপ্রেরণা দেবার মতো কিছু নেই, স্পষ্ট ভাষায়ই বল্‌তে চাই—ওটি দেখার ভুল। উর্দু সাহিত্যের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই; তবে যে সমস্ত উর্দু সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করে বাঙালী মুসলমানকে তাঁদের প্রতি ভক্তিমান হতে বলা হয় তাঁদের কয়েকজনের লেখার সঙ্গে আমার অল্প-কিছু পরিচয় আছে, এবং সেই পরিচয়ের বলে আমি বরং এর উল্টো কথাই বলতে চাই,—বলতে চাই, বাংলার মুসলমানের অন্তরে প্রেরণা দেবার মতো জিনিস বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যেই বেশী আছে।

বাংলার গত একশত বৎসরের ইতিহাস একটা দেশের পক্ষে গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের স্রষ্টাদের এ পর্যন্ত সাধারণত দেখা হয়েছে হিন্দুর চোখ দিয়ে, অর্থাৎ, সামান্য-সাফল্য-লাভে-গর্বিতচিত্ত আধুনিক হিন্দুর চোখ দিয়ে। সেই আস্ফালন থেকে মুক্ত হয়ে অথবা তাতে বিরক্ত না হয়ে যদি তাকানো যায় এই শত বৎসরের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার,

মধুসূদন, রাজনারায়ণ, রামতনু, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির দিকে, যদি ভাবা যায়, একটা মুমূর্ষু জাতির দেহে জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্ত কি প্রাণপণ সাধনা এঁরা করেছেন,—সে সাধনায় কত উদ্বেগ, কত অভিমান, কত নৈরাশ্ত, কত উল্লাস,—তখন এই সব শক্তিমানদের কারো কারো জাতি-অভিমান বিজাতি-বিদ্বেষ ইত্যাদির অর্থ আপনা থেকে পরিষ্কার হয়ে আসে; আর সত্য ও কল্যাণের পথে আমাদের অগ্রজরূপে এঁদের উদ্দেশ্তে শ্রদ্ধা-নিবেদন আমাদের অন্তরে সহজ হয়ে পড়ে।

তারপর বাংলা সাহিত্যের কথা। এর ভিতরে দোষ যে অনেক আছে সে সম্বন্ধে আগেই কিছু বলা হয়েছে; কিন্তু সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এতে ভাল যেটুকু সম্ভবপর হয়েছে তাকে ডিঙিয়ে যাবার মতো কিছু উচুঁতে পাই নি; বরং সাহিত্যের যে একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মুক্ত-বুদ্ধি তার যতটুকু বিকাশ বাংলাতে হয়েছে ততটুকুও সেখানে চোখে পড়ে নি। তা ছাড়া চিন্তার জগতেও বাঙালী মুসলমান শুধু টুপি দেখে আত্মীয় ঠাওরাবে এ মনোভাব সম্বন্ধে শুধু এই বলা যায় যে, যত শীগগির এ দূর হয়ে যায় ততই আমাদের লজ্জা কমে।

দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষ যে যেখানে সত্য ও কল্যাণের সন্ধানী হয়েছে সে আমার ভাই—একথা যদি মুসলমান প্রাণ খুলে না বলতে পারে তবে বৃথাই তার সাম্য ও একেশ্বর-তত্ত্বের অহঙ্কার।—আর শুধু মুসলমানের সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, তার সমস্ত নবসৃষ্টির উৎস এইখানে বাঁধা প'ড়ে ক্রন্দন করছে।

ফাল্গুন, ১৩৩৩

---

"মুসলিম সাহিত্য সমাজে"র প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

## মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজ-বাস্তবতা

নীরেন্দ্রনাথ রায়

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে 'মেঘনাদবধ' রচয়িতার জীবনযুদ্ধের অবসান হইল। যে-প্রতিভার আকস্মিক স্ফুরণে ভারতের কাব্যাকাশে ঘটিয়াছিল নব অরুণোদয়, সেদিন নিবিয়া গেল তাহার দিবাদীপ্তি। বঙ্গের গৌরব রবি গেলা অস্তাচলে।

মধুসূদনের সাংসারিক জীবনের শোচনীয় পরিণতি স্বভাবতই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে শোকের আলোড়ন তুলিয়া থাকে, তার সামাজিক দায়িত্ববোধে আঘাত করে। মনে হয় এমনটি হওয়া উচিত ছিল না; তখনকার সমাজের উচিত ছিল এই যুগপ্রবর্তক কবিকে সকল অভাবের ঊর্ধ্বে রাখা, দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা। মেঘনাদবধের প্রথম টীকাকার হেমচন্দ্র প্রসঙ্গান্তরে অভিযোগ করিয়াছিলেন,

> হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
> কেন এ অখ্যাতি ভবে,
> যে জন সেবিবে ও পদযুগল সেই
> সে দরিদ্র হবে।

কিন্তু হেমচন্দ্রের এই অভিযোগে যোগ দিবার অধিকার মধুসূদনের ছিল না। তিনি দরিদ্রের ঘরে জন্মান নাই, চিরদিন দারিদ্র্যপীড়িত ছিলেন না। তাঁহার দারিদ্র্য স্বোপার্জিত। প্রতিভার অনাদরকে তাহার কারণ বলা যাইতে পারে না। মধুসূদনের মতো ক্রান্তিকারী কবি তাঁহার সমসাময়িকগণের নিকট যে সমাদর ও স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। ইহা বাঙালী পাঠকসমাজের কাব্যগুণ বিবেচনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

মৃত্যুকালে মধুসূদনের বয়স ছিল পঞ্চাশ। কিন্তু তাঁহার দৈহিক জীবনের সমাপ্তির পূর্বেই তাঁহার কবি-জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাঁহার শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। নিজের

কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে মধুসূদনের আত্মবোধ ছিল চিরদিন দৃপ্ত। তবু এই কবিতা-গুচ্ছের অনেক অনেক সনেটে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে বিষণ্ণ অবসাদের সুর, আপন শক্তিহ্রাসে আত্মসচেতন অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু এই অবসাদের পর্বেও কবি নিজেকে লইয়াই একান্তভাবে বিব্রত ও ব্যাপৃত ছিলেন না। এই কবিতা-গুলি বিদেশে বসিয়া রচিত, আর কে না জানে আমাদের দেশে বিদেশিয়ানার প্রধান অগ্রদূত ছিলেন মধুসূদন। অথচ এই পুস্তকের ১০২টি সনেটের মধ্যে মাত্র পাঁচটির বিষয়বস্তু বিদেশীয়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে শেষ বয়সে মধুসূদনের বিদেশীয় সংস্কৃতিতে বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল। তাহা যে আসে নাই—হেক্টর বধ-এর কথা ছাড়িয়া দিলেও বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তনই তাহার প্রমাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট মহৎ কবিগণের আত্মপ্রকাশের সুপ্রতিষ্ঠিত মাধ্যম। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই নাকি শেক্‌স্‌পীয়র আপন অন্তরদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের তদানীন্তন হৃদয়াবস্থা সনেটরূপে প্রকাশ পাইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো মহৎ-কবি মনোজগতেও একক হইতে পারেন না আপন স্বদেশীয় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে একান্তভাবে উপেক্ষা করিয়া তাহার সুদূর প্রবাসে মধুসূদনের স্বদেশ তাঁহাকে কিভাবে টানিত তাহার অজস্র নিদর্শন আছে এই সনেটগুচ্ছে। পরাধীন দেশে স্বদেশনিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতার গ্লানি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, পারা সম্ভব নয়। কবি মধুসূদনকে সাধারণ বিচারে রাজনীতি-নিরপেক্ষ মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তিনিও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে "আমরা" নামক সনেটটি উদ্ধৃত করা যায়:

> আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
> নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
> তাদের সন্তান কি হে আমরা
> সকলে?
> আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
> পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে?—
> কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি মরকতে,
> ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
> নির্গন্ধে? কে কবে মোরে? জানিব
> কি মতে?

বামন দানব কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?—
রে কাল, পুরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত কল্পে? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে?

সহজেই চোখে পড়ে মধুসূদনের স্বদেশনিষ্ঠা কূর্মবৃত্তি নহে, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে পূজা করার হ্রস্বদৃষ্টিপ্রবণতা ইহাতে নাই। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম মানবিকতার মূল্যবোধে মহীয়ান।

২.

'মানবিকতাবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহারে আসে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় সেইসব লেখক ও পণ্ডিতগণের মনোবৃত্তিকে নির্দিষ্ট করার জন্য যাঁহারা নবজন্মের বা রেনেসাঁস-এর প্রভাবে প্রভাবিত হন। এই নূতন জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে বিধায়করূপে বিরাজমান মানবসমাজ; তাই ইহা মানবিকতাবাদ বলিয়া খ্যাত। রেনেসাঁস ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়, কিন্তু ইহার যুগসীমা সুনির্ধারিত নহে। কবে যে ইহার সঠিক আরম্ভ ও কোথায় ইহার শেষ, তাহা লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির বিচারে ইহার কয়েকটি মূল অবদান, মনে হয় তর্কাতীত। মধুসূদনের প্রায় সমকালীন মানবিকতাবাদী মার্কিন বক্তা রবার্ট ইংগারসল্ যে 'বিশ্বাস'—ক্রীড—প্রচার করিতেন, মনে হয় না তাহা মানিয়া লইতে মধুসূদনের কোথাও বাধিতে পারিত। তিনি বলিতেন:

ন্যায় আমার একমাত্র উপাস্য,
প্রেম একমাত্র পুরোহিত,
অজ্ঞান একমাত্র দাসত্ব,
সুখ একমাত্র মঙ্গল।
সুখী হইবার সময়—বর্তমান
আর তাহার দেশ—এই পৃথিবী,
উপায়, সুখী করা অন্যকে;
জ্ঞান হইতেছে সুখী হওয়ার বিজ্ঞান।

কিন্তু ইহা তো গেল শুদ্ধ মতামতের কথা। ইউরোপীয় রেনেসাঁস নিছক মতামতের ব্যাপার নহে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইহা আনিয়াছিল এক যুগান্তকারী উন্মাদনা। এ উন্মাদনার প্রসার কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ও বিশাল ভূখণ্ড ব্যাপিয়া। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সাহিত্যে, গণিতে, বস্তু-বিজ্ঞানে, ইহার বিরাটত্ব চিরাঙ্কিত হইয়া আছে। এই উন্মাদনার প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে সিস্‌টিন চ্যাপেল-এ অঙ্কিত মিকায়েল আঞ্জেলোর বিরাট চিত্রকে—'আদমের নবজন্ম'। গ্রীকযুগের পর মানবদেহকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইতেছে নবতর জ্যোতিতে ; সে দেহ অনাবৃত ও অলজ্জিত, তাহার সবল বাহু, উপবাস-অক্লিষ্ট, জীবনের ও আলোকের দিকে প্রচণ্ড আগ্রহে প্রসারিত। ঐহিক জীবনকে উপভোগ করার উদগ্র কামনা, রেনেসাঁস-এর সহজাত প্রেরণা। এই প্রেরণাই জমাট হইয়া আছে রাবলে-এর তিনটি বিখ্যাত চরণে :

কান্নার চেয়ে হাসির কথা লেখাই ভালো,
কারণ হাসিই হচ্ছে মানুষের নিজস্ব অধিকার ;
বাঁচো স্ফূর্তিতে।

মনে রাখিতে হইবে মিকায়েল আঞ্জেলোর চিত্রে বা রাব্‌লে-এর সাহিত্যে জীবন উপভোগের যে চিত্র প্রতিফলিত, তাহা ক্লীবের নহে, বীরের। এই বীরোচিত সাহস লইয়া তখনকার মানুষ তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল অতিপ্রাকৃতের মায়াপাশকে, ভাঙিয়া ফেলিতে চার্চ-এর অত্যাচারকে, ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে মধ্যযুগের শৃঙ্খল হইতে ও স্বাধীনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে যুক্তি-প্রয়োগের ভিত্তিতে। এই রেনেসাঁস-এর আস্তপীঠ ইতালী ও তাহার পরিণত প্রকাশ ইংলণ্ডে, পঞ্চদশ শতকের ইতালীতে জন্মিয়াছিলেন লেওনার্দো, আর ষোড়শ শতকের ইংলণ্ডে শেক্সপীয়র।

ইউরোপের রেনেসাঁস পর্বে চেতনার ক্ষেত্রে নবসৃষ্টির যে বিপুল প্রেরণা ও সাফল্য লক্ষ্য করা যায় তাহা ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিরাট বিলোড়নের প্রতিফলন। মানুষের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে বলা যায় উপরিতলের ব্যাপার, যাহার প্রকৃতি নিরূপিত হয় প্রধানত সামাজিক জীবনের প্রকৃতি দিয়া। আর সামাজিক জীবনের প্রকৃতি নির্ভর করে সমাজের অভ্যন্তরস্থ অর্থ নৈতিক শ্রেণী-সম্পর্কের গুণাগুণের উপর। উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের ফলে শ্রেণী-সম্পর্কে কখনো থাকে এক শ্রেণীর আধিপত্য, কখনো ঘটে অন্য শ্রেণীর—এই

শ্রেণীগত পরিবর্তনের ফলে আসে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা, নূতন রাষ্ট্রগঠন, নূতন সমূহ-চেতনা, নূতন শিল্পসৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। রেনেসাঁস-পর্বে ইতালীতে ও ইংলণ্ডে যে অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীলতা দেখা যায় তাহার মূলে ছিল সুদৃঢ়-প্রোথিত ফিউডালী সমাজ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করিয়া নূতন বুর্জোয়া-সমাজ প্রবর্তনের বিপ্লবী-উন্মাদনা। সমাজ-ব্যবস্থায় এত বড়ো বিপ্লব ইহার পূর্বে আর ঘটে নাই, তাই ইহার সম্ভাব্যতারও তুলনা ছিল না। বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে নূতন সমাজ-গঠনের প্রচেষ্টা ইতালীতে আংশিকভাবে সফল হইলেও অর্ধপথে অবরুদ্ধ হইল। নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে ইংলণ্ডে শ্রেণীসংঘর্ষ প্রচণ্ডতর হওয়ায় ওদেশেই ধনবাদী সমাজের প্রথম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয়। বৃহৎ শ্রম-শিল্পের প্রসার, জীবিকার্জনে ব্যক্তির বন্ধন-মুক্তি, সুতীব্র জাতীয়তাবোধ ও জনগণের প্রতিনিধি সমন্বিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা—মানবীয় অগ্রগতির এই প্রকাণ্ড অবদানগুলি ইংলণ্ডেই প্রথম সুস্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করে। ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব হইয়া ওঠে ভবিষ্যতে ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে ফিউডালী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। ইংলণ্ডে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান,—শেক্সপীয়র, বেকন ও নিউটন—আলোকবর্তিকার মতো সকল দেশের সংস্কৃতি-সাধককে তাদের জাতীয় সংস্কৃতি-গঠনের পথ দেখাইয়া দেয়। বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রকৃষ্টতম সাহিত্য-রূপ ইংরেজী সাহিত্যে। ফ্রান্সে হুগো ও বালজাক, জার্মানীতে গোটে শীলার, রুশিয়ার পুশকিন ও লেরমেনটভ, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার ইবসেন ও বিয়র্নসন-সকলেই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছেন ইংরেজী সাহিত্যের নিকট তাঁহাদের ঋণ। কিন্তু কেবল সাহিত্যে নহে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্বে ইংলণ্ডের ইতিহাস সমৃদ্ধ। ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর জীবনদর্শন ও লেনিনের বিপ্লবী সাধনা পূর্ণতা লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, মানব-সমাজের অভীপ্সিত পূর্ণ-মুক্তির পথে বুর্জোয়া-বিপ্লব প্রাগ্রসর পদক্ষেপ হইলেও অসমাপ্ত স্তর। ইহাতে শ্রেণী-সংঘর্ষের অবসান হয় না, শ্রেণী-আধিপত্যের হস্তান্তর হয় মাত্র। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণের নেতৃত্বের ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া কঠোরতর শোষণের পরিচালকে পরিণত হয়। তাহার ভয়াবহ কুৎসিতরূপ প্রকটতর হয় ধনবাদ যখন প্রবৃত্ত হয় পরদেশবিজয়ে ও অনুন্নত দেশগুলিকে

অবাধ লুণ্ঠনে। ইহাই ধনবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ। প্রথমত লুণ্ঠনকারীর ভূমিকা লইয়া ইংলণ্ডের ধনবাদ ভারতের ভূমিতে আসিয়া পদার্পণ করিল ও ক্রমে অখণ্ড ভারতের অপ্রতিহত অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইল। ভারত হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুকুটে উজ্জ্বলতম রত্ন। ইংরেজের স্বার্থে ভারতে ধনবাদের প্রবেশ ধনবাদের বিশ্বব্যাপী প্রসারের একটি বিশেষ জটিলতাপূর্ণ অধ্যায়। এবং ফিউডালী ভারতের সহিত ধনবাদী ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক সংযোগের প্রত্যক্ষ ফল—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৩.

ইংরেজ বণিকরূপে ভারতের নানা প্রদেশে সুপরিচিত হইলেও তাহার রাজরূপের প্রথম প্রকাশ বাংলাদেশে, পলাশী-বিজয়ে। এ-যুগের ইতিহাসে তাই বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মার্কস্ যাহাকে বলিয়াছেন "একমাত্র সামাজিক বিপ্লব যাহার কথা এশিয়াতে শোনা গিয়াছে", তাহার সূত্রপাত হয় বাংলাদেশে ও পরে ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই সামাজিক বিপ্লবের প্রধান লক্ষণ, সনাতন গ্রামীন উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য যান্ত্রিক শ্রম-শিল্পের ভিত্তিতে নূতন ধনবাদী অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। পুরাতন ভারতের সহিত নূতন ভারতের ইহাতেই ঘটিল মূলগত ছেদ। কারণ ভারতের ইতিহাসে অতীত যুগে যতই বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়া থাকুক না কেন, তাহার অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ধারা মোটামুটি অব্যাহত ছিল উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, ইহাই মার্কসের অভিমত। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। তাই বলা যাইতে পারে পলাশী-বিজয়ের তারিখ—১৭৫৭, আমাদের জাতীয় জীবনে যে গুণগত রূপান্তর সূচিত করে, কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের তারিখ—১৮১৭, তাহার অবধারিত ফল। এই কলেজ স্থাপনে ভারতে ইংরেজ শাসকের সদভিপ্রায় সূচিত হয় না। ইহাতে শুধুই প্রমাণ হয়, কোনো শাসকশ্রেণী ইতিহাসের অগ্রগতিকে অর্গলিত করিতে পারে না। নিজেদের অজ্ঞাতসারেও তাহাদিগকে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসাধনে সহায়ক হইতে হয়। হিন্দুকলেজ স্থাপনের ফলে, ইংরেজের অনিচ্ছা ও কৃপণতা সত্ত্বেও মার্কসের মতে ভারতে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয় যাহারা দেশ-শাসনের উপযুক্ত ক্ষমতায় ভূষিত, ও যাহারা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত।

মার্কসীয় পরিভাষায় "শ্রেণী" শব্দটির বিশেষ দ্যোতনা আছে, যাহা সাধারণ ভাষায় প্রযুক্ত "শ্রেণী" শব্দটির সমার্থক নহে। ধনী-দরিদ্র শ্রেণী বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী প্রভৃতি পদাংশে শ্রেণী শব্দটি ব্যবহৃত হয়, শিথিল অবৈজ্ঞানিক-ভাবে। মার্কসীয় বিজ্ঞানে "শ্রেণী" বলিতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে লেলিন লিখিতেছেন :

শ্রেণীগুলি হইতেছে জনগণের বৃহৎ বৃহৎ গ্রুপ যাহারা পরস্পর হইতে পৃথক হয় সামাজিক উৎপাদনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট-সিস্‌টেমে তাহাদের অধিকৃত স্থান দ্বারা, উৎপাদনের উপায়গুলির সহিত তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা ( যে সম্বন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও নিয়মবদ্ধ হয় আইনসমূহে ) শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাহাদের ভূমিকা দ্বারা, এবং ফলত সামাজিক ঋদ্ধির যে অংশ তাহারা পায় তাহার পরিমাণ ও প্রণালী দ্বারা। শ্রেণী বলিতে বোঝায় জনগণের গ্রুপগুলিকে যাহাদের একটি অন্যের শ্রম গ্রাস করিতে পারে, সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট সিস্‌টেমে তাহাদের বিভিন্ন স্থান অধিকারের ফলে। [ লেলিন, নির্বাচিত রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২-৩৩ ]।

এই সংজ্ঞা অনুসারে দেখা যায় নূতন শ্রেণীর উদ্ভব যে-কোন দেশে যে-কোন সময়ে হইতে পারে না। তাহার জন্য প্রয়োজন, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে এমন পরিবর্তন যাহাতে প্রচলিত শ্রেণীগুলির ভূমিকায় ভারসাম্য বজায় থাকে না, নূতন সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ভারতে ব্রিটিশ ধনবাদের অনুপ্রবেশে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়াই এদেশে নূতন-শ্রেণী-সৃষ্টিও সম্ভব হইল। ভারতে প্রচলিত ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে হয়তো কোনোদিন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব হইতে পারিত। তাহাই হইত প্রকৃত ভারতীয় ধনবাদ। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাচক্রের গতিতে ভারতে ধনবাদের প্রবর্তন হইল বিদেশী শাসনের ছত্র-ছায়ায়। এই ধনবাদ কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। আর স্বাধীন দেশের ধনিকশ্রেণীও যখন জনগণের স্বার্থকে শেষ পর্যন্ত মানিয়া চলে না তখন ঔপনিবেশিক ধনিক শ্রেণীর নিকটে তাহা আশা করা, ইতিহাসের নির্দেশকে অবজ্ঞা করার নামান্তর! যে সামন্ততান্ত্রিক জীবন-যাত্রার উচ্ছেদ ধনবাদের অবশ্য কর্তব্য, ভারতে ব্রিটিশ ধনবাদ ও তাহার অনুচর ভারতীয় ধনবাদ কেহই তাহা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিল না। যে নূতনশ্রেণীর উদ্ভব হইল তাহা রহিয়া গেল আধা-ফিউডাল ; পুরাতন জীবনাদর্শের মোহ তাহাদিগকে

অনেকাংশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু তাহা সত্বেও পুরানো অবস্থাও টিকিয়া থাকিতে পারিল না। সমাজের জীবনে আসিল গতিশীলতা, আসিল জাগরণ, আসিল স্বাধীনতার স্বপ্ন, আসিল পরাধীনতার গ্লানি, আসিল জ্ঞান-স্পৃহা, আসিল উন্মাদনা। এই নূতন চেতনার প্রধান পুরোহিত রামমোহন ও ডিরোজিও; এবং এই চেতনার প্রধান রূপকার—মধুসূদন।

৪

মধুসূদনের জীবনচরিত পড়িতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁহার পক্ষে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস অপ্রত্যাশিত আপতিক ব্যাপার। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার মত ছিল "বাংলাভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভালো", 'শিব' শব্দের বানানে লাগে 'শ' কি 'ষ' তাহাও তিনি সঠিকভাবে জানিতেন না। বাঙালী-বর্জিত মাদ্রাজ প্রদেশে বাস করিয়া, ইংরেজ মহিলার সহিত সংসার করিয়া, ইংরেজি ভাষায় কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা যশস্বী হইয়া তিনি যখন পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন সাগরদাঁড়িতে শেখা মাতৃভাষার ভাণ্ডার তাঁহার অন্তর হইতে প্রায় অবলুপ্ত বলিলেই হয়। কিন্তু যে-সমাজে বুর্জোয়া অর্থনীতি প্রবেশ করে তাহার অন্যতম প্রধান দাবি হইয়া ওঠে মাতৃভাষার বিকাশ। এই ঐতিহাসিক নিয়মের ব্যতিক্রম বাংলাদেশেও হয় নাই। রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে বাংলা গদ্যের প্রকাশ ক্ষমতা জন্মের পর হইতে ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িতে থাকে। ইহাতে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালির মনে, বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই, জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হইতেছিল। উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডেভিড হেয়ার-এর তৃতীয় সাংবৎসরিক স্মৃতি-সভায় অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যেন এক নূতন প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিলেন; জাতীয়তাবোধ একবার সঞ্চারিত হইলে তাহা আর শুধু গদ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। জাতীয় সংস্কৃতি-সম্পদ রচনার আগ্রহ অদম্য কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে। যে বৎসর শুরু হয় মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস, সেই বৎসরই—১৮৪৮—মধুসূদনের সহাধ্যায়ী সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এক সভায় ঘোষণা করেন যে স্বদেশীয় ভাষার উন্নতিসাধন স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য, এবং বিদেশীয় মহাকবি-গণের রচনা অমৃততুল্য হইলেও তাহা হৃদয়ের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না:

"যথার্থ বলিতে কি হোমর প্লেটো ও সফোক্লিস রচিত চারুতম, নিরুপম কাব্যরস পানের প্রকৃত সুখ সম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক শেক্সপীয়রের অমৃত-ধর্মপ্রাপ্ত নাটকসকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই কিম্বা অদ্ভুত সুকল্পনাশক্তিসম্পন্ন গেটে ও শিলারের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্যার্ণবে মগ্ন হই তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে, সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য, বিশাল-খ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা। সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃত-ধারা পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর, আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে, সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?" (উদ্ধৃতি যোগীন্দ্রনাথ বসুর "জীবন-চরিত" হইতে গৃহীত।)

ইহা হইতে কি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না যে বাংলাভাষায় কলম ধরিবার কথা মধুসূদনের স্বপ্নেও গোচর হইবার পূর্বেই তাঁহার ভবিষ্যৎ শিল্পসৃষ্টি উপভোগ করিবার উপযুক্ত পাঠক বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল? মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসার পর যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি মধুসূদনকে বাংলা রচনায় প্রবুদ্ধ করে তাহাদের অন্তরেই কি নিহিত ছিল না ইতিহাসের ইঙ্গিত? ধনবাদী অর্থনীতির প্রভাবে ইউরোপীয় মানবিকতার যে আদর্শ তখনকার সমাজ-চেতনায় বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছিল মধুসূদনের বাংলা রচনার প্রয়াস তাহারই অনিবার্য কাব্যরূপ। বাংলায় ভালো নাটক নাই, আচ্ছা, আমিই রচনা করিব, অথবা বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজন আছে কিন্তু সম্ভাবনা নাই, আচ্ছা আমিই তাহা সম্ভব করিব—এই ধরনের উক্তিগুলিকে মধুসূদনের অহংকৃত উচ্চাশার, অথবা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার পরিচায়ক বলিলে ইহাদের প্রকৃত মূল্য দেওয়া হয় না। এ কথা নিশ্চিত মধুসূদনের যশঃকামনা ছিল দুর্বার, আর তাঁহার প্রতিভাও ছিল দুর্লভ। সেই সঙ্গে এ কথাও মানিতে হয় যে কেবল কামনা ও প্রতিভা দিয়াই বৃহৎ কবির সার্থকতা অর্জন করা যায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন একদিকে অনুকূল পরিবেশ অন্যদিকে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি। তাঁহার প্রতিভাবিকাশের অনুকূল পরিবেশ, মধুসূদন পাইয়াছিলেন কপোতাক্ষতীরে জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতে নয়, অথবা মাতৃভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মাদ্রাজ প্রবাসের বিজাতীয় সমাজেও নয়। সে অনুকূল পরিবেশ তিনি পাইয়াছিলেন

কলিকাতায়,—ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজে, এবং লেখকজীবনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠক সমাজে। ফিউডাল সমাজ হইতে বুর্জোয়া সমাজের অভিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রও স্থানান্তরিত হয় গ্রাম হইতে শহরে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রধানত নাগরিক সংস্কৃতি। কলিকাতার নাগরিকেরা তখন বাঙালী সমাজের উন্নততর অংশ, এবং বাংলা ভাষার রঙ্গমঞ্চে মধুসূদনের প্রবেশ ইহাদের আনন্দ বিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশক হিসাবে। কলিকাতার সমাজই গড়িয়া তুলিয়াছিল মানবিকতার প্রথম বাঙালী মহাকবি মধুসূদনকে, যেমন করিয়া, বেন্ জনসন-এর মতে, সে যুগের লণ্ডন গড়িয়া তুলিয়াছিল মানবিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপীয়রকে।

প্রতিভার স্ফুরণে অপর প্রয়োজন, প্রস্তুতি। এ-ক্ষেত্রেও শেক্সপীয়র সম্বন্ধে বেন্ জনসন-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। যতদূর জানা যায়, ইংরেজ সমালোচকগণের মধ্যে বেন্ জনসনই প্রথম শেক্সপীয়রের অলৌকিক প্রতিভা ও বিশাল নাটকাবলীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহাতীত বিশ্বাসবান ছিলেন। শেক্সপীয়রের মৃত্যুর সাত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত প্রথম ফোলিও-র ভূমিকায় তিনি যে-কবিতা লেখেন তাহাতেই ঘোষণা করেন যে এই কবি এক যুগের নহেন, চিরকালের। ইহা সত্ত্বেও বেন্ জনসন শেক্সপীয়রের রচনায় বহু ত্রুটি লক্ষ্য করিতেন, ও অতিরঞ্জনের সুরে একবার রায় দিয়াছিলেন যে তাহার রচনায় অন্তত হাজার লাইন সম্মার্জনীর অপেক্ষা রাখে। সুশিক্ষিত কবি বেন্ জনসন শেক্সপীয়রের প্রতিভাকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার অশিক্ষিত স্খলনকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ছাত্রাবস্থা হইতে কবিযশঃপ্রার্থী মধুসূদন নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে বেন্ জনসন-এর মানদণ্ডে পরীক্ষাও তিনি সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। রিচার্ডসনের অতুলনীয় শিক্ষার অনুপ্রাণনায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমৃদ্ধতম কাব্যের সহিত তাঁহার যোগ হয় প্রাণময়। ইহার পর বিশপ্‌স্ কলেজে শিক্ষার সুযোগে তিনি আয়ত্ত করেন লাতিন, গ্রীক ও হিব্রুভাষা। রেনেসাঁস-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ইউরোপে যে-জ্ঞানোন্মাদনা—বিদ্যার পুনরুজ্জীবন—দেখা দিয়াছিল; স্বীয় প্রতিভাবলে মধুসূদন এদেশে বসিয়া তাহার অনুকম্পন অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। রেনেসাঁস-এর ফলে ইতালীয় ও ফরাসী ভাষায় যে-কাব্যসম্পদ সৃষ্টি হইল, প্রত্যক্ষ সংযোগে তাহাকেও আত্মসাৎ করিতে তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁহার মতে এক-একটি ইউরোপীয় ভাষায় অধিকারলাভ করা

আর এক-একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করা সমান। তাঁহার ধারণা ছিল কোনও ভাষায় কবিতা রচনার ক্ষমতা না জন্মিলে তাহাতে প্রকৃত অধিকার জন্মিয়াছে, এ-কথা বলা যায় না। মাদ্রাজে থাকিতে তিনি সংস্কৃত ও তামিল ভাষা শিক্ষায়ও মনোযোগ দিয়াছিলেন। এ হেন প্রস্তুতি লইয়া আর কোন্ কবি বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন? তাঁহার জীবনের সমস্ত অমিতাচার তাঁহার কাব্যচর্চার উচ্চাদর্শকে কোনোদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই। পারে নাই যে তাহার কারণ, তাহাদের উভয়ে একই বৃক্ষের ফল— ইউরোপীয় রেনেসাঁস। জ্ঞান ও কল্পনার প্রাচুর্য, শক্তি ও উপভোগের ঐশ্বর্য —সমুদ্রগামী নাবিকের সম্মুখে চির-অপসৃয়মান দিগন্তরেখার মতো, রেনেসাঁস চিত্তকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত। কোনো বাধাই অলঙ্ঘ্য, কোনো লক্ষ্যই অভেদ্য বলিয়া স্বীকার করা তখন ছিল চিন্তার অযোগ্য। তাঁহার মানসিক গঠনে এই রেনেসাঁস-বিভাবের সঙ্কারের ফলেই প্রায় অবাঙালী মধুসূদন বাংলা ভাষায় অভূতপূর্ব কীর্তি সাধনের দায় অঙ্গীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রায় অবাঙালী কিন্তু সম্পূর্ণ বিজাতীয় মধুসূদন ছিলেন না। কারণ, কোনো ভাষায় উচ্চশ্রেণীর কাব্য রচনা করিতে গেলে অপরিহার্য প্রয়োজন সেই ভাষার প্রাণশক্তির সহিত সহজাত পরিচয়। বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া সাময়িক খ্যাতি ও পাঠকের বিস্ময় অর্জন করা যায়, স্থায়ী আসন অধিকার করা যায় এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগে বৃহৎ-মাত্রায় আন্তর্জাতিক সংমিশ্রণের আনুকূল্যে হয়তো বিদেশী ভাষায় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ বা ঘটনাপূর্ণ উপন্যাস লিখিয়া সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের যুগে বাংলাদেশে সে-সম্ভাবনা ছিল অভাবিত। সে-যুগে একমাত্র বাংলাভাষাই মধুসূদনের প্রতিভার উপযুক্ত বাহক হইতে পারিত। তাহার জন্য অবশ্য এ ভাষাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। কারণ যে-ভাবাবেগের আধার হইতে হইবে এ-ভাষাকে, তাহা যে পূর্বতন আধেয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মধুসূদন জানিতেন যে তিনি একজন 'সাহিত্যিক বিপ্লবী'। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য বিপ্লবীকে গড়িয়া লইতে হয় নিজস্ব হাতিয়ার—অতীতের ঐতিহ্য তাহাকে ইহা উপহার দেয় না। আবার প্রকৃত বিপ্লবী অতীতের ঐতিহ্যকে অবজ্ঞাভরে পদদলিত করে না, তাহাকে গ্রহণ করিয়া অতিক্রম করে। ইতিহাসের অনেক পর্বে এ-অতিক্রমণ হয় মৃদুগতি,

কিন্তু এমন পর্বও আসে যখন তাহাতে আসে গুণগত পরিবর্তন, ক্রান্তিকালীন উল্লঙ্ঘন, যখন আধেয়ের প্রভাবে আধার হয় সাবলীল। আবেগের উপযুক্ত বাহন হইবার নির্দেশে ভাষা যেন নবকলেবর পরিগ্রহ করে, দেখা দেয় প্রায়-অচেনা মূর্তিতে, উৎপাদন করে নব নব বিস্ময়। রেনেসাঁস-যুগে এহেন রূপান্তর ঘটিয়াছিল ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায়। মধুসূদনের প্রতিভা ভারতে নবাগত নূতন বুর্জোয়াচেতনার শঙ্খধ্বনি হইয়া বাংলাভাষার মজা খাতে বহাইয়া দিল নূতন প্রাণকল্লোল, সৃষ্টি হইল 'মেঘনাদবধ'-এর বহুধ্বনিত আরাব, মধুসূদনের অপূর্ব কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

৫

লক্ষ্য করিতে হইবে, মধুসূদনের ছন্দ-বিপ্লব বাংলা ভাষার গতিবেগকে খরতর ও অগভীরতাকে গভীরতর করিয়া ধারণ-ক্ষমতাকে প্রগাঢ়তর করিল, কিন্তু তাহার দুই কূল প্লাবিয়া বহিয়া গিয়া অনাচারের তাণ্ডব ঘটিতে দিল না। পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের কাঠামোকে দৃঢ়মুষ্টিতে আঁটিয়া ধরিয়া তিনি তাহাতে ঢালিয়া দিলেন যতিস্থাপনের নানা কৌশল, ভাবস্পন্দনের অবাধ মুক্তি। বাংলা পয়ার তাহার চিরাচরিত একতাল ছাড়িয়া নানা তালে নাচিয়া উঠিল; পদ্যছন্দ তাহার মাত্রাজ্ঞান সম্পূর্ণ নিখুঁত রাখিয়া গদ্যছন্দের মতো কথ্যভাষার নিকটবর্তী হইয়া আসিল। এগুণ অর্জন করিতে না পারা পর্যন্ত অমিত্রচ্ছন্দ বৃহৎ কাব্য-রচনায়, নাটক বা এপিক রচনার উপযুক্ত মাধ্যম হইতে পারে না। এই ছন্দ-বিপ্লবে ইংরেজীর ব্ল্যাঙ্ক ভার্সই ছিল মধুসূদনের মডেল। প্রতি লাইনে পাঁচ পর্বের কঠিন নিগড় পায়ে বাঁধিয়া তবে সে-ছন্দ অন্ত্যযমকের মোহ ভাঙিতে পারিয়াছিল। আর মেরুদণ্ড যে পরিমাণে শক্তিশালী থাকে সেই পরিমাণে যেমন জিমনাষ্ট চমকপ্রদ শারীরিক কসরত দেখাইতে পারে, সেইরূপ শেক্সপীয়রের শেষ পর্বের নাটকগুলিতে এই পঞ্চপার্বিকতা ভাঙি' ভাঙি' করিয়াও একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই। দ্রুত সংলাপশীল নাটক না লেখায় বাংলা অমিত্রচ্ছন্দের এ-সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া মধুসূদন পাশ কাটাইতে পারিয়াছেন। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে কি করিয়া শেক্সপীয়রীয় নাটকের ভাষার উপযোগী করা যায়—বাংলার কোন কবি আজও এ কর্তব্যে মন দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। নাটকীয় ভাষাকে কথ্যরীতির অনুগামী করিতে হইলে, আমাদের সামাজিক সম্পর্কে সম্বোধনের যে তিনটি রূপ প্রচলিত আছে—

আপনি, তুমি ও তুই—ইহাদের তিনটিকেই ব্যবহার করিতে হইবে, কোনো একটি বাদ দিলে ভাষা পঙ্গু অথবা ভাব প্রকাশ অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। অথচ, বাংলা নাটকে বা কাব্যে ছন্দে তুমির প্রচলনই সর্বাধিক। সামাজিক সম্পর্ক নির্বিশেষে তুই ব্যবহার নিষিদ্ধ না হইলেও যথাসাধ্য এড়াইয়া চলা হয়; আর আপনি-র প্রয়োগ একেবারে নাই বলিলেই চলে। মধুসূদন যে এই সমস্যায় একেবারে অনবহিত ছিলেন না, তাহার অন্তত একটি উদাহরণ আমার স্মরণে আসিতেছে: পঞ্চবটী বনে যোগীবেশ রাবণকে সীতা বলিতেছেন,

অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরুমূলে;

কিন্তু তাহার পরের ছত্রেই আছে:

ত্বরায় আসিবে ফিরে রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।

এই উদাহরণ হইতে বোঝা যায়, বাংলা ভাষার প্রকৃতি লইয়া কত সন্তর্পণে মধুসূদন তাহার পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। ছন্দ-বিপ্লবের নামে ভাষা লইয়া ছিনিমিনি খেলার দুরন্ত নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসে নাই—যেমন বসিয়াছিল ধনবাদী সমাজের ভাঙন দশায় ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে সাম্প্রতিকতার নামে সুর্‌রেয়ালিস্ত্‌দের। ভাষার বোধ্যতা নির্ভর করে প্রধানত দুইটি জিনিসে: তাহার মৌলিক শব্দভাণ্ডার ও তাহার বাক্যের অন্বয়শৃঙ্খলা, ইহাই স্তালিনের শিক্ষা। তিনি আরো শিখাইয়াছেন, ভাষায় রচিত সাহিত্যে ঘটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে; কিন্তু ভাষার ঘটে কালগত বিবর্তন, যেহেতু ভাষা শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়মাধীন নহে, যেমন নহে, বিজ্ঞানের ফরমূলা বা উৎপাদনের যন্ত্রাবলী। বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা অবশ্য ইহাদিগকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারে। মধুসূদনও প্রচলিত বাংলাভাষাকে ব্যবহার করিলেন তাঁহার বিপ্লবী কাব্য-প্রণয়নের উদ্দেশ্যে; তাহার শব্দসম্পদ যথাসাধ্য বাড়াইলেন কাব্যরসের প্রয়োজনে; অন্বয়ের শৃঙ্খলাকে যথাসাধ্য বিচলিত না করিয়া নূতনত্ব আনিলেন গৌণভাবে। এই জন্যই মধুসূদনের বাংলাভাষা পুরাতন হইয়াও নূতন; তাহা স্থানে স্থানে কঠিন হইলেও অবোধ্য নহে। অভিধান বা পুরাণের সাহায্যে তাহার অর্থবোধে বাধে না। সুর্‌রেয়ালিস্ত্‌দের ভাষার মতো, তাহা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ইংগিতে ও অনুষঙ্গে বিভ্রান্তিকর নয়; তাহা পাণ্ডিত্যের সাজে সজ্জিত হইয়াও জনসাধারণের বোধ্য ভাষা হইবার দাবি করিতে পারে। ভাষার

এই প্রসাদগুণেই মধুসূদন গোষ্ঠীবিশেষের কবি নহেন, বাঙালী পাঠক সমাজের কবি। তবুও যে মধুসূদনের ভাষায় সে কালের বাঙালী এত নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়াছিল, তাহার কারণ, ইহা ছিল এক নূতন সংস্কৃতির ভাষা, নূতন চেতনার প্রকাশ। এই চেতনার বাহন হইয়া মধুসূদনের ভাষাপ্রয়োগ বঙ্গভারতীকে গ্রাম্য সাহিত্য হইতে নাগরিক সাহিত্যে ও তথা হইতে বিশ্ব-সাহিত্যে আসনগ্রহণের গৌরবের পথে শুভযাত্রা করাইয়া দিল।

৬.

বিশ্বসাহিত্য বলিতে ইদানিংকাল পর্যন্ত যাহা বোঝাইত তাহা হইতেছে বিশ্বব্যাপী ধনবাদের সাংস্কৃতিক রূপ। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সাম্যবাদীর ঘোষণায়' লিখিত আছে :

পুরাতন অভাবের স্থলে, দেশের উৎপাদন দিয়া যাহা পূরিত হইত, আমরা এখন দেখি নূতন নূতন অভাব, যাহার পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় দূর দেশে ও ভূখণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের। পুরাতন আঞ্চলিক ও জাতীয় নিভৃতির ও স্বয়ংপূতির স্থলে আমাদের সংযোগ হয় সর্বদিকে, আমরা পাই জাতিগুলির বিশ্বব্যাপী অন্যোন্য-নির্ভরতা। আর পণ্য উৎপাদনে যে অবস্থা, মানস উৎপাদনেও তাহাই। জাতি-বিশেষের মানস-সৃষ্টি সাধারণ সম্পদ হইয়া ওঠে। জাতীয় একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণতা উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া পড়ে, এবং বহুসংখ্যক জাতীয় ও আঞ্চলিক সাহিত্য হইতে উদ্ভূত হয় এক বিশ্বসাহিত্য।

উৎপাদনের যন্ত্রগুলির দ্রুত উন্নতি দিয়া, সংযোগের উপায়গুলিকে অতি-মাত্রায় সহজ করিয়া, বুর্জোয়া শ্রেণী সকল জাতিকে, এমন কি বর্বরতমকেও টানিয়া আনে সভ্যতার ক্ষেত্রে। পণ্যদ্রব্যের সস্তা দরকে ইহা ব্যবহার করে ভারি কামানের মতো সমস্ত চৈনিক প্রাচীরকে চূর্ণ করিতে, বিদেশীর নিকট পদানত হইতে অনুন্নত জাতির যে প্রগাঢ় দৃঢ়তাপূর্ণ ঘৃণা তাহাকে জোর করিয়া নোয়াইতে। ইহা সকল জাতিকে বাধ্য করে—অন্যথায় ধ্বংস—উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে, ইহা তাহাদিগকে বাধ্য করে, বুর্জোয়া মতে যাহা সভ্যতা—তাহাকে নিজেদের মধ্যে প্রবর্তন করিতে, অর্থাৎ নিজেরা বুর্জোয়া হইয়া উঠিতে। এককথায় ইহা সৃষ্টি করে এক নূতন জগৎ, আপন মূর্তি অনুসারে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া বাংলা রচনায় প্রথম হাতেখড়ি দিবার সময় হইতেই কেন মধুসূদন

বিদেশী আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। এ কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত প্রবণতার চরিতার্থতা নয়, ভারতে নবাগত বুর্জোয়া অর্থনীতির ইহাই ছিল আন্তরিক দাবী। বাংলা রচনায় তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা নাটকে ও পূর্ণ পরিণতি এপিকে। তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। নাটকে ও এপিকে জন্মগত যোগসূত্র আছে। একই সমাজব্যবস্থা উভয় প্রকারের সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল। ব্যাপক ও গভীর সামাজিক বিলোড়ন ব্যতিরেকে নাটকে বা এপিকে প্রাণসঞ্চার হয় না ; ইহাদের মহত্ত্ব রচয়িতার কলাকৌশলের উপর একান্ত নির্ভরশীল নয়। আর প্রকরণ হিসাবে নাটক ও এপিকে সমগোত্রীয়তা গ্রীক আমল হইতে স্বীকার করা হইয়াছে। ট্র্যাজেডির সহিত এপিকের সম্বন্ধ-বিচার প্রসঙ্গে আরিস্টোটল লিখিয়াছেন :

হোমরই একমাত্র কবি যিনি এপিক কাহিনীর যথার্থ অনুপাত জানেন ; কখন বর্ণনা করিতে হইবে, আর কখন চরিত্রগুলিকে নিজের কথা নিজে বলিতে দিতে হইবে। অন্য কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরা গল্প বলিয়া যান সোজাসুজি, নাটকীয় অংশ থাকে খুব কম ও দূরে-দূরে ছড়ানো। হোমর, প্রায় ভূমিকা না করিয়াই, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে মঞ্চে ছাড়িয়া দেন—নর ও নারী, যাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে।

হোমর ছিলেন ইউরোপের লিখন-পূর্ব শ্রুত যুগের কাহিনীকার এপিক কবি। শ্রুত এপিকের প্রধান উপজীব্য বীররস ; ব্যক্তিগত বীরের সাহস ও খ্যাতি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে-জগতে আর কিছুই ছিল না। বীরের ছিল না কোন সামাজিক কর্তব্য, কোনো নীতিবোধেরও তাহার প্রয়োজন নাই। একমাত্র বীর্যই তাহার কাম্য। ইতিহাসের বিচারে এ আদর্শ সেই সমাজেই সম্ভব যাহা আদিম কৌম জীবনের অনড় আচার-অনুষ্ঠান ভাঙিয়া বাহির হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না কেন হোমেরীয় এপিক মধুসূদনের কবি-জীবনে এত গভীর রেখাপাত করিতে পারিয়াছিল। বাংলাদেশের যে-যুগের তিনি বাণী-মূর্তি, তাহাও যে প্রচলিত সনাতন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিঘাতের যুগ। তবুও হোমেরীয় জীবনাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হোমরের পর ইতিহাসের ধারা বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত বীরত্বের আদর্শেও ঘটিয়াছে পরিবর্তন। বীরত্বকে আর সামাজিক কর্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। বীর তিনিই, যাঁহার শৌর্যবীর্য বৃহৎ

রাষ্ট্রীয় গৌরব গঠনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। বীরত্বের এই নূতন আদর্শ ভার্জিলের মহাকাব্যে প্রতিফলিত, রচনা হিসাবে যে মহাকাব্য আবার লিখিত এপিকের আদর্শস্থল। লিখিত এপিকে ঘটনার গ্রন্থন দৃঢ়তর ও ভাষার কারুকার্য অনেক বেশী আত্ম-সচেতন। বিশেষণের পুনরুক্তি প্রমুখ হোমেরীয় কাব্যলক্ষণ যাহা লিখিত-এপিকে বজায় রাখা হইয়াছে তাহার মূল কারণ প্রয়োজনীয়তা নয়, আদি কবির প্রতি শিষ্যোচিত প্রণতি। ভার্জিলের শব্দচয়নে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বহুল-প্রযত্ন কারুশিল্প মধুসূদন অনুসরণ করিয়াছেন ও সেইসঙ্গে ভার্জিলের দৃষ্টান্তে মধুসূদন ও হোমরকে অর্ঘ্য দিতে কার্পণ্য করেন নাই।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর ফলে নানাদেশে জাতীয় ভাষাগুলির বিকাশ শুরু হইল। ইতালীয় ফরাসী পর্তুগিজ ইংরেজী প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষা গ্রীক ও লাতিনের কৌলীন্যকে সম্মান করিয়াও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে লাগিল জাতীয় চেতনার বাহন হিসাবে। নূতন ভাষার কবিদের উপর ভার্জিলের প্রভাব ছিল অমেয়। হোমরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইলেও, তাহার প্রভাব অনুভূত হইত ভার্জিলেরও পূর্বগামী হিসাবে। বীরত্বের যে সামাজিক আদর্শ ভার্জিল গৌরবিত করিয়াছিলেন তাহা ছিল রেনেসাঁস-সমাজের ভবিষ্যৎ-বিকাশের সহায়ক। কিন্তু ভার্জিলের কাল হইতে রেনেসাঁস যুগের মধ্যেও কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে ভূকম্পনকারী পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর হইয়াছে প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণী হইতে বুর্জোয়া শ্রেণীতে। ভার্জিলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই অনুকরণে নবীন যুগের মহাকবিরা নূতন যুগচেতনাকে কাব্যরূপ দিতে প্রস্তুত হইলেন। ঈনিয়াস-এর পুরা-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ভার্জিল গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহার সমকালীন রোমক সম্রাট অগস্টাস-এর প্রশস্তি ; তাস্‌সো ও মিল্টন ভার্জিলেরই মতো আপন আপন দেশের ও যুগের বীরত্ব কাহিনীকে মহাকাব্যাকারে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাস্‌সো-র এপিক, 'জেরুসালেমের মুক্তি'র প্রকৃত উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয়দের সহিত অখ্রীষ্টীয়দের সংঘর্ষে খ্রীষ্টীয়দের বীরোচিত শিভালরির বর্ণনা করা। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ফেরারা-র দ্বিতীয় আলফন্সোই তাঁহার মনোনীত নায়ক। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিনিকটে বর্তমান। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে নায়ক করিলে কল্পনার পক্ষকে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার গুরুভারে ভারাক্রান্ত করা হয়। তাই, তাস্‌সো বিষয় হিসাবে নির্বাচন করিলেন প্রথম ক্রুসেডের স্বল্প-পরিচিত ইতিহাস যাহার বর্ণনায় কবির কল্পনা পাইবে অবাধ স্বাধীনতা,

অথচ যাহাতে আলফন্সোর পূর্বপুরুষকে দেখানো যাইবে বর্তমানের অভীপ্সিত গুণাবলীর মূর্তিমান বিগ্রহের মতো।

ভার্জিলের অন্যতম শিষ্য মিল্টনও ছিলেন তরুণ বয়সে ক্রমওয়েল-এর উৎসাহী ভক্ত ও ইংলণ্ডে পিউরিটান কমনওয়েল্‌থ প্রতিষ্ঠানের অতন্দ্রিত প্রহরী। ক্রমওয়েলীয় কমনওয়েল্‌থ তাঁহার অন্তরে যে আশা ও উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল, ও তাহার ব্যর্থতায় রাজবংশের পুনরাগমনে জাগিয়াছিল যে ক্ষোভ ও হতাশা—প্যারাডাইস লষ্ট রচনায় ইহারাই ছিল কবির অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপাদান। এবং মিল্টন ইহাদেরই প্রক্ষেপণ করিয়াছিলেন স্বর্গমর্তানরকের পরিবেশে। মানবজাতির আদি-পিতার নৈতিক পতনের সহিত যুক্ত করিয়া তাহার মনোভাবকে দিয়াছেন বিশ্বব্যাপী সর্বজনীনতা। ঈনিয়াস যেমন রোম সাম্রাজ্যের, গফ্রেদো খ্রীষ্টীয় শিভালরি-র, অ্যাডাম সেইরূপ সমগ্র মানব-জাতির প্রতিনিধি বলিয়া কল্পিত। হোমেরীয় এপিকে কাহিনীকার গল্প বলিয়াই পরিতৃপ্ত, তাহার সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে কাহিনীর নাটকীয়ত্ব ও সৃষ্ট চরিত্রের অসামান্যতার উপর। নূতন এপিকের দায়িত্ব হইল ইহার সহিত কালোপযোগী শিক্ষার যোজনা করা। সে যোজনা স্পষ্ট হইয়া পড়িলে কবিত্বের হানি হয়। তাই লিখিত এপিকে প্রয়োজন হয় এমন অলংকরণের যাহাতে এই নীতিপ্রচার অরুচিকর না হয়। এইরূপ গোপনতায় কবিদের লজ্জার কিছুই নাই। তাস্‌সো লিখিতেছেন :

> যদি দেখি ছোট শিশু অসুখে পীড়িত,
> ঔষধের পাত্র-মুখে লাগাই মিষ্টতা
> যাহাতে লাঘব হয় স্বাদের তিক্ততা,
> বঞ্চনায় পানে, থাকে বঞ্চনে জীবিত।

এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় প্রকারের এপিকের ভিতরে ছিল একটি গভীর মিল—এপিক কাব্যে মনুষ্যচরিত্রের ক্ষুদ্রতার কোনো স্থান নাই, জীবনের বীরোচিত উন্নততর হর্ষ ও শোক, জয় ও পরাজয় প্রদর্শন করাই এপিক কবির মূল প্রেরণা। মধুসূদনের জীবনীপাঠে জানা যায় তাস্‌সো ও মিল্টনকে তিনি কি গভীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। উচ্চাশী কবি তিনি, তাঁহার ধারণা ছিল কবিত্বে তাস্‌সোর সহিত প্রতিযোগিতা যদি বা সম্ভব হয়, মিল্টনের কবিতা স্বর্গীয়, নরলোকে তুলনা-রহিত। বনভূমির নিস্তব্ধ নির্জনতায় সিংহের গভীর গর্জনের সহিতই তুলনীয় ছিল, মধুসূদনের মতে, মিল্টনের কবিকণ্ঠ।

৭

মিল্টনেরও কয়েক শতাব্দী পরে মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলাদেশের কাব্যক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে ইতিহাস ধাবিত হইয়াছে দ্রুততর বেগে, ধনবাদ আপন বিস্তারের তাগিদে হইয়া উঠিয়াছে, গার্গান্তুয়া-র মতো, স্ফীতকায় ও উদর-পরায়ণ, উৎপাদক দেশের সীমানায় আর তাহাকে আঁটিয়া রাখা যায় না। চাই তাহার অবাধ বাণিজ্য ও অন্তহীন উদ্বৃত্ত-মূল্য ও তাহারই সংরক্ষণে চাই পরদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা। একদিন যাহার কণ্ঠে ছিল মুক্তির উদাত্ত আহ্বান, হস্তে ছিল ন্যায়ের শাণিত খড়্গ, এখন তাহার বাণী হইল শাসনবিধি, হস্তে উঠিল রাজদণ্ড। ক্রমওয়েল-এর পর হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধির ইতিহাস। পলাশীর বিজয়ই তাহাকে সুযোগ দিল মর্যাদাহীন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইবার। ভারতের ভূমিতে ব্রিটিশ ধনিক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উদ্ভব হইল এক জটিল পরিস্থিতির। একদিকে তাহা জাগাইয়া তুলিল দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার অচলায়তন হইতে মুক্তি পাইয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে বিচরণ করিবার কামনা, ফরাসী বিপ্লবের ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণীও এদেশের তটে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল ; অন্যদিকে চাপিয়া বসিল বিদেশী শাসন ও শোষণ, ভারতের অন্তরাত্মা যেন দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বন্দী। এই পরিস্থিতিকে যে কবি কাব্যরূপ দিবে তাহার পক্ষে একটি সুস্থ সবল অখণ্ডিত মনোভাবকে আত্মস্থ করা অসম্ভব। বাস্তব পরিবেশের খণ্ডিত অবস্থা তাহার সংবেদনশীল চিত্তকে খণ্ডিত না করিয়া পারে না। মধুসূদনের সমসাময়িক সমাজে তাই একদিকে ছিল উল্লাস—জাতিভেদ, বর্ণভেদ, নরনারীর অধিকারের বিভেদ প্রভৃতি চিরাচরিত অনাচারের শাসন হইতে মুক্তির উৎফুল্ল প্রত্যাশা ; অন্যদিকে বিদেশী শাসকের ঔদ্ধত্য, নির্মম হৃদয়হীনতা, নির্লজ্জ পক্ষ-পাতিত্ব প্রভৃতিতে জাতীয় আত্মসম্মানে প্রচণ্ড পদাঘাত। যে ইংরেজ কলেজে পড়ায় বাইরণ ও মিল্টন, সেই ইংরেজ সামাজিক জীবনে বাঁচাইয়া চলে 'বাবু'দের ছোঁয়াচ। দেশের শাসনযন্ত্রে শাসিতের নাই বিন্দুমাত্র অধিকার, জীবনের উন্নতির পথে প্রতিভার নাই কোনো স্বীকৃতি। সে যুগের শিক্ষিত বাঙালী বুর্জোয়া সংস্কৃতির আস্বাদনে মনোজগতে পায় বিস্তার আর বস্তুজগতে পায় বন্ধনরজ্জু। তাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ঘোষণা করেন,

'গাইব মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত ;

যদিও তিনি অন্তরের অন্তরে জানেন যে ইহা প্রকৃতপক্ষে বীররসাত্মক হইতে

পারে না। তাই তিনি তাঁহার বন্ধুকে পত্রযোগে জানাইতে কুণ্ঠিত নহেন, "ভয় পেয়ো না বন্ধু, আমার পাঠককে আমি বীররস দিয়ে বিরক্ত করবো না।" এহেন যুগাবস্থায় ইউরোপীয় মহাকাব্যের সম্পূর্ণতা অর্জন করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এ-বোধ মধুসূদনের ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদবধ'-কে এপিক না বলিয়া বলিতেন "ক্ষুদে এপিক"; এবং ইহার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও স্থির করিয়াছিলেন তিনি আর কখনো এপিক লেখার চেষ্টাও করিবেন না: অনেক দরদী পাঠক, অনেক কৃতী সমালোচক, 'মেঘনাদ-বধ' পড়িয়া যে অতৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন ঘটনাগ্রন্থনে ও চরিত্রচিত্রণে কবির দ্বিধাগ্রস্তভাব দেখিয়া, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কবিচিত্তের অস্থিরতায় বা কল্পনাশক্তির দারিদ্র্যে নয়; তাহা পাওয়া যায় বিদেশী শাসকের অনুকম্পায় ফিউডাল ভারতের ঘনঘোর অন্ধকারে বুর্জোয়া চেতনার স্তিমিত দীপশিখার প্রথম প্রজ্বলনের অনিশ্চিত শিহরণে। ভারতে নবাগত বুর্জোয়া-চেতনার অবস্থা তখন নবজাত শিশুর মতো, 'মেঘনাদবধ' তাহার প্রথম সবল চীৎকারধ্বনি। তাহার অসহায় পরনির্ভরতার মধ্যেও তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে ইউরোপীয় নবজন্মের অদম্য আকৃতি।

৮.

"সাহিত্যসৃষ্টি" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সাহিত্যে কেবল ভালোমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ দেখিবার আগ্রহ জন্মে।" তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, "আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটি খামখেয়ালী ব্যাপার নহে। ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন।" বলা বাহুল্য, এই মূল্যবান্ অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথেরও অর্জন করিতে হইয়াছিল বহুসাধনায়; তরুণ বয়সে 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে তিনি যে উগ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার উগ্রতা সত্ত্বেও তাহাতে তীক্ষ্ণ সাহিত্যরুচির অবিসংবাদিত সাক্ষ্য ছিল। কিন্তু ছিল না তাহাতে এই পরিণত বিচারবুদ্ধি। কেবল রুচির উপর নির্ভর করিয়াই যে প্রকৃষ্ট সমালোচনা লেখা যায় না, উল্লিখিত উগ্র প্রবন্ধটি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। বিচার-বুদ্ধি বাড়িবার ফলে তিনি ইহাকে অকুণ্ঠভাবে প্রত্যাহার করেন—সাহিত্যিক সততার এই উদাহরণও আমাদের পক্ষে অবিস্মরণীয়। মেঘনাদ-বধের বৃহৎ ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে তাঁহার সুনিশ্চিত অভিমত পাওয়া যাইবে উক্ত 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধেই।

"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্ম-নিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোনো-কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এত-দিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র-আত্মীয় স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়া কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি-সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।"

কাব্য হিসাবে 'মেঘনাদবধে'র মর্মকথা ইহা অপেক্ষা সুন্দর করিয়া বলা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। 'মেঘনাদবধের'র মূল দ্বন্দ্ব যে ধর্মভীরুতার সহিত ধর্ম-বিরোধিতার, রবীন্দ্রনাথ তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। রাবণ ধর্মদ্রোহী বলিয়াই মধুসূদনের মতে চমৎকার লোক, গ্র্যাণ্ড ফেলো; রাম ও তাহার চেলা চামুণ্ডাদের তিনি ঘৃণা করিতেন, অন্য কোনো দোষে নহে, কেবল তাহারা দেবতাদের মুখাপেক্ষী ছিল বলিয়া। দেবতারাই যে ফিউডাল

সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনাপুষ্ট প্রতিনিধি। বস্তুবাদী সমালোচকের দৃষ্টিতে এই বিরোধ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেরই ফল। ফিউডলবাদের সহিত বুর্জোয়াবাদের সংঘাত বাধিলেই শুরু হয় এই বিরোধিতা। মার্কসবাদের মতে, ধর্মের সমালোচনাই সকল সমালোচনার আদি উৎস। আবার, মধুসূদনের পক্ষে রাম-বিদ্বেষী হওয়ার অর্থ ব্যক্তিগত হিন্দুধর্মবিদ্বেষ বোঝায় না। হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তবে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডে যাইবার প্রলোভনের কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, খ্রীষ্টধর্মকে তিনি ভাবিতেন সভ্যতার বাহক—সিভিলাইজিং এজেন্সি। এই নূতন সভ্যতার আলোকে তিনি হিন্দু পুরাণের দেবদেবীদের একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া দেখিলেন নূতন চোখে রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় চিত্রকরেরা ও ভাস্করেরা যেমন দেখিতেন খ্রীষ্টান ধর্মের কাহিনীগুলিকে। ধর্মের আচ্ছাদনে ঐহিকতার প্রকাশে তাঁহারা ছিলেন অগ্রণী। হিন্দু পুরাণের প্রধান চরিত্রেরা তাই মধুসূদনের দৃষ্টিতে তখনকার সামাজিক জীবনের নানাশক্তির আধার বলিয়া প্রতিভাত হইল। রাবণের রাজধানী সৌধকিরীটিনী লঙ্কা ছিল তাঁহার কল্পনায় বুর্জোয়া সভ্যতার কেন্দ্র, রাম পরিচালিত ফিউডালশক্তি যাহাকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে চাহিতেছে। পরাধীন দেশের কবি হিসাবে এই আক্রান্ত দেশের প্রতিটি চরিত্রের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত মমতা। অপরদিকে রামের পক্ষের কাহারো প্রতি তিনি সুবিচার করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার যে টান ছিল না তাহা নহে, কিন্তু কেবল রামের অনুজ বলিয়াই সংকট মুহূর্তে তাহাকে হীনচিত্ত করিয়া আঁকিতে তাঁহার বাধে নাই। বিভীষণ তো দস্তরমতো বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের কালে দেশাত্মবোধ বাংলাদেশের চেতনায় ছিল না ; ছিল কেবল ধর্মে অনুরক্তি ও পারিবারিক বাধ্যবাধকতা। দেশাত্মবোধ একান্তভাবে বুর্জোয়া চেতনার ফল, যাহা মধুসূদনের যুগে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ যে কবির প্রিয় চরিত্র ও তাঁহার কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাহার কারণ, একমাত্র তাহার চরিত্রই বিশুদ্ধ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। রাবণ পিতা হইলেও রাষ্ট্রাধিপতি, সুতরাং তাঁহার পাপপুণ্য ইন্দ্রজিতের বিচার্য নহে। এই সম্বন্ধ পিতাকে পরমং তপঃ বলিয়া ভাবা নয়। দেশ যখন শত্রুবেষ্টিত তখন রাষ্ট্রনায়কের নির্দেশ তর্কাতীত, এই নূতন মূল্যবোধ তাহার চরিত্রে সমুজ্জল। প্রমীলার সহিত তাহার সম্বন্ধও ফিউডাল যুগের স্বামী-স্ত্রীর মতো নহে, রামসীতার মতো নহে। সীতা পতিপরায়ণতার আদর্শ নারী,

পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে। সীতা রামের সহধর্মিণী কিন্তু সহকর্মিণী নহেন। মেঘনাদ ও প্রমীলা, উভয়ের যোগ বিবাহের যোগের চেয়ে অনেক গভীর। এ যোগের মূলে আছে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ পরস্পরের উপযোগিতায়; বীরের পত্নী বীর নারী। নারী হইয়া স্বাধীনা, মুক্তগতি, শৌর্যশালিনী, এ চিত্র বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম রূপায়িত হইল। এই জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ পাঠকের মতে 'মেঘনাদবধে'র তৃতীয় সর্গই তাহার শ্রেষ্ঠ অংশ, কবির কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মেঘনাদের সহকর্মিণী ভাবিয়া কল্পনা করিয়াও মধুসূদন প্রমীলাকে পূর্ণরূপে পারিবারিক বন্ধনমুক্ত করিয়া আঁকিতে সাহস পান নাই, তাহাকে স্বামীর সহগামিনী করিয়া রণক্ষেত্রে আনিতে পারেন নাই। ফিউডাল যুগের টান তাঁহাকে অতদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। প্রমীলা-চরিত্রকে জীবন্ত ও যথার্থ করিবার মতো নারীর অস্তিত্বও তখনকার বাঙালী সমাজে সম্ভব ছিল না। তবুও বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী যুগে স্বাধীনা নারী-চরিত্রের সৃষ্টিতে প্রমীলাই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শিকা। মেঘনাদ পুরুষ বলিয়া তাহার চিত্রণে মধুসূদনকে এ বাধা বোধ করিতে হয় নাই। আগামীকালে দেশের মুক্তিযুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ বাঙালী যুবকের আত্মাহুতির প্রথম সার্থকচিত্র এই মেঘনাদে। মেঘনাদের মৃত্যুতে যাহাকে অপমৃত্যুও বলা চলে, তাই মধুসূদনের হইয়াছিল সহনাতীত শোক; এই প্রসঙ্গ রচনার সময় তিনি প্রকৃতপক্ষে শারীরিকভাবেও অসুস্থ হইয়া পড়েন। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের শোক অপেক্ষা তাঁহার শোক ছিল মহত্তর। রাবণের শোক বীরপুত্রের অকালমৃত্যুতে পিতার শোক; মধুসূদনের শোক, অতীতের ঐতিহ্যের নিকট ভবিষ্যতের আদর্শের হত্যা। আর একটি পার্শ্বচরিত্রে মধুসূদন বাল্মীকির বর্ণনা হইতে সরিয়া আসিয়া অতি অল্পকথায় নূতন চেতনাকে রূপায়িত করিয়াছেন। জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ রামায়ণের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কিন্তু বাল্মীকিতে দেখা যায়, অপহৃতা সীতা রাবণের রথ হইতে দূরে জটায়ুকে দেখিয়া শ্বশুরকুলের বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারেন ও চীৎকার করিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন। এক্ষেত্রে জটায়ুর বীরত্বে সেই পুরাতন পারিবারিক সম্বন্ধের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 'মেঘনাদবধে' দেখি সীতা সরমাকে বলিতেছেন :

> কতক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
> ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল

বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে !
দেখিনু, মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মুরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ। 'চিনি তোরে' কহিলা গম্ভীরে
বীরবর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন কুলবধূ আজি হরিলি দুর্মতি ?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ ? এই তোর নিত্য কর্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণ শরে ! আয় মূঢ়মতি !
ধিক তোরে রক্ষোরাজ ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে ?'

জটায়ুর এই হ্রস্ব উক্তিটিতে নির্বাসের মতো ঘনীভূত হইয়া আছে ইউরোপীয় শিভাল্‌রির নিঃস্বার্থ বীরত্বের উচ্চ আদর্শ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণপাত করা, কোনোরূপ দৈবী আদেশ বা পারিবারিক মর্যাদাবোধ হইতে নহে। সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে এই একটিবার রাবণ চিত্রিত হইয়াছে এ ব্রহ্মমণ্ডলে অদ্বিতীয় নির্লজ্জ পামর রূপে। সীতা হরণে রাবণের দায়িত্বের উল্লেখ মধুসূদন সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা এ প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁহার পুত্রশোকে রাবণের প্রবোধ দিবার অবাস্তব প্রচেষ্টাকে তীক্ষ্ণ প্রতিঘাত করিবার প্ররোচনায়।

কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !

কিন্তু বীরবাহুর জননী এই বলিয়া আর কিছু না করিয়া "কাঁদি, সঙ্গে সখী-দলে লয়ে, প্রবেশিলা অন্তঃপুরে।" এবং কবির পক্ষে ও রাবণের পক্ষে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এইখানে চাপা পড়িয়া গেল।

৯.

বস্তুতঃ রাবণের চরিত্রই মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্বলতা। স্বয়ং কবি ইহার সম্বন্ধে মন ঠিক করিতে পারেন নাই বলিয়া এই কাব্যে গোড়া হইতে

পর্যন্ত একটি স্বতঃবিরোধিতা থাকিয়া গিয়াছে যাহা পাঠাস্তে রসোপভোগে বাধা দেয়, একটি অখণ্ড অনুভূতিকে সমগ্রভাবে স্থায়ী হইতে দেয় না।

সীতাহরণ রামায়ণ কাহিনীর চরিত্রনিরূপক ঘটনা—ইহার সংশ্লেষেই নির্ধারিত হয় রাম বা রাবণের দোষ গুণ। বাল্মীকি হইতে কৃত্তিবাস পর্যন্ত এই সংশ্লেষ নানাভাবে বিবর্তিত হইয়াছে। মহাপণ্ডিত য়াকোবী-র মতে রামায়ণ কাহিনীর আদিরূপ পাওয়া যায় "দশরথ-জাতকে"। এইক্ষেত্রে তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। কারণ তাহাতে না আছে সীতাহরণ, না আছে হনুমান, না আছে রাবণ। সেখানে বিবাহিত সহোদর-সহোদরা—ইজিপ্টের প্টলেমি বংশীয়দের মতো। এইরূপ বিবাহ যখন লোকচক্ষে হেয় হইয়া ওঠে, তখনই সীতার জন্মবৃত্তান্তে আরোপ করা হয় অলৌকিকতা। রাজা জনকের লাঙলের ফলায় মাটি হইতে সীতাদেবীর আবির্ভাবের ইহাই নাকি, য়াকোবী-র মতে, ঐতিহাসিক রহস্য। বাল্মীকির রাম, রবীন্দ্রনাথের মতে, গার্হস্থ্য-প্রধান হিন্দু সমাজের যত কিছু ধর্ম আছে তাহারই অবতার। রাম যে রাবণকে মারিয়াছিলেন সে কেবল ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য। অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেও কেবল প্রজারঞ্জনের অনুরোধে। আর কৃত্তিবাসের রাম রবীন্দ্রনাথের মতে, ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল।

'মেঘনাদবধে' রাম-রাবণের সম্বন্ধ অনেক বেশি জটিল, নূতন সমাজচেতনার প্রভাবে। ফিউডালবাদের প্রতিনিধি রাম কবির চক্ষে হেয়, আর বুর্জোয়াবাদের প্রতিনিধি রাক্ষস রাবণ তাহার প্রেয়। কবির অভিপ্রায় অনুসারে কাহিনী রচিত হইলে রাবণের হইত জয় ও রামের পরাজয়। এই ধরনের কাহিনীকে তিনি খুঁজিয়া পাইলে খুশি হইতেন ও তাঁহার কবিত্বের আবেগকে বিনা দ্বিধায় বীররসে আপ্লুত করিতে পারিতেন। তাঁহার দুঃখ এই যে এমন বিষয় তিনি না পাওয়ায়, যাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সেই রাক্ষসদের গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাঁহার কল্পনার উদ্দীপক হিসাবে। মেঘনাদবধ রচনার অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় মহরম-এর কোলাহলের পর তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে পত্রযোগে জানাইতেছেন :

"ভারতে মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন বৃহৎ কবির উদ্ভব হইত, হাসান ও তাহার ভ্রাতার মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া কি বিরাট এপিক লেখাই না তাহার

পক্ষে সম্ভব ছিল। সমস্ত জাতির অনুভূতিকে সে নিজের পক্ষে টানিতে পারিত। আমাদের এমন কোন বিষয় নাই।"

মধুসূদনের বিপদই ছিল এইখানে। তিনি জানিতেন তাঁহার প্রিয় রাবণের পক্ষে সমগ্র জাতি নাই। সীতার দুঃখে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয় কিন্তু তাহার জন্ম লঙ্কাধিপতি রাবণকে সরাসরি দায়ী করিলে মেঘনাদবধ রচনায় যে নিগূঢ় সামাজিক উদ্দেশ্য তাঁহার কল্পনাকে পরিচালিত করিতেছিল তাহার কার্যকারিতা ব্যর্থ হয়। অথচ রামায়ণের গল্পকে অবলম্বন করিয়া তাহার মূল প্রতিপাদ্যকে একেবারে অবহেলা করা চলে না; রাবণকে তাহার কৃত পাপের ফলভোগী হইতেই হয়। এই উভয় সংকটে পড়িয়া কবি তাঁহার কল্পিত রাবণের বিরাট সম্ভাবনাকে খর্ব করিয়া তাহাকে নিয়তির ক্রীড়নকে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যাহা তাঁহার বুর্জোয়া-চেতনার সহিত একান্ত অসঙ্গত। প্রাক্-বুর্জোয়া যুগের মহাকবি হোমরের প্রভাব এই প্রসঙ্গেই বেশি ফুটিয়াছে। অথচ হোমরের যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ—আকিলেস, ওদিসেয়ুস, দিউমেদ প্রভৃতির মতো শক্তিমান্ চরিত্রও তাঁহার প্রিয় রাক্ষসদের মধ্যেও তিনি আঁকিতে পারেন নাই। বেশির ভাগ স্থানেই রাবণকে দেখানো হইয়াছে পুত্রশোকাতুর পিতার ভূমিকায়। হেক্টর-এর মৃত্যুতে প্রিয়াম-এর শোকের সহিত ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণের শোকের তুলনাও সঙ্গত নহে। দুই কবির উদ্দেশ্য বিভিন্ন। ট্রয়বাসী বীরগণের শোকের গভীরতা দিয়া হোমর দেখাইতে চাহিয়াছেন গ্রীক-বীরগণের শৌর্যের পরাকাষ্ঠা। মধুসূদনের উদ্দেশ্য ঠিক তাহার বিপরীত, রাবণের শোকের মহত্ত্বে রামের বিজয়গর্বকে খর্ব করা। অথচ কোন্ হিসাবে রাবণ রামের চেয়ে বেশি সমাদরের পাত্র তাহা এই কাব্যে কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলা নাই। রাবণের পুত্রস্নেহের চেয়ে রামের ভ্রাতৃস্নেহ কোন্ অংশে কম নহে। যাহার জন্ম ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এত আয়োজন সেই সীতাকেও মধুসূদনের রাম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত—নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। বুর্জোয়াবাদের সহিত ফিউডালবাদের সংঘর্ষের কাহিনীতে বুর্জোয়াবাদের বিজয়ে যাহা হইতে পারিত বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী এক বিরাট এপিক, তাহা হইয়া দাঁড়াইল দুইটি ফিউডালবাদী পরিবারের অকারণ কলহের চিত্র, যাহাকে মধুসূদন বলিয়াছেন এপিক্‌লিং। যাহা হইতে পারিত ঘটনাবহুল তাহা হইয়া রহিল বর্ণনাবহুল। বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যে তীক্ষ্ণ তরবারি উত্থিত হইয়াছিল ইউরোপীয় স্বাধীনদেশগুলির সামাজিক সমুদ্রমন্থনে, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহার দ্যুতি আচ্ছাদিত গরিমায় প্রকাশ পাইয়া নিমজ্জিত

হইল এক স্নেহপ্রবণ দুর্বৃত্তের শোকাশ্রু-সাগরে। পরাধীন দেশের প্রতিকূল পরিবেশে মধুসূদনের বিপ্লবী কবিপ্রতিভা অস্তমিত হইল এই করুণ পরিণতিতে।

১০.

তবুও তিনি চিরকাল পূজিত হইবেন নবচেতনার কবি বলিয়া। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার সৃষ্টিতে নূতন বাঙালীকে তিনিই দিয়াছেন নূতন রসের অমৃতাস্বাদ। জাতীয় জীবনে উন্মাদনার যুগ শেষ হওয়ায় তাঁহার কবিতার প্রভাব পরিমিত হইয়া আসিলেও চিরদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন 'কবির কবি' রূপে। তাঁহার প্রভাবকে বাদ দিয়া বাংলা ভাষায় উচ্চসাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার ঐতিহাসিক স্থান ইংরেজী-সাহিত্যে মার্লোর অনুরূপ; সুইন্‌বার্ন-এর বিচারে মার্লোই প্রথম ইংরেজী কবিতাকে আকাশগামী করিতে পারিলেন, তিনি প্রথম আনিয়া দিলেন সেই নূতন বিশালতা, যাহাকে বলা যায় সাব্‌লিমিটি। সমস্ত ইংরেজ কবিগণের মধ্যে তিনিই প্রথম পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। তাই দেখি, চরিত্রচিত্রণে ও সমাজচেতনায় বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের অনুগামী, তাঁহাদের প্রকৃতিতে অবশ্য ছিল পার্থক্য, যেমন মার্লোর ছিল তাহার অনুগামী শেক্সপীয়রের সহিত। মার্লোর প্রবর্তিত ব্ল্যাঙ্কভার্স—বেন জনসন যাহাকে আখ্যা দিয়াছিলেন 'মাইটি লাইন'—তাহাই যে শেক্সপীয়র, মিল্টন, এমন কি টেনিসনেরও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের মূলসূত্র, ইহা সমালোচকমহলে স্বীকৃত। আধুনিক বাংলা পয়ারছন্দের যে বিচিত্র ইন্দ্রজাল, বলা চলে না কি যে মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দই তাহার মূল প্রস্রবণ? মার্লো একাধারে পণ্ডিত ও কবি। তাঁহার কবিত্বের আবেগ ও পাণ্ডিত্যের স্পৃহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ, তাঁহার কবিত্বের সবচেয়ে বেশি প্রকাশও সেইখানেই। মধুসূদনও ছিলেন তাঁহার যুগে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় কবি। কাব্যরচনায় তাঁহার অকুতোভয় উচ্চাদর্শ ও অনলস প্রস্তুতি, অনাগত যুগের কবিকুলের নিকট হইয়া থাকিবে অসীম বিস্ময়ের আধার। যে ফিউডালবাদের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে মধুসূদন হানিয়াছিলেন প্রথম সবল আঘাত, আজিও তাহাকে শেষ আঘাত হানা হয় নাই। যে বুর্জোয়া-বিপ্লবের তিনি ছিলেন প্রথম কবি আজিও তাহা অসমাপ্ত। সে বিপ্লবের একান্ত পরিসমাপ্তি সমাজবাদের সংস্থাপনে। এই অবশ্যকর্তব্য বিপ্লবের পথে অগ্রগমনে আগামীকালের কবিরা তাঁহার জ্যোতির্ময় প্রতিভায় পাইবে অবিনশ্বর অনুপ্রেরণা।

# সূর্য্যাবর্ত

## সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথ হ'ল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি তো আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানের সূত্রধার বটেই; এমনকি তাঁর বাণী-ব্যতিরেকে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ নেই। কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হ'লেও, কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়; এবং শিল্পের সর্ববিধ বিভাগেই তাঁর সিদ্ধি যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। সেইজন্যই স্বকীয় মনীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে যে-অভিনব রূপ দিয়েছেন, তার প্রতিভাসে কেবল সুধীসমাজই সমুজ্জ্বল নয়, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত; এবং তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ যদিও আজ আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ-সাহিত্যেরও মূলধন। অবশ্য মানুষের মর্ম্মানুসন্ধানে' বিদেশী পরকলাই সাম্প্রতিকদের একমাত্র সম্বল; কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনো নিশ্চয় রৈবিক উপক্রমণিকার নিয়ম মানে; এবং তাঁর শালীন মাত্রাজ্ঞান বর্ত্তমান প্রগতিবিলাসীদের চোখে অস্বাভাবিক ঠেকলেও, রবীন্দ্রনাথের উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদই ইদানীন্তন উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যপদেশ।

সুতরাং অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও, তাঁকেই গত পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় চিৎ-প্রকর্ষের পুরোধা বলা বিধেয়। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত অগ্রণীরা যে-সার্ব্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পান নি, সেই কল্পনাবিলাসকে এই পাণ্ডবর্জিত দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ; এবং আমরা সকলে যেহেতু সেই প্রবাহেরই বুদ্বুদ, তাই তার গতি-অগতির বিচার অথবা উপকার-অপকারের আলোচনা শুধু অশোভন নয়, দুষ্করও। কারণ আধিদৈবিক শ্রেয়োবোধ তো দূরের কথা, আধুনিক বিজ্ঞান বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তিতেও আস্থা খুইয়েছে; সমাজতত্ত্ব এখনো পুরোপুরি যন্ত্রবাদে না পৌঁছলেও, মানুষ মাত্রেই যে অভ্যাসের দাস, তাতে ভাবুকদের আর সন্দেহ

নেই; এবং তথাকথিত তুলামূল্য যেকালে অনুশীলনেরই নামান্তর, তখন আজকালকার বাংলায় জন্মে রবীন্দ্রপ্রতিভার যাচাই করা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতোই নিষ্ফল ও হাস্যকর।

তাহলেও রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত সংস্কৃতিধারার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ; এবং সম্প্রতি কেবল এক বাঙালী কবি তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের তুলনা করেছেন বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সে-সমীকরণ উপমা নয়, উৎপ্রেক্ষা। কারণ সাধারণত অপাঠ্য হ'লেও, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি অন্ততপক্ষে প্রাক্-মোগল যুগে; এবং প্রাদেশিকতার প্রকোপে এই অঞ্চল যদিও সর্বদাই আর্যাবর্তের বহির্ভূত থেকেছে, তবু অনার্য আর অসভ্য চির দিনই ভিন্নার্থবাচক। অতএব রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় প্রাণসামগ্রীর উৎপাদক বলতে আমার ইতিহাসবোধে বাধে; এবং যখন অলঙ্কার নির্মাণের তাগিদে আমিও তাঁর প্রতিরূপ খুঁজি, তখন আমার মানস চক্ষে গোমুখী গিরিরাজের চিরন্তন চিত্র ভেসে আসে না, ফুটে ওঠে কোনো কাল্পনিক শৈলশৃঙ্গের অবিচ্ছিন্ন ছবি, যা হয়তো নগাধিরাজের মতোই শাশ্বত ও সমুচ্চ, কিন্তু যার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমভূমির সম্পর্ক নিতান্ত আপতিক, গঙ্গাকে যে জটার জালে জড়িয়ে রাখে না, পায়ের আঘাতে নূতন পথে চালায়।

তত্রাচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ছিলেন একা আরিস্টটল-এর ভগবান। তিনি ছাড়া আর সকলেই পরজীবী; তাঁকে বাদ দিলে, অন্য কারো পক্ষেই নিছক আত্মচিন্তায় কালাতিপাত সম্ভব নয়। সেই জন্যেই পরিচ্ছিন্ন পাহাড়ের নীচেও পদাশ্রিত স্রোতস্বিনীর স্বেদবিন্দু জমে, প্রতিবেশী শস্পে তার সানুদেশে জড়ায় এবং যে-আধিদৈবিক উৎপাত আশ-পাশের সমতলে ধ্বংস ছড়ায়, তাতেই ঘটে তার বৃদ্ধি। অতএব যাঁরা ভাবেন যে বৈদিক কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব রসধারা অন্তঃসলিলা, তাঁদের অনুমান নির্ভুল, তেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে যাঁরা ওয়র্ড্‌সওয়র্থী চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব দেখেন, তাঁরাও মতিভ্রান্ত নন; এবং উভয় সিদ্ধান্তই শুধু আংশিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোনো পক্ষই তাঁর সমগ্র সত্তার সাক্ষাৎ পান নি।

তবে ব্যক্তিস্বরূপ যতই অসংযুক্ত হোক না কেন, তার সঙ্গে অতিমর্তের কোনো সম্বন্ধ নেই; এবং বৈবিক ব্যক্তিস্বরূপ যে-ধাতু সমূহে গঠিত, তার প্রত্যেকটাই যদিচ তন্মাত্র-পদবাচ্য, তবু উপাদানের গুণে তিনি আমাদের থেকে স্বতন্ত্র নন, পানের জোরেই তিনি সাধারণ ভঙ্গুরতা কাটিয়ে উঠেছেন।

ফলত আমাদের মতো কালস্রোতের বুদ্বুদও রবীন্দ্রনাথের মূল্যবিচারে একেবারে অপরেগ নয়, শুধু অনেকখানি প্রতিবন্ধ; এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা প্রাক্তন সাদৃশ্য তো আছেই, উপরন্তু দার্শনিকদের মতে ভাব ও অভাব যেহেতু একই সত্যের এ-দিক আর ও-দিক, তাই আমাদের স্বভাবে যা নেই, তা জানলেই, আমরা তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝবো।

বলাই বাহুল্য যে উপরন্তু উপমানশুরের সঙ্গে বৈদান্তিক নেতিবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। রহস্যঘনতা যেমন সকলের মতেই ব্যক্তিস্বরূপের প্রধান লক্ষণ, তেমনি সেই কৈবল্যই যে সকল স্বতোবিরোধের তীর্থসঙ্গম, এ-বিশ্বাসও অনেকের বিবেচনায় অন্যায়। সুতরাং ভণিতা বাদে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে প্রামাণ্য স্তাবক প্রাচ্য কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন বুঝেছিলেন; এবং এই আত্মনিষ্ঠাই তাঁকে জাতিচ্যুত ক'রে আন্তর্জাতিক লেখকমণ্ডলীতে স্থান দিয়েছিলো। অবশ্য উক্ত স্বাধিকারবোধ থাকলেই, মহাকবির মর্যাদা মেলে না; তার জন্যে আরো পাঁচটা গুণের সঙ্গে একটা নিরুপাধিক ঐশী ক্ষমতাও অপরিহার্য। তাছাড়া রাসীন্ থেকে ল্যাণ্ডর পর্যন্ত কাব্যরচয়িতাদের ধ্রুপদী উৎকর্ষে যার আস্থা আছে, তার কাছে পরোক্ষ অনুভূতি শুধু মহার্ঘ নয়, সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হয়তো প্রত্যক্ষকে এড়িয়েই চলে।

কিন্তু অতিবুদ্ধি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব'লেই, কূপমণ্ডুকের অনীহা প্রশংসনীয় নয়; এবং সঙ্গীতজ্ঞ না হওয়াতে আমি যদিও অবগত নই যে এই কীর্তনের জন্মভূমিতে রাগ-রাগিণীর শুচি বায়ু কতটা প্রবল, তবু আমাদের কাব্যপ্রচেষ্টা যে চিরকাল বর্ণাশ্রমের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে পথ চলেছে, তাতে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নেই। আসলে ভাষ্যপ্রণয়নই হিন্দুস্থানের সনাতন অভ্যাস; এবং দুরদৃষ্টবশত বেদ-বেদান্তের টীকা-টিপ্পনী আর আমাদের টানে না বটে, কিন্তু যুগধর্মের তাগিদেও নিজস্ব চোখ-কানের ব্যবহার আমরা আজ অবধি শিখি নি। তার অপ্রমাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও ওয়াটসনী মনোবিজ্ঞানে যাঁরা ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন, একবার ভারতবর্ষে বেড়িয়ে গেলে তাঁরা নিশ্চয়ই মত পরিবর্তন করতেন; এবং তার পরেও হয়তো প্রথা-প্রবণ মানুষকে কলের পুতুলের পর্যায়ে ফেলা চলতো না; কিন্তু বোঝা যেতো যে গুরুদীক্ষা সত্যই অঘটনসংঘটনপটীয়সী, অন্তত তার ফলে জীব ও জড়ের অদ্বৈত ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্য আর প্রথার মধ্যে ঐক্যের চেয়ে বৈষম্যই হয়তো বেশি;

এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তি যেমন জাতির নৈর্ব্যক্তিক সংস্কারে, তেমনি জাতীয় জীবনীশক্তির উৎস দেশ-কালাতিরিক্ত মনুষ্যধর্মে। কিন্তু নাৎসী মতবাদে আস্থা খুইয়েও জাতিরূপের উপলব্ধি যদি বা সম্ভবপর হয়, তবু অন্তত রোজর বেকন্-এর যুগ থেকে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎকারে দার্শনিক মাত্রেই বৈফল্য কুড়িয়েছেন। তাহলেও প্রত্যয় হিসাবে বিশ্বমানবের মূল্য প্রায় অপরিসীম; এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমানায় তার সাক্ষ্য না মিললেও, কার্যত স্বয়ং সোহংবাদী সুদ্ধ এই অনেকান্ত মানবজাতির স্বভাবগত সাম্যে নিঃসংশয়। সেই জন্যেই পাঁচ হাজার বৎসর ধ'রে নির্বিকার অধিকার ভেদে বেড়ে উঠেও আমরা এখনো ভাবি যে অনুরূপ অবস্থায় বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঘটে, এবং শিক্ষা ও প্রতিবন্ধকের তারতম্যেই বাঘে-ছাগলে এক ঘাটে জল খায় না।

এই কথাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে গতানুগতিক প্রথাই শ্রেণীসংঘর্ষের জনক ও প্রাদেশিকতার উদ্বোক্তা; এবং মানুষ যেখানে তার স্বতন্ত্র সত্তা ও সহজ প্রবৃত্তি, তার নিজস্ব স্বার্থ ও প্রাক্তন পুরুষকার সংঘসঙ্কীর্ণ সমাজের তত্ত্বাবধানে স'পে দেয়নি, সেখানে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল অলীক স্বপ্নমাত্র নয়, সেখানে সম্ভাব স্বাভাবিক ও শাসন অনাবশ্যক, সেখানে চিরাচার মৃত কিন্তু ঐতিহ্য প্ররোহী। কারণ ভূপঞ্জরবিদ্যার বিচারে মানুষের মধ্যে স্তরভেদ অবর্তমান; চামড়ার রঙে, ভাষার প্রয়োজনে, ভৌগোলিক তাগিদে আমরা আপাতত যত বিবাদই বাধাই না কেন, তবু আমাদের প্রত্যেকের উত্তরাধিকার এক ও অভিন্ন; এবং সেই বিশ্বস্ত ও বহু পরীক্ষিত অধিকর্মার উপরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভার চাপালে, আমাদের সংসারযাত্রাই শুধু অবাধে চলবে না, ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতও হয়তো নির্বিকল্পের নির্দেশে নির্দ্বন্দ্ব হবে। সম্ভবত সেই জন্যেই ব্যক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবের উদ্বোধন অসঙ্গত নয়, আবশ্যিক।

দুর্ভাগ্যবশত ভূতত্ত্ব নূতন বিজ্ঞান; এবং এ-দেশে সভ্য মানুষের বাস অন্তত পাঁচ হাজার বৎসর ধরে। উপরন্তু অন্যূন তিন হাজার বৎসর যাবৎ পরদেশী বিজেতা পরম্পরার পদান্তে প'ড়ে আদিম ভারতবর্ষ অনবরত স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখেছে। এ-অবস্থায়, এই রাজনৈতিক নিগ্রহের চাপে প্রস্তরিত প্রথার অপর্যাপ্তি কেবল প্রত্যাশিতই নয়, অনিবার্যও; এবং বাঙালী কবিকিশোরদের কাছে সত্যটা যতই অপ্রীতিকর ঠেকুক, তবু সাহিত্য যে কালে সমগ্র জীবনের ভগ্নাংশ মাত্র, তখন আমাদের মজ্জাগত জাড্য সাহিত্যেও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

যে-জাতি একদিন কোমর বেঁধে নিরুক্তের নির্দেশমতো একটা সাধু ভাষা বানিয়ে, অলঙ্কার শাস্ত্রের উদাহরণ হিসাবে এতগুলো বিরাট কাব্য লিখে গেছে, আধুনিক বাঙালী হয় তো তাদের বংশধর নয়; কিন্তু বাংলা ভাষা সেই সংস্কৃতেরই উপজীবী, এবং খ্রীষ্টপূর্ব সংস্কৃত কবিদের মতোই বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যিকদের উপজীব্যও উদ্বৃত্ত।

হয়তো সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এতবড় লেখকের এতদিনকার সহযোগকে আমরা যথেষ্ট উপকারে লাগাতে পারি নি, তাঁর স্বাবলম্বনের দিকে না তাকিয়ে বাঙালী শুধু তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকরণে অসংখ্য সাদা কাগজ অজস্র কালির আঁচড়ে ভরেছে। তাই "মানসী"র অপূর্বতা আর দৈনন্দিন পাঠকের নজরে পড়ে না, "গীতাঞ্জলি"র অতুল ঐশ্বর্য আজ আটপৌরে আসবাব-পত্রের সামিল হয়েছে, এবং সম্প্রতি সম্ভবত "বলাকা"র পুনরাবৃত্তিতে খ'কে গিয়ে আমাদের প্রত্যেকেই বৈবিক গন্ধ কবিতার মক্সয় হাত পাকাচ্ছে। অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যের সৌরমণ্ডলে উল্কাপাত অসম্ভব; এবং আমাদের গৃহপতিদের গতিবিধির চর্চা আমরা এতদিন ধ'রে করেছি যে তাঁদের প্রত্যেক বিকিরণ আমাদের নখদর্পণে, প্রত্যেক অপচার প্রত্যাশিত। অধিকন্তু এ বৈধতা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্ন নয়, আমাদের অর্বাচীন সাহিত্যও নিয়মাধীন। এ-দেশের কবিযশঃপ্রার্থীরা যে গুণের জোরে নাম কেনেন, তারই অভ্যাসে তাঁদের সারা জীবন কাটে; কাব্য যে রসবৈচিত্র্য ব্যতীত বাঁচে না, তা বোধ হয় তাঁদের অবিদিত।

অথচ বাঙালী নিজেকে কলালক্ষ্মীর বরপুত্র ব'লে মনে করে। সে ভাবে যে তার কাছে রূপ যেহেতু রৌপ্যের চেয়ে মহার্ঘ্য, তাই সরকারী পরীক্ষাগুলোয় মান্দ্রাজীর সাফল্য তাকে টলাতে পারে না, স্বদেশী বাণিজ্যে মারোয়াড়ীর একাধিপত্য সে নীরবে সয়। কিন্তু আত্মপ্রসাদ প্রায় সর্বত্রই অহৈতুকী; এবং বাংলা অভিধানে যদি বৈদগ্ধ্য আর ভাবালুতা সমার্থবাচক না হয়, তবে আমাদের রসজ্ঞান নিশ্চয়ই কিংবদন্তীমাত্র। আমরা অন্তত পাঁচ শ বছর থেকে কবিতা লিখছি; কিন্তু জন তিন-চার সর্ববাদিসম্মত মহাকবির রচনা বাদ দিলে, আমাদের ভাণ্ডারে যা বাকী থাকে, তাতে সাহিত্যামোদীর লোভ ততটা নেই, যতটা লাভ মসলা বিক্রেতার।

আধুনিক বাঙালীর কথা জানি না; কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, শিবের গান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি যাদের কলমে বেরিয়েছিলো, কল্পনা তো তাদের ছিলোই

না, উদ্ভাবনার প্রয়াসও তারা কোন দিন পায় নি; পূর্ববর্তীর অনুলাপ পরবর্তী পুনরুক্তির উপাদান জুগিয়েছে। ফলে আমাদের অধ্যাত্মকবিতায় আত্মসমর্পণ বা অমৃত পিপাসা নেই, আছে কেবল কুসংস্কার ও নির্বন্ধাতিশয্য; আমাদের প্রেমগাথায় স্বর্গ-নরকের দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু নির্লজ্জ নাগরালি; আমাদের নিসর্গকাব্যে প্রকৃতির পরিচয় নেই, আছে মাত্র বারমাস্যার বাগ্‌বাহুল্য। এই গেলো বাংলার কবিকাহিনী; এবং সাহিত্যে ব্যবসায়িক টান-জোগানের বিধান খাটলে, মানতেই হবে যে প্রতিধ্বনিপ্রীতি বাঙালী পাঠকেরও মজ্জাগত: হয়তো সেই জন্যেই আমাদের বাইরণ-বিলাসী অগ্রজেরা নবীনচন্দ্রকে মহাকবি বলতে দ্বিধা করেন নি, এবং আমাদের রবীন্দ্র প্রভাবিত সমসাময়িকেরা সাহিত্যের সীমা সম্বন্ধে অতটা উন্মুখর।

বরঞ্চ রবীন্দ্র প্রতিভার ঐকান্তিক মহত্ত্বে আধুনিক লেখকের আস্থা আধুনিক পাঠকের চেয়ে বেশি, এবং সাহিত্যের মাত্রা না মানলেও, আত্মশক্তির পরিমিতি সকল স্রষ্টাই হাড়ে হাড়ে বোঝেন। ফলে আমাদের কাব্য-রচয়িতারা কাব্যবিবেচকদের মতো কালাতীতের উপাসক নন; তাঁদের যেহেতু ইতিহাস-জ্ঞান আছে, তাই তাঁরা জানেন যে বাইরণ-এর মতো গৌণ কবির অনুকরণই যখন অত শক্ত, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো মুখ্য কবির পদানুসরণ একেবারে অনর্থক। সেই জন্যেই প্রচলিত ঠাটে মানসীমূর্তির পুনর্নির্মাণ তাঁদের অনভিপ্রেত। সেই জন্যেই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস প্রযুক্ত আত্মবিজ্ঞাপনে, আত্মনিবেদনে নয়।

পক্ষান্তরে সাহিত্যের মাত্রা যদিও অনিশ্চিত, তবু তার ধর্ম সুবিদিত; এবং স্বতঃসিদ্ধি গণিতের ভিত্তি হলেও, শিল্পসৃষ্টির পটভূমি পরিণামী চিৎপ্রকর্ষ। অতএব কবির পক্ষে রোমন্থন যত না গর্হিত, স্বয়ম্ভূতি ততোধিক অভাবনীয়, এবং মার্লো-র সঙ্গে শেক্স্‌পীয়র যেমন কার্য-কারণ-শৃঙ্খলে গ্রথিত, মাইকেলের পরে রবীন্দ্রনাথের জন্মও তেমনি আবশ্যিক। কিন্তু আমাদের তথাকথিত তরুণ-সম্প্রদায় এই আর্য সত্যটাকে কাজে স্বীকার করলেও, কথায় আমল দেন না। এবং তাঁদের রচনারীতি রাবীন্দ্রিক বলরোলে অনুরণিত বটে, তাঁদের মনোভাবে তথাচ অধমর্ণোচিত বিনয় নেই। অবশ্য তাই ব'লে তাঁরা নিন্দনীয় নন; এখানেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই অনুকারী। বরং এ-বিষয়ে তাঁদের মৌনিতা তাঁর চেয়ে বেশি শোভন; কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এখন সাধারণের সম্পত্তি, আমাদের মাতৃভাষার আজ আর কোনো পৃথক সত্তা নেই; এবং সেই

জন্যেই আমরা তাঁর সম্মোহ কাটাবার প্রয়াস পেলেও, আত্মরক্ষার উপায় জানি না। তবু সামর্থ্য না থাকলেও, ইচ্ছার যে অন্ত নেই, এইটাই বর্তমানে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা।

কেননা ঐতিহ্য ব্যতিরেকে সাহিত্যসেবা সম্ভব হোক বা না হোক, নির্বিকার ঐতিহ্য শুধু চিরাচারের নামান্তর, যার পাষাণপুরীতে কারুকর্মীই সমাদৃত, রূপকারের যাতায়াত নেই। সুতরাং সম্প্রতিবাদের বিদ্রোহ সর্বতঃ কাম্য; তার মধ্যে বিপ্লবের পরিমাণ নগণ্য বটে, কিন্তু তার বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য; এবং আধুনিকেরা যদিও প্রায়ই ভুলে যান যে ব্যক্তিস্বরূপের অভাব কোনোদিনই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আস্ফালনে ঢাকা পড়ে না, তবু উত্তররৈবিক ছায়ানুবর্তিতায় কাকজ্যোৎস্না জাগিয়েছেন তাঁরাই, আমাদের নিরিন্দ্রিয় নিরুদ্দেশযাত্রা শেষ হয়েছে তাঁদেরই নির্দেশে। তাই শুধু সাধনার বিচারে আমাদের নূতন লেখকদের আমি অত্যাধুনিক ইংরেজ কবি অডেন্ বা স্পেণ্ডর বা ডে লুইস্-এর সমপাংক্তেয় মনে করি; এবং সিদ্ধিতে, অর্থাৎ লোকমতে, এই বিদেশীরা আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে থাকলেও, সেজন্যে হয়তো ভারতের ভাগ্যবিধাতাই দায়ী। হয়তো প্রতিষ্ঠা পশ্চিমে সুকর; হয়তো সেখানকার আত্মনিষ্ঠ সমাজ স্বকীয়তার মূল্য দিতে জানে; হয়তো ইংরেজী সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ ফল্গুর মতো প্রেততর্পণের মরুতীর্থ নয় ব'লে, উর্বরতা সেখানে উৎসের চার পাশেই ধরা পড়ে না, নদী সংলগ্ন শ্মশানও সে-দেশে শ্যামল।

তাই ব'লেই কেন্দ্রাপসারণ আর সংস্কারমুক্তি এক নয়; এবং প্রকৃত কবিমাত্রেই যদিও প্রথম প্রকরণে অভ্যস্ত, তবু দ্বিতীয় অবস্থার অধিকারী শুধু তথাগতেরা। এ-কথা বাঙালী কবিরাও জানেন; এবং সেইজন্যে তাঁরা পুনর্বাদেরই প্রতিকূল, অনাসৃষ্টির চেষ্টায় বদ্ধপরিকর নন। উপরন্তু সে প্রয়াসের কোনো অর্থ নেই; এবং আমাদের বস্তুজ্ঞান তো সাধারণ্যের অন্তর্গত বটেই, এমনকি আমাদের ভাষাও সার্বজনীন, তার মারফতে আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি স্বতই অসম্ভব। তবে কবিরা অন্যদের চেয়ে আত্মচেতন; এবং নিজ গুণে না হোক, আঠারো শতকের শেষ থেকে তাদের স্বকীয়তা সম্বন্ধে পশ্চিমে যে জনশ্রুতি চলে আসছে, অন্ততঃ তার শাসনে তাঁরা অপেক্ষাকৃত আত্মস্থও; অতএব তাঁদের জাতিব্যবসায়ে আর সামবায়িক সঙ্ঘের প্রাদুর্ভাব নেই; তাঁরাও আজকাল স্বাধীন প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী। তবু কবিজীবন কাব্যের চেয়ে ব্যাপক;

এবং আমাদের ভাবে যতই মৌলিকতা থাকুক না কেন, স্বভাবে আমরা নিতান্ত নির্বিশেষ।

অর্থাৎ বাংলাকাব্যের নব্য তত্ত্বও আগাগোড়া নূতন নয়; এবং ইদানীন্তন কবিরা আনুপূর্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই কাটিয়ে উঠেছেন, পরিপ্রেক্ষিতের পরবশতা ঘোচান নি। কিন্তু এর মধ্যে লজ্জার কোন কারণ নেই। কাব্য আর দর্শন বিভিন্ন বস্তু; এবং কবির সমস্ত শক্তি যেকালে রূপ সন্ধানেই নিয়োজিত, তখন তত্ত্বের জন্যে তিনি অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য। এ-নিয়ম দান্তে থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল মহাকবির সম্পর্কেই খাটে; এবং দান্তে যেমন "সুমা"-র রসানুবাদ ক'রে খৃষ্টান আখ্যা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি উপনিষদের অনুগত ব'লে হিন্দুসভ্যতারই কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে লোকযাত্রার লক্ষ্য বদলেছে। আজ আমাদের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলোয় পরগাছাই একমাত্র বোধিদ্রুম-রূপে বিরাজমান; যানবাহনের বাহুল্যে পৃথিবীর প্রসার সঙ্কুচিত; সার্বভৌম অন্নাভাবে সকল মানুষের অবস্থাই সমান। কাজেই আমাদের আধুনিকেরা বৈদান্তিক বীক্ষায় নির্ভর হারিয়েছেন; তাঁদের মতে ভূমার দিকে নজর রেখে মোটর-ধাবিত রাজ পথে চলা বিপজ্জনক।

ফলত বর্তমান বাংলা সাহিত্য আর ভোরের কুয়াশায় আচ্ছন্ন নেই, তার পরিমণ্ডল এখন অস্তরাগে রঞ্জিত। কিন্তু এজন্যেও সাম্প্রতিকেরা চিন্তাশীল ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিযোগ অগ্রাহ্য। কারণ এ-ক্ষেত্রে তাদের বৈদেশিকতা দোষাবহ বটে, কিন্তু তাদের মনুষ্যধর্ম শ্রদ্ধেয়। অবশ্য বৈদিক সভ্যতার বিধান মানলেই, মনুষ্যধর্ম নিপাতে যায় না; এবং মানুষকে অমৃতের পুত্র ব'লে ভেবেও রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যধর্মেরই পুরোহিত। কিন্তু তাঁর পটভূমিকা নিরুপাখ্য হওয়াতেই, বিশ্বমানবের চিত্রকেও তাতে বেখাপ্পা লাগে না; এবং আধুনিকেরা খুঁটি-নাটির মিল ধরতে পেরেই আত্ম-পরের প্রভেদ ভুলেছে। অতএব কেবল সন্ধানের বিচারে সাম্প্রতিক দর্শনের জয় হয়তো অনিবার্য। অন্ততপক্ষে অধুনাতনীরা দেখে শেখার সুযোগ পায় নি; তারা সাধারণত ঠেকেই শিখেছে; এবং সেইজন্যে যেখানে সম্মানের মাত্রা সিদ্ধির উপরে নির্ভর করে না, শুধু সাধনার মুখ চায়, সেখানে তাদের পাশ্চাত্ত্য পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সাধুবাদের যোগ্য।

তাছাড়া বর্ণসঙ্করতায় বাংলা সাহিত্য অভ্যস্ত; এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের বিশ্বাস যে আদর্শের দিক দিয়ে, এমনকি ভাবের হিসাব নিকাশে, তিনি খাঁটি

বাঙালী নন। শুধু তাই নয়, প্রাক্‌মাইকেলী যুগেও কমঠবৃত্তির আদর ছিল না; এবং ভারতচন্দ্রের চরিত্র যদিও আর্যপন্থী, তবু তাঁর ভাবনায় ও ভাষায় মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং হাল আমলের বনেট্‌-পরা সরস্বতীও দেবতা; তিনিও বরদা ও নমস্যা; এবং দর্শন দূরের কথা, প্রতীক ও কবি-প্রসিদ্ধির প্রয়োজন কার্যে যতদিন অক্ষুন্ন থাকবে, ততদিন অ্যাফ্রোডাইট উর্বশীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তবে শিল্প হেতুপ্রভব হ'লেও, তার ভূমিকার সমস্তটাই যদৃচ্ছালব্ধ নয়, তাতে অতিদৈবের স্থান আছে; এবং সাহিত্য প্রসঙ্গে উপযোগবাদ যেহেতু অকাট্য, তাই তার উদ্দেশ্য ও সার্থকতায় দ্বিরুক্তি নিষিদ্ধ। ফলে আমাদের সাগরলঙ্ঘনের কৈফিয়তে শুধু কালনিষ্ঠার নাম শুনেই আমার জিজ্ঞাসা বারণ মানে না, সিন্ধুপারের মায়াকাননে বন্দিনী সীতার কুশলপ্রশ্নও স্বতই মনে আসে।

এখানে আবার রবীন্দ্রনাথই আমাদের আদর্শ ও আশ্রয়। কারণ কতকটা অবস্থাগতিকে, এবং অংশত রুসো-পরবর্তী পশ্চিমী লেখকদের দৃষ্টান্তে, তিনি আবাল্য নিজেকে ব্রাত্য-রূপেই দেখে এসেছেন। তাই কোনোদিনই কেবল অনুকরণে তাঁর মন ওঠেনি; এমনকি স্বরচিত রীতিকে মুদ্রাদোষে স্থায়িত্ব দিতেও তাঁর রূপকারী বিবেক আপত্তি তুলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধুই আত্মসচেতন পুরুষ, তিনি অচেতন মানুষ নন; এবং উৎকর্ণ উন্মুখিতাই যেকালে বৈবিক জীবনযাত্রার বিশেষ গুণ, তখন তাঁর মনে পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাত সম্ভাবনীয়। এমন কি অত্যাধুনিক বাংলা সাহিত্যেও যে তাকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেনি, এ-কথা খুব জোর গলায় বলা শক্ত। তাহলেও তাঁর ঋণপরিগ্রহ দৈন্যবিরহিত ও বিলাসবর্জিত; তাতে অকর্মণ্যতার কোনো আভাস নেই; তাঁর হাতচিঠির আষ্টে-পৃষ্ঠে আন্তরিক প্রয়োজনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। ফলত গদ্যকবিতা-নামক তাঁর অধুনাতন কাব্যপ্রকরণের অন্তরালেও সম্প্রতিবেত্তার বাকসর্বস্ব ভূত বাসা বাঁধে নি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লীলা-বৈচিত্র্যেই তা মুখর।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সব সময়ে গদ্যচ্ছন্দের সদ্ব্যবহার করেন না; মাঝে মাঝে এ-রকম বিষয়কেও এই নব বিধান মানান, যা "পূরবী"র অলঙ্কার-বাহুল্যেই বেশি আরাম পেতো। কিন্তু এতাদৃশ অপপ্রয়োগের মধ্যেও কোনো স্বেচ্ছাচার বা শৈথিল্যের সূচনা নেই, তাঁর স্বাধীন মনের অবশ্যম্ভাবী বিকাশই আছে। বংশের গুণে এবং তৎকালীন পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি-দর্শনে

রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিলো যে জগৎ আনন্দময়, এবং চূর্ণ মর্তাসীমার উত্তরে দেবতার অপার মহিমা বিদ্যমান। দীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষাও তাঁর অপসিদ্ধান্তের অপসরণ ঘটায় নি; তিনি এখনো সুন্দরের ধ্যানে পূর্ববৎ তন্ময়। কিন্তু কুৎসিতকে তিনিও আর অভিজ্ঞতায় সন্নিপাত অসাধ্য জেনে বীভৎসের সঙ্গে মাধুর্যের সন্ধিস্থাপন করতে চাইছেন গদ্য-কাব্যের নৈরাজ্যে। এটা যে আর্যসমাজী মনোভাব, তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এর পিছনে সনাতনী অনমনীয়তা নেই, অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতাই বর্তমান।

তৎসত্ত্বেও মনে খটকা থেকে যায়; সন্দেহ হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বধর্মে নিধন শ্রেয় লাগুক বা না লাগুক, পরধর্মকে তিনি ভয়াবহ ভাবেন, তিনি হয়তো বোঝেন না যে প্রাচ্য মায়াবাদে দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্ট অব্যাখ্যাত ব'লেই, সারা এশিয়া আজ অগত্যা পাশ্চাত্য বস্তুতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে। সম্ভবত সেইজন্যেই গীতিকবিতারচনায় তিনি যে-রকম উৎকর্ষে পৌঁচেছেন, নাট্য-সাহিত্যে ততোখানি সাফল্য পান নি। আসলে তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব ও বিরাট সিদ্ধি নিয়ে নাটকপ্রণয়ন হয়তো দুষ্কর। অন্ততপক্ষে ট্রাজেডীর জনকমাত্রেই নিরাসক্ত ও আত্মবিস্মৃত; এবং অদৃষ্টবাদে আস্থা না রাখলেও, তার হয়তো চলে, কিন্তু টেরেন্স-এর প্রতিধ্বনি ক'রে সে আজীবন বলতে বাধ্য যে মনুষ্যত্বের অপকর্ষও তার সুপরিচিত ও আত্মনিহিত; "পরিশেষ", "পুনশ্চ" ও "বীথিকা"-র এক-আধটা কবিতা অন্য সাক্ষ্য দিলেও, এ-স্বীকারোক্তি যেহেতু রবীন্দ্রনাথের আত্মমর্যাদাবোধে আটকায়, তাই তিনি যদিও সংস্কৃত কবিদের আবশ্যিক শুভবাদ কাটিয়ে একাধিক বিয়োগান্ত নাটক লিখেছেন, তবু মহাপুরুষেরাও যে অন্ধ নিয়তির পদানত, এ-কথা তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয় ঠেকে; তিনি মানেন না যে শুভাশুভের বিকল্প অনিবার্য, এবং মানুষ কোন ছার, লাইব নিৎস্ স্বয়ং বিশ্ববিধাতার মধ্যেই সাধ ও সাধ্যের দ্বন্দ্ব দেখছিলেন।

উত্তরসামরিক মানুষের পক্ষে এ বিশ্বাসের ভাগ নেওয়া অসম্ভব; এবং বাঙালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে তিনি বাঙলাদেশে বৃথাই জন্মান নি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন। নচেৎ বঙ্গসাহিত্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ স্বপ্নপ্রয়াণে তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো দুষ্কর বটেই, এমন কি তিনিও যেকালে দুঃস্বপ্নের উপদ্রব একেবারে ঠেকাতে পারেন নি, তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও, বিশ্বব্যাপ্ত বিভীষিকার সঞ্চারে

চমকে উঠবো। কিন্তু চমকে ওঠাই যথেষ্ট নয়; তার পরে আবার ফিরে শুলে, ভবিষ্যতে পুনর্জাগরণের সুযোগ মিলবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং রাবীন্দ্রিক গন্তচ্ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী, একাবলীর উপযুক্ত মধুর মনোভাব ব্যক্ত ক'রেই আধুনিক বাঙালী কবির রক্ষা নেই, যুগধর্মে দীক্ষাগ্রহণ তার অবশ্যকর্তব্য। এ-কথা না মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্র সাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে তাকে পরীর দেশ বললেও, বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।

## কাব্যে ধারণাশক্তি

অমিয় চক্রবর্তী

মনে করা যাক, বর্ষার কাব্য লিখছি। ভাদ্রের আকাশ ভেঙে পড়েছে; শ্রাবণী প্লাবনীর ভরা পাত্রে ঘনতর ছায়া ভরল; বাড়ির ঘাটে আশ্চর্য স্রোত। পুবের বাগানে কতরকম সবুজ, ঝাপ্‌সা সবুজ, মেঘলা সবুজ, তাতে ঝিলুকে আলো ঠিকরে পড়ে, দুপুরের ক্ষণলঘু বিরত বৃষ্টির মুহূর্তে। কখনো নীল মেঘ, কালো মেঘ কল্লাভ ইন্দ্রলোকের মেঘ। বাংলার বন্যায় আজ মিশেছে কান্নার জল, সব বাঁধ ভেঙে গেছে দুঃখের; সেদিনকার কথাটা কাব্যকে ছাড়িয়ে যায়। যারা বাঁধ গড়বার কাজে যথাপ্রাণ নিযুক্ত তারা হয়তো আজ কবিতায় বোবা। আদিগন্ত দুর্যোগকে এখনই কাব্যে ধারণ করবার শক্তি সকলের নেই।

বর্ষার ধারণাকে অন্যান্য নানান্ আর্দ্র প্রসঙ্গে চেয়ে দেখি। বারান্দাটা ভিজছেই লাল সর্বাঙ্গে, লাল শানের বারান্দা, ছাতহীন; ঝিরিঝিরি, ঝরঝর সারাদিন। ঘাটের ধাপেই মেঘনা, তার ঘোলাটে আয়নায় পূর্ববঙ্গের ছায়া ঘনায়, আকাশ জলের মোহনায়; বৃষ্টি; দৃষ্টি লীন। সারাদিন। আমরা বাড়িতে। জলবরণ জল, ছলছল, জামে আমরুলে জল, বাগানে ঝাউয়ের বনে, আনারসে মেহেদিতে। জল নামছে হঠাৎ প্রবল।

ওদিকের বাগানে কলাগাছের সাকিপাতা; শিমুলের বিশীর্ণ আঙুল, অঞ্জলিত মোটা বটপাতা। ফোঁটা ফোঁটা জল, চঞ্চলিত। ঝিরঝির নতুন বর্ষণ। সুপুরিগাছের সারি ঘন সঙ্কলিত। তার মধ্য দিয়ে সরু জলের গলি। তেঁতুল নিমের দ্রুত সুচারু সবুজে বৃষ্টি; নিচে জল জমে; বকুলগহন গাছতলে ছায়াচ্ছন্ন গূঢ় জল। জানলায় বসে আছি। অগম্য আকাশ থেকে ঘাসে-ঘাসে শিকড়ে জল গড়ায়; ধানের গোড়ায়, শীষে; সিক্ত তেজে প্রাণ ভেজে। স্বর্গরশ্মিরবস্বচ্ছমর্ম জল, স্নিগ্ধ জল।

দেখছি শুনছি, কিন্তু শত টুকরো দেখাশোনাকে মিলিয়ে নিয়ে কবিতার সূত্রটুকু প্রচ্ছন্ন অনুভবের ভাষায় নিমগ্ন।

এরই মধ্যে মনে একটা পদ জাগল—

'ঝাপসা পুকুরে ব্যাং স্তব্ধ শুধু অস্তির বিহ্বল।'

বুঝতে পারলাম বলবার আর একটি সচেতন স্তরে এসে পৌঁছেছি। পদটি আমার সমস্ত ধারণাকে ধারণ করতে চায়।

জাগা-মনের কোণায় যখন এই মেঘলা দিনের সচল সজল চিত্র, তখন গানের ধুয়োর মতো ঐ একটি পদ নেমে যেন আমার কথা-রচনার উপরে সজ্ঞানতার ধ্বনি জাগিয়ে দিল। ছবির ভিতর থেকে উঠল স্পষ্টতর সংস্কার, যাতে লুপ্ত স্মৃতি এবং নতুন পরিবেশ মিশেছে। দেখলাম আমার রচনা বিশেষ একটি ছন্দে অধিকৃত, কোন্‌খানে গিয়ে সমস্ত লেখাটার পরিধিচক্র ঘুরে গেছে তা-ও অনুমান করলাম। কবিতাটার শেষতম অংশে মেঘার্দ্র মাটি-মন এবং ভাবের গগন, বিশেষ একটি লগ্নে উচ্ছল হ'ল; ছবিতে দেখা দিতে লাগল দৃঢ় একটি মানসরেখা। বিস্মৃতির শুষ্ক জল উড়ে যায় দমকা বাদলে। কাজের বিত্রস্ত ব্যথা লুপ্ত হ'ল ডিণ্ডিম মাদলে। হৃৎপিণ্ডে সঘন ভাদ্র, ভ্রান্তি ভয় মৃত্যু ডোবে অশ্রান্ত বর্ষায়,—ডুবে থাকে, যেমন এ ঝাপ্‌সা পুকুরে বিশ্বের কূপ-মণ্ডুক। অগাধ জলে নিমগ্ন চৈতন্য। অথচ উপরমহলে প্রাণের উপচিয়ে পড়া একটি স্বচ্ছতা। প্রত্যক্ষ করলাম, মাছ-হাঁস-মানুষে জলসূত্রে বাঁধা এক খুশি। খুশি বারান্দায়। মনে লেগে আছে বারান্দার কথা,— লাল মেঝে ধুয়ে তার ধাপে ধাপে তরঙ্গ গড়ায়।

লাল বারান্দাটা আমার বর্ষা-চেতনার অন্তরঙ্গ।

—এই আমার বর্ষা-কাব্য।

* * * *

নিজের মধ্য থেকে জেনেছি, চৈতন্যের বিশেষ ঘন মুহূর্তে কোন্ ঘটনা বাঁধা পড়বে, কোন্‌টা পড়বে না, তার হিসাব নেই। তালিকার কথা উঠলেই যেন গীতিকাব্য-লেখক কাগজটা ছিঁড়ে ফেলেন। অন্তরের প্রচ্ছন্নতায় সংযোগ বর্জনের পালাটা আমাদের সচেষ্টতার আয়ত্ত, উদ্দেশ্যের বাহিরে। সমস্ত ধারণাকে বহন ক'রে কোন্ ছিন্ন বাক্য, প্রক্ষিপ্ত রৌদ্রচ্ছটা দেখা দেবে তা আঙ্গিকের অথবা ভাবনার বহির্বাখ্যানে নির্ধারিত হয় না। অথচ এ কথা জানি যে বোধনের ঘেরকে আমরা বাড়িয়েছি। লাল বারান্দাটা বিসংগত হলেও অসংগত নয়। অনেক কথা আমাদের ছবিতে ঢোকে যা আগে ফ্রেমের বাহিরেই থাকত।

রচনার কালে চেষ্টা না থাকলেও, রচয়িতার মন আজকে কাব্যবিচারের নানা মহলে ঘুরতে অভ্যস্ত ; ছন্দোবেগের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিবিধ প্রবণতা নিশ্চয়ই থেকে যায়। আঙ্গিকের নবীনতায় বিমিশ্র মাধুরী সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গের অপ্রত্যাশিত পরিধি-রচনায় কবিতার দিগন্ত তৈরী হতে থাকে। সুরের ভাবনা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায় ভিন্ন রাগ-রাগিণীর দরোজা, যাদের মধ্যে বাহিরের সদ্ভাব নেই ; তাল এবং লয়ের বোল-চাল যায় বদলিয়ে। কাব্যের ঘেরে চতুর্দিকের কোন ঘটনার রঙ কোথায় মেশে, বিরূপের রূপ ধরা পড়ে কোন্ রেখার জালে তার জবাবদিহি নেই।

কিন্তু যাকে কাব্যের ধারণাশক্তি বলছি তা কেবলমাত্র ঘটনার টুকরো কুড়িয়ে সরাসরি বাক্যে গ্রন্থনশক্তি নয়। সেভাবে জর্নলিজম-এর নগদ মূল্য মেলে, পরিবেশের চমক লাগানো যায়। প্রত্যক্ষ সংগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে খরচ করবার কৌশলীবিধি সৃষ্টিশীলতার মুখ্য পরিচয় নয়, অধিক ক্ষেত্রে সেটা কাব্য-প্রকাশের বিরুদ্ধ পথ। নানা অভিজ্ঞতাকে ধারণ করবার শক্তিই ধারণাশক্তি। ভাবের চিত্রময় অন্তর্লীন একটি সূক্ষ্ম শরীর তৈরী হওয়ার জন্যে চাই মনের শম্বৃত-বেগ, যা আপন কালে এবং ছন্দে প্রকাশ পায়, যাকে তাড়া দেওয়া যায় না, অথচ যার মধ্যে বিভিন্ন সমন্বিত সৃষ্টির অনিবার্যতা আছে। সেই প্রাণ-মনস্বিনী ধারাকে নূতন শিল্পে কচিৎ দেখতে পাই। রিপোর্টর-বৃত্তির প্রাবল্য আধুনিক ধারণাশক্তিকে বিড়ম্বিত করে, কেননা তার মধ্যে অভিষিক্ত চৈতন্যের স্থিরবিদ্যুৎ নেই, যাতে তল পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছয়। অথচ কেবলমাত্র ঘটনার চকমকি ঘষাকে অনেকে নূতন শিল্প-সচেতনতার সাক্ষ্য ব'লে মানেন। আবার কারও কাছে বিসদৃশের গভীরতম যে সংগতিকাব্য, যাতে বিশ্বসত্তার সাধর্ম্য প্রকাশিত, তার সঙ্গে প্রহসনের কোনো ভেদ নেই। স্টক-এক্স্চেঞ্জের টুকরো তথ্য, দলের ঝাণ্ডা, আনুষ্ঠানিক ধর্মের পাণ্ডা, বিকৃত বুলি এবং নোংরা চায়ের পেয়ালা জোড়াতালি দিয়ে সচেষ্ট কাব্যরচনা হ'ল কাব্যের ছেঁড়া কাঁথা। কাব্য গাঁথা হয় যে-সৃষ্টির জাল বুনে তাতেও প্রবোধ মণিহারি দোকান বসতে পারে, কিন্তু সেখানকার পসরা জুটেছে অন্যভাবে। পড়ন্ত রোদের একটি গ্রন্থিতে বাঁধা পড়ে গেল অনেক-কিছু ; পানের দোকানে সবুজ পান, সোনালী ডিবে ঝিলমিলে ঝোলানো আয়না, দোকানের লাল টালির উপরে চুপ করে বসে আছে কাক। বুড়ি ভিখারি ভাঙা টিনের পাশে হাত বাড়িয়ে উদাসীন, তার অসুন্দর মুখের শীর্ণতা আলোয় চিত্রিত হয়ে দেখা দিল। তিনটে মার্কিন

সৈন্যের মাথায় এসে রোদ্দুরের ঘেরটা মিলিয়ে গেছে, অথচ তারাও রইল আমার কাব্যের অন্তর্দৃশ্যে। কি বলতে চায় জানি না, কিন্তু এই একটি সমগ্র রচনা, বিশেষ অর্থে কম্পোজিশন। ছবির ঘেরে অহৈতুক একতা। বোধনের আলোকে শুধুমাত্র দেখাতে পারলে দর্শকের মনে হবে দেখছি। দৃশ্য সত্য, দিব্য সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্যে মিলিয়ে অন্তর্গূঢ় আধুনিক মন থামকা কী দেখাতে চায়। তার ধারণাশক্তি একটি পড়ন্ত রৌদ্ররশ্মির অদ্ভুত পাত্রের মতো, তাতে কত কিছুর অনিবার্য প্রবেশ, আধেয়, যা-খুশির অধিকার। আমরা মেটাফিজিক্স্‌-এ পাওয়া সজাগ সচল ধ্যানী, যোগ-বিশুদ্ধ চোখে অলিগলিতে চেয়ে দেখি। রাস্তায় ঘাটে কবিতা ছড়ানো; সিঁড়ির ধাপে ঐ পাশের দরজায় পিতলের কড়া'টা পর্যন্ত ছবির অঙ্গ। বৃষ্টিতে লাল বারান্দা ভিজছে। এর রহস্য বিষম ছন্দে ধরা দিতে চাইল। বোঝানোর দরকার নেই। কেননা কাব্যের বাহিরে তা অসম্ভব।

"স্বর্গ হইতে বিদায়", কলিকাতা শহরের আধুনিক নরকের সঙ্গে যুক্ত করে লেখা যায়। স্বর্গের দৃষ্টি স্বর্গীয়, দৃশ্যের উপরই তার নির্ভর নয়। মনের বিশেষ অবস্থায় একটি আশ্চর্যের আভা এসে পৌঁছতে পারে। অথচ সংসারের কিছুই মেনে নিতে বলছি না। সাংঘাতিক শহুরে ব্যবস্থার জন্যে যারা পাপী তাদের বিষয়ে যথাসময়ে বলব, এমনকি প্রগাঢ় কাব্যের মধ্যেও প্রতিঘাত জাগবে যদি বেদনার তীব্রতা জীবনের মূলে পৌঁছে থাকে। ইতিমধ্যে কলুটোলার গলিতে কনে-বিদায়ের শাঁখ বেজে উঠল। বাপের বাড়ি ছেড়ে যাবার চোখে কোন্‌ সজল দৃশ্য আমারও কাছে স্বর্গীয় হয়ে উঠল। আমার কাব্যে লিখলাম একটা প'ড়ে থাকা ভাঙা কলসির কথা, তার গায়ে এখনও একটু সাদা আলপনা। ছোটো কাহিনীর সুরে খানিকটা পরিবেশ বাঁধা পড়ল। পাশে চলছেই প্রতিদিনের গলির জীবন। কে একজন কাকে বলল, মশাই, দেশলাই আছে?

বহু শত সহস্র কচ ও দেবযানী পরস্পরকে শেষ কথা বলেছে হাওড়া প্লাটফর্মে, দেশকালহীন থার্ডক্লাশ-কামরার সম্মুখে। ভেণ্ডর, হুইলর স্টল, বাষ্পাভ সরণীতে জেগে আছে কোন ঘুরিয়ে-নেওয়া দু-চোখের দৃষ্টি। কোটি বৎসর চলে গেল গাড়ির শেষ লাল গোলকের সঙ্গে। ঢং ঢং ঢং। সমস্ত স্বর্গমর্ত্যের গম্ভীর রেলোয়ে ধ্বনি তাতে। মায়ের একমাত্র হাবা ছেলে কোন্‌ দৈব খুঁজতে এসেছিল দু-বছরের কলকাতায়; একলা চলে গেছে সেই বিকেলে

আসানসোলের স্টেশনের মুখী হয়ে। গাড়ি আর ফিরল না। বৃহত্তর, নিবিড়তর, ঘোর আধুনিক ধারণাশক্তিতে গাঁথা এই সনাতন কাব্য ভূমিকায় থাকতে পারে টিকিট আপিস এবং নানা জায়গায় ওঠা-নামার ভিড়।

একটা কবিতায় বলেছিলাম:—জাপানী খদ্দর ভালোবাসি না, স্বদেশী বোমারুকেও নয়, এমনি আমার স্বভাব। আধুনিক এইসব উগ্র অভিব্যক্তিকে মস্ত বাস্তব সত্যের অঙ্গরূপে সহ্য করি, বা করি না। কিন্তু এইটে জানি: বিচিত্র বিশ্বে আমিও আছি, অনেকে আছে। অনেকের স্থান। সুখের বিষয়, এমন অদ্ভুত দুঃখের যুগেও স্বাধীন নারীকে দেখলাম, বড়ো পরিবারকে আপন উপার্জনে, চারিত্রশক্তির দৃঢ়তায় সে বহন করছে। এ-ও দেখলাম, যাদের কুলি বলা হয়, গুলিও করা হয়, তাদের মধ্যে ধর্মঘট জাগল, অন্যায়কে সহ্য না করবার একযোগী বিদ্রোহ। এর জন্যে তারা গুলি খেলেও বলব তা শুভচিহ্ন। ঋিমন্ত দেশে ভালো এই সংকট। আধুনিক কালের কথা বলছিলাম।

বিপুলা চ পৃথ্বী। তাতে নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি থাকেন, আমিও। বিশুদ্ধ তিনি আস্ত একজন মানুষ—নাম শুনেই বোঝা যায় বিসদৃশ। আর ব'লে কাজ কী? তিনিও থাকুন। এই যে হতাশ্চর্য আমার দুর্দিনের পৃথিবী, এর সম্বন্ধে আমার কিন্তু শেষ পর্যন্ত নালিশ নেই। আমি দ্রষ্টা। দেখে চলে যাব। কোথাও দৃষ্টির আনন্দ, কোথাও নয়। মন্দিরের বাহিরটা আমার সুদৃশ্য, ভিতরের যাত্রী-ব্যবসায়ী পাণ্ডা এবং বদ্ধ হাওয়ায় উড়ন্ত বাদুড় পর্যন্ত আমার ধর্ম নাই পৌঁছল। মন্দিরের ওপর কী সুন্দর রোদ্দুর পড়েছে। যতদূর দেখছি আজ বাঁচবার এই অদ্ভুত পার্থিব পথ চলে গেছে। কোন্ বাস্তব পরিণামের দিকে কে জানে! দোকানের দাওয়ায় বসে কেবল দেখছি। তৃপ্তি মেটে না। অপার্থিব কী তা আমার জানা নেই, খোলা চোখের সামনে এই আমার অফুরন্ত দু-দিনের দৃশ্যকাব্য।

প্রগাঢ় বেদনাময় দৃষ্টির কোন এক মুহূর্তে এই সমস্ত ধারণাটা জেগেছিল। হাল্কা কথার চালে তার বক্তব্য আপনি আমাকে বলিয়েছে, বাধা দিইনি, চেষ্টাও করিনি।

আজ আমার ধারণার আকাশ বর্ষায় অভিষিক্ত। কেবল জল, আর হাওয়া, আর ভিজে সবুজ কীর্তি। আমার লাল বারান্দাটা ভাদ্রের বন্যায় ভিজছে।

## ভারতচন্দ্র

### শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বলা বাহুল্য পুরাতন অবৈষ্ণব বাঙালী কবিদিগের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, কিন্তু বলা আবশ্যক, কেননা এপর্যন্ত আমরা কেহই কবিকে সেই উচ্চ সম্মান সম্পূর্ণরূপে দিতে চেষ্টা করি নাই।

সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য, সামান্য একটুখানি দৃষ্টিভেদে ঘটে। এই সামান্যতা-সাধনেই তাঁহাদের অসামান্যতা। ইংরেজী সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্য প্রধানত রোমান্টিক। ইংরেজী কাব্যের মূল সুর বহু প্রচলিত এই চিত্রটিতে বিরাট ব্যাকুলতায় ধ্বনিত, 'Over the hills and far away'; বাংলা সাহিত্যের মূলকথা 'সেই দেশেরি তরে আমার মন যে কেমন করে' কিংবা, "কান্ত পাহুন, বিরহ দারুণ, কাটি যাওত ছাতিয়া," কিংবা "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" এই সুদূরের ভাব, আকুলতার ভাব, বাংলা কাব্যের মূল সুর, ইহাই বাঙালী কবিদের মৌলিক প্রেরণা।

এই রহস্যটা বৈষ্ণব কবিরা ধরিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা ভারতচন্দ্র ব্যতীত অন্য কোন মঙ্গলকাব্য রচয়িতা ধরিতে পারেন নাই। (মঙ্গলকাব্যকে আমরা আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় কথাকাব্য বলিতে পারি)। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের মূলে এই মূলকথা।

পুরাতন কথাকাব্য-প্রণেতাদের মধ্যে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বী, অধিকাংশ পণ্ডিতই মুকুন্দরামকে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা বড় মনে করেন। কিন্তু রসবিচারে এই অদ্ভুত মানসিকতার কোন কারণ নাই। যাঁহারা মুকুন্দরামের জন্য এই আসন দাবি করেন তাঁহারা সকলেই পণ্ডিত; তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ওইখানেই বোধ হয় গোল। তাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। মুকুন্দরাম ষোড়শ শতকের

কবি। সে সময়ের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক কথাই আমরা মুকুন্দরামের কৃপায় জানিতে পারি। তিনি বাংলার অজ্ঞাত এক যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান আমাদের দিয়াছেন, আমরা তাহার মূল্যস্বরূপ শ্রেষ্ঠ কবিত্বের সম্মান তাঁহাকে দিয়া বসিয়াছি। "সত্য রত্ন দিলে তুমি, পরিবর্তে তার" আমরা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি-খ্যাতি দান করিয়াছি। কবিকঙ্কণের অনেকগুলি রত্নই ঐতিহাসিকদের কৃতজ্ঞতার দান।

অপরপক্ষে ভারতচন্দ্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লোক। তাঁহার সময়ের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক তথ্য অজ্ঞাত নয়, তাহা জানিবার অন্য উপায় আছে। কাজেই ঐতিহাসিকদের নিকটে কবি পূর্ণ মনোযোগ পান নাই, ফলে যাহা তাঁহার প্রাপ্য তাহাতেও তিনি বঞ্চিত।

একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে মুকুন্দরামের কাব্যে আমরা ঐতিহাসিক তথ্য যে পরিমাণে পাই, অন্য কোন পুরাতন কাব্যে তাহা পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাতেই মুকুন্দরামের অভাব সূচনা করে। কাব্যের মধ্যে কি পরিমাণে তথ্য মিশানো যায় এবং মিশাইলেও তাহা কাব্য-সত্যের পথে অন্তরায় হইয়া ওঠে না তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে। মুকুন্দরামের সেই নিয়মটি অজ্ঞাত ছিল। দুধে জল দেয় না, এমন গোয়ালা বোধ করি গোকুলেও ছিল না। গোপবালক কৃষ্ণের সহিত রাধিকার রাগারাগির সূত্রপাত যে ইহা লইয়া নয়, তাহা বোধ করি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারও শপথ করিয়া বলিতে পারেন না; পূর্বরাগের পূর্ব রাগটা ইহাই লইয়া। ভারতচন্দ্র এই নিয়মটি জানিতেন। তিনি কাব্যে তথ্যকে প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে দুধের অপেক্ষা জলের দাম বেশী; তাই ভারতচন্দ্র "মন্দ নয়, বেশ, মাঝে মাঝে চমৎকার—বিশেষ করিয়া অমুক স্থানটায় ইত্যাদি," আর মুকুন্দরাম শ্রেষ্ঠ কবি।

এখন প্রশ্নটা এই, মুকুন্দরাম কাব্যে তথ্যকে এমন একান্তভাবে প্রশ্রয় দিলেন কেন। আমার বিশ্বাস তিনি বাংলা দেশের মহাভারত, মহাকাব্য রচনার সুযোগ ও উপাদান পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় মুকুন্দরাম ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ (Realistic) কবি। কিন্তু বাংলা সাহিত্য মূলতঃ রোমাণ্টিক। কবির সাহিত্যধর্ম ও দেশের সাহিত্যধর্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার-দশা হইয়াছিল দুই নৌকায় পা দিবার মত; এই দুর্দশার জন্ত তিনি এক পাও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। আদিতে যে উপাদান লইয়া

আরম্ভ করিয়াছিলেন অন্তেও তাহা উপাদানরূপেই রহিয়া গিয়াছিল। ঐতিহাসিকদের ভোজ এই অসার্থক উপাদানের প্রাচুর্যে।

উপাদানের সৌভাগ্য মুকুন্দরামের মত অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সদাগর। আজ-কালকার ভাষায় প্রলিটারিয়েট ও এরিস্টক্রেট, বাংলা সমাজের নিম্নতম হইতে উচ্চতম সুরসপ্তক তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু কবি কেবল গলাই সাধিলেন, সুর বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু আমরা কি মুকুন্দরামের কাব্যে তৎকালীন চিত্র পাই না? চিত্রই পাই, কাব্য নয়। তৎকালীন চিত্র পাই, চিরকালীন কাব্য নয়। এই তৎকালীনতার জন্য মুকুন্দরাম অমর হইয়া আছেন। তাঁহার অমরতা তাঁহার ব্যর্থতার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতচন্দ্রের এমন উপাদানের সৌভাগ্য ছিল না। একটি রাজবংশের কাহিনী তাঁহার উপজীব্য। কিন্তু কবিপ্রতিভা কাব্যধর্মসম্বন্ধে সচেতন বলিয়া এই উপাদানের সামান্যতায় তিনি অপূর্ব কাব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। অন্নদামঙ্গলকে রোমান্টিক কাব্য হিসাবে পাঠ করিলেই যথার্থভাবে পাঠ করা হইবে। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথমখণ্ডকে দেবখণ্ড বলিতে পারি। ইহাতে ভারতচন্দ্রের রোমান্টিক কবিপ্রতিভা পূর্ণতালাভ করিতে পারে নাই। দেবদেবীর ইতিহাস ও কাহিনী পৌরাণিকতার স্তরে এমন সুদৃঢ়ভাবে ন্যস্ত যে কবি সে ধারাকে লঙ্ঘন করিয়া নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ দেখাইতে পারেন নাই। এই দেবখণ্ড পাঠ করিলে স্বভাবতঃই মনে হয় ইহাতে কবির যথেষ্ট মনোযোগ নাই। কেবলমাত্র কাব্যের ঠাট বজায় রাখিবার জন্যই তিনি সে অংশটা লিখিয়াছেন। সেইজন্য ইহা আংশিক সফলতা মাত্র লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর রোমান্টিক কাব্য বাংলা ভাষায় আর নাই। অশ্লীলতাই নাকি ইহার প্রধান অন্তরায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব বৈষ্ণব কবিদের রাধাকৃষ্ণ সঙ্গীত ও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী একই মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত। দুইয়েরই ভাব-উপজীব্য অসামাজিক গুপ্ত প্রেম। কেবল প্রভেদ এই রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপক, আর বিদ্যাসুন্দরের প্রেম রূপবান্। রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপকে অতিক্রম করিয়া অরূপে পৌঁছিয়াছে; বিদ্যাসুন্দরের প্রেম রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রাধা তো আরাধিকা; তাহার প্রেমে বিশেষ নির্বিশেষ হইয়াছে, আর বিদ্যার প্রেম হৃদয়ের সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বাসনাকে

একজনের মধ্যে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। সুন্দর কবি আর্টিষ্ট, তাহার প্রেম রূপে আসিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ দুই প্রেমই সমাজশৃঙ্খলাকে লঙ্ঘন করিয়াছে। এই হিসাবে ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবকবিদের ভাব-জীবনের বংশধর। কৃষ্ণ বাঁশীর সুরে রাধার হৃদয়ে রন্ধ্র নির্মাণ করিয়াছে, সুন্দর করিয়াছে সিঁধকাঠিতে, দুই প্রেমেরই আনাগোনা রন্ধ্রপথের রহস্যের অন্ধকারে। এই রহস্যই দুই প্রেমের প্রাণ। আবার রহস্যই রোমান্টিক ধর্মের প্রধান লক্ষণ। সুন্দর কবি, চোরও বটে ; সে চিরদিনের জন্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, অন্তর চুরি-করা বিদ্যা যে সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই।

আসলে বিদ্যাসুন্দর কাব্য একখানি রোমান্টিক **Satire**. এ শ্লেষ দ্বার্থ ; একদিকে সমাজশৃঙ্খলা অপর দিকে রাজসভা ; কবি এক ঢিলে ঐ দুইটি সুপ্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। এক রাজসভায় বসিয়া সকল রাজসভার প্রতি ব্যঙ্গবাণ প্রক্ষেপ আক্ষেপের বিষয় হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু এক হিসাবে এ দ্বার্থশ্লেষ ব্যর্থ হইয়াছে, সমাজ ও রাজা, কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতি ও সমাজপতি দুইই ছিলেন, গুপ্তপ্রেমের কাহিনী লইয়া এতই নিবিষ্ট ছিলেন যে, গুপ্তশ্লেষ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের ভরসা ছিল বাঙালের স্বাভাবিক নির্বুদ্ধিতার উপরে।

তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের কাহিনী, ইহাতে কবি অনেক বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। দেবখণ্ড সময়াতীত, বিদ্যাসুন্দর অসাময়িক, আর মানসিংহ সমসাময়িক। ইহাতে কল্পনা ও বাস্তব টানাপোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া অপরূপ শিল্পসম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাকে রোমান্স ও রিয়ালিজমের বিবাহ বলা যাইতে পারে। মুকুন্দরাম যে-**Realism** গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র প্রধানতঃ রোমান্টিক কবি হইয়াও সে চেষ্টাকে সফল করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের পূর্বে কেহ বৈষ্ণব পদ লেখেন নাই, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবে না। তাঁর বিশেষত্ব তিনি প্রথমবারের জন্য বৈষ্ণব পদের একটা স্থায়ী ঠাট গড়িয়া দিলেন। পরবর্তী বৈষ্ণবপদ প্রধানত সেই ঠাটকে অনুসরণ করিয়াছে। পদসাহিত্যে সেইজন্য চণ্ডীদাস আদিকবি। ভারতচন্দ্রের পূর্বে বহুসংখ্যক কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলেই মুকুন্দরামের মত ভুল করিয়াছেন। বাংলার সাহিত্যধর্মকে না বুঝিতে পারিয়া

কবিযশপ্রার্থীরা বস্তুনিষ্ঠ কাব্য রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্যধর্ম-বিরোধী কাব্য পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। ভারতচন্দ্রই প্রথম মঙ্গলকাব্য প্রণেতা যিনি সাহিত্য-ধর্মের সহিত নিজস্ব কবিপ্রতিভার সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি মঙ্গলকাব্যের আদি কবি। ইতিহাসের তারিখ হিসাবে দেখিলে তাঁহাকে প্রায় শেষ মঙ্গলকাব্য রচয়িতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু সে বিচার অবিচার হইবে। ভারতচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের পর মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলার প্রবহমান ইতিহাসে একটা বিরাট মন্বন্তর ঘটিয়া গেল। সে পরিবর্তন এতই সুদূরপ্রসারী যে আগেকার কাব্যধারাকে তাহা লুপ্ত করিয়া দিল। এ পরিবর্তন না ঘটিলে ভারতচন্দ্র প্রবর্তিত কাব্যধারা কি ভাবে প্রবাহিত হইত, তাহাই ভাবিবার কথা। চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যকে অমরতার পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন, তখন হইতে সে পথে চলা তেমন কষ্টকর ছিল না, সকলেই যে অমরতার স্বর্গে উপনীত হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু একথা আমরা বুঝিতে পারি তাঁহারা সকলেই অমরতার পথিক। ভারতচন্দ্রও তেমনি মঙ্গলকাব্যকে প্রথমবারের জন্য অমরতার পথে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তিনি নিজে অমর হইয়াছেন; অন্যকে অমরত্বের সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সে পথে চলিয়া কেহ অমর হয় নাই, ইহা সত্য নহে, সে পথে আর চলাই হয় নাই। কাজেই ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের আদি কবিও বটে, শেষ কবিও বটে।

বৃটিশ শাসনে বাংলার সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন না ঘটিলে পরবর্তী মঙ্গলকাব্য মুকুন্দরামের প্রবর্তিত বস্তুনিষ্ঠ পথ ছাড়িয়া ভারতচন্দ্রের পথ ধরিয়া চলিত। কিন্তু যে-পথ প্রবর্তিত হইল, অথচ প্রচলিত হইল না, সে-পথ অমরত্বের দিকে নিষ্ফল তর্জনী সঙ্কেতের মত পড়িয়া আছে, আর সেই পথের একান্তে বাংলার সুদীর্ঘ করুণ ইতিহাসের যে অশ্মশিলাখণ্ডে কালির অক্ষরে খোদাই করা আছে ১৭৫৭, তাহারই নিকটে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি সহসা দেশব্যাপী বিষাদের আভাসে অর্ধ-বিকশিত অবস্থায় থামিয়া গিয়াছে।

২.

মুকুন্দরামের প্রধান দোষ গ্রাম্যতা, কি ভাবে, কি ভাষায়, চরিত্রঅঙ্কনে; অবশ্য কল্পনায় নয়, কল্পনাশক্তি তাঁহার স্বল্প। সাহিত্যে যে urbanity

আমাদের আদর্শ, পুরাতন কবিদের মধ্যে একমাত্র ভারতচন্দ্রে তাহা পাই ; মুকুন্দরাম sub-urbanityতেও পৌছিতে পারেন নাই। একদল আছেন যাঁহারা বলেন মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, তিনি তৎকালীন লৌকিক ভাষায় কাব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য ইহা মুকুন্দরামের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সাহিত্যের নহে। সাহিত্যের ভাষার আদর্শ লৌকিক নহে, অলৌকিক। অর্থাৎ যে ভাষায় লোকে কথা বলে তাহা নয়, যে ভাষায় লোকের কথা বলা উচিত তাহাই। যেমন কাব্যের ঘটনা কাব্য নহে, তাহার উপাদান মাত্র ; ঘটনা ভাবনায় রূপান্তরিত হইলেই কাব্যসৃষ্টি হয়, তেমনি মুখের ভাষা কাব্যের ভাষার উপাদান মাত্র, তাহা আদর্শায়িত হইয়া উঠিয়াই কাব্যের ভাষায় পরিণত হয়। মুকুন্দরামের ভাষায় এই আদর্শীকরণ নাই।

মুকুন্দরামের চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধেও একই কথা। তাঁহার সকল সৃষ্টির মধ্যে একটি চরিত্র ব্যতীত সবই অপসৃষ্টি। তাহা মূলে যে চরিত্রসৃষ্টির উপাদান মাত্র ছিল, ফলেও সেই উপাদান রহিয়া গিয়াছে। এই সব সৃষ্ট-চরিত্র একান্তভাবে লৌকিক ও গ্রাম্য হইয়া রহিয়াছে। পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তবেই সেই সব চরিত্র-চিত্রের খানিকটা মর্ম-উদ্ঘাটন সম্ভব।

একমাত্র ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র সম্বন্ধে একথা খাটে না। এই সব চেয়ে গ্রাম্য ব্যক্তিটি সাহিত্যিক গ্রাম্যতা-দোষের ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্র ও মুকুন্দরাম দুই জনেরই বৈশিষ্ট্য দুইটি অপ্রধান চরিত্র-কল্পনায়, হীরামালিনী ও ভাঁড়ু দত্তের। একটি পূর্ণসৃষ্টি ও একটি অপূর্ণসৃষ্টিতে কি প্রভেদ বোঝা যায় এই দুটি চরিত্রের সমালোচনায়। এমন অসম্ভব নয় যে ভারতচন্দ্র হীরার চরিত্রের উপাদান পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা যাহা পাই তাহা অসম্পূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ সৃষ্টি। ভাঁড়ু দত্ত ও হীরামালিনী দুজনেই সাহিত্যিক urbanityতে পৌছিয়াছে, তাহাদের বুঝিবার জন্য পাঠককে কল্পনায় তৎকালীন সমাজে প্রবেশ করিতে হয় না।

হীরার চরিত্র কেবলমাত্র একটি অস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত নহে, ছোটখাটো ঘটনায়, কথাবার্তায়, রসালাপে, তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গে তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত। ভাঁড়ু দত্ত একটিমাত্র রেখার সৃষ্টি। যে কল্পনাশক্তি ভাবাকে আদর্শায়িত করে, যে-শক্তি থাকিলে নানারূপ তথ্যের দ্বারা পাঠকের মনে রসবোধ জাগ্রত করে, তাহার অভাববশত এই রেখার সৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া

উঠিতে পারে নাই। তাহার চরিত্রের এই অবকাশপথে পাঠকের মনোযোগের ও রসবোধের অনেকটা অংশ পড়িয়া গিয়া নষ্ট হয়। মুকুন্দাম বস্তুনিষ্ঠ কবি, তাহার পক্ষে তথ্যের সমাবেশ একান্ত আবশ্যক। সে তথ্যের সমাবেশ যেখানে অনাবশ্যক সেখানে তিনি করিয়াছেন, কিন্তু যেখানে তাহা অবশ্যম্ভাবী সেখানে কবির খেয়াল নাই। ইহার একটি কারণ আছে মনে হয়, কবি বুঝিতে পারেন নাই যে, কালকেতু ফুল্লরা ধনপতি প্রভৃতি বড় বড় বীর ও প্রধান চরিত্রকে বাদ দিয়া ভবিষ্যতের পাঠক ঐ গ্রাম্য মোড়লটার প্রতি এত একাত্মতা অনুভব করিবে। আমার তো মনে হয়, না বুঝিতে পারিয়া ভালই হইয়াছে। অনিপুণ কবির দৃষ্টি এদিকে পড়িলে তাহাকে দ্বিতীয় একটা কালকেতু করিয়া তুলিত। পিতৃ-পরিত্যক্ত কর্ডেলিয়া যেমন লিয়ারের বিপদে সহায় হইয়াছিল, কবির এই ত্যাজ্যপুত্রও তেমনি মুকুন্দরামকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যে-সমাজে কবি সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহা ছিল গ্রাম্য; সে সমাজ আনন্দ পাইত কালকেতুর মত বিকট একটা বিদূষক-বীরের কল্পনায়; তাহা আসরের প্রান্তবর্তী ভাঁড়ুকে লক্ষ্য না করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছে। ভাঁড়ুর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িলে শনিদৃষ্টি-ভস্ম গণেশ-মস্তকের ন্যায় ভাঁড়ুর দুর্দশার একশেষ হইত। কাব্য যে কবির একার সৃষ্টি নয়, সমাজ যে তাহাতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে কালকেতুর বিকৃতি ও ভাঁড়ুর নিষ্কৃতিতে তাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

হীরামালিনী ভারতচন্দ্রের সচেতন কল্পনার সৃষ্টি। মুকুন্দরামের মত ভারতচন্দ্রও পাঠক-নিরপেক্ষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার আদর্শ, রুচি ও ফরমাইস খানিকটা পরিমাণে তাঁহার লেখনীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজকুমারী বিদ্যার প্রতি স্বভাবতই রাজার লক্ষ্য ছিল, কাজেই বিদ্যাকে বাক্য ও বাহ্য অলঙ্কারে সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিতে কবি বাধ্য হইয়াছেন। রাজকুমার সুন্দরের প্রতিও রাজার দৃষ্টি থাকা স্বাভাবিক, কাজেই তাহাকেও রাজাদর্শোচিত করিয়া গড়িতে হইয়াছে। কাব্যের নায়ক ও নায়িকা সৌন্দর্য ও বিদ্যা; রাজসভার আদর্শ ইহার অপেক্ষা আর কি বেশী হইতে পারে। যে সুন্দর ও বিদ্যার সাক্ষাৎ আমরা ভারতচন্দ্রে পাই, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতে সেই জাতীয় সৌন্দর্য ও বিদ্যার চর্চাই হইত, গভীরতার অপেক্ষা নিপুণতা যাহাতে অধিক, আন্তরিকতার অপেক্ষা বাহ্যিকতা যাহাতে অধিক। এই সব দেখিয়া এক একবার মনে হয় কবি গল্পের উপলক্ষ্যে

রাজসভার রূপক লিখিয়া গিয়াছেন। এই রূপক একাধারে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রূপকথা এবং স্বরূপ কথা।

কিন্তু কবি একস্থানে স্বাধীন ছিলেন, অপ্রধান চরিত্রের মহলে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হীরামালিনী। এখানে কবির প্রতিভা অপ্রতিহতভাবে লীলা করিবার সুযোগ পাইয়াছে, এবং তাহার ফল প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত নারী-চরিত্র। হীরা ভাঁড়ু দত্ত দুজনেই জীবিত, বাংলা দেশের পথে ঘাটে আজো তাহাদের দেখা পাওয়া যায়। অনেক সময় ভাবিয়াছি যদি পথের মোড়ে হীরার সহিত ভাঁড়ুর দেখা হয়, তবে কেমন হয়। যাহাই হোক হীরার তীক্ষ্ণ, মার্জিত ব্যঙ্গবাণে দুর্ধর্ষ ভাঁড়ুকে যে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার ভাষায়। এমন মার্জিত, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোজ্জ্বল ভাষা, প্রাচীন সাহিত্যে তো দূরের কথা বর্তমান সাহিত্যেও বিরল। আজ যে ভাষায় বাংলা কাব্য লিখিত হয়, তাহার পূর্বধ্বনি পাই ভারতচন্দ্রে। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে একশত বৎসরের অব্যবহারে তাঁহার ভাষা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বরগুপ্তের ভাষাতেও ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে, কিন্তু রায়গুণাকরের তুলনায় নিতান্ত গ্রাম্য। তীক্ষ্ণ বাণে ও সম্মার্জনীতে যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের ভাষার। ভারতচন্দ্রের ভাষার urbanity ঈশ্বর গুপ্তে নাই। এই urbanity আধুনিক যুগে প্রথমবারের জন্যে পাই মধুসূদনের রচনায়।

ভাষার এই গুণের তিনটি কারণ। প্রথমত, ভারতচন্দ্রের সময়ে ভাষার স্বাভাবিক পরিণাম অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতচন্দ্র যে ভাষায় কাব্য লিখিয়াছিলেন তাহা বাংলার গ্রাম্য অঞ্চলের ভাষা নহে। এখনকার দিনে যেমন কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান, তখনকার কালে তেমনি বিদ্যা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ নবদ্বীপ ও তাহাদের পারিপার্শ্বিক। সৌভাগ্যক্রমে বাংলার urban অঞ্চলে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কবি কাব্যরচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই জন্যে যে এমনটি হইবার কথা নহে। ভারতচন্দ্র বর্ধমানের লোক, ঘটনাক্রমে তাঁহাকে নবদ্বীপে টানিয়া না আনিলে তিনি উন্নততর ঘনরাম চক্রবর্তী হইয়া থাকিতেন, অন্নদামঙ্গলের সৃষ্টি হইত না। তৃতীয় ও সর্বপ্রধান কারণ কবির স্বকীয় প্রতিভা। যে প্রতিভার তাপে ভাব ভাষা একীভূত হইয়া গিয়া দিব্য বাণীমূর্তির সৃষ্টি করে,

ভারতচন্দ্রে তাহা অপর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সেই শক্তির মাহাত্ম্যে তিনি তৎকালীন কাব্য-পিপাসা মিটাইয়াও এমন ভাষা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন যাহা পরবর্তীকালেও মানুষের সৌন্দর্যবোধকে নন্দিত করে।

তাঁহার ভাষার প্রধান গুণ তাহা মডার্ণ। প্রাচীন বাংলার অন্য কোন কবি সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। বৈষ্ণব পদাবলী মুখে মুখে রূপান্তরিত হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধেও একই কথা, কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে এ প্রশ্ন চলে না ; কিন্তু অন্য কবির ভাষাকে আমরা মডার্ণ বলিতে পারি না।

—এ ভাষা যে মডার্ণ তাহার প্রধান প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে ইহার পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর গুপ্ত একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কালের দোষে ও শক্তির অভাবে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ মার্জিত স্বল্পাক্ষর গদ্যে ভারতচন্দ্রেরই পদ্যের ভাষার যেন দূর প্রতিধ্বনি। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে যুগ, প্রধানত তাহা সৃষ্টির যুগ। সৃষ্টির যুগের পরে সমালোচনার যুগ, satire সমালোচনার সগোত্র, ভারতচন্দ্র প্রধানত রোমাণ্টিক satirist। কাজেই বাংলা সাহিত্যে যে-যুগটা আসন্ন, সে যুগের প্রধান লক্ষণ হইবে সমালোচনা, satire এবং বাংলাদেশের প্রাণধর্ম অনুসারে রোমাণ্টিক satire। ভারতচন্দ্রের ভাষার পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। একজন বড় কবি যে ভাষার সৃষ্টি করেন, কিছুদিন ধরিয়া তাহার অনুবৃত্তি চলে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ভাষারই অনুবৃর্ত্তি ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফলে ভারতচন্দ্রের ভাষার যথেষ্ট অনুবৃত্তি হয় নাই। তারপরে ভারতচন্দ্র সামাজিক যে অনিশ্চয়তা ও নাস্তিকতার মধ্যে বাঁচিয়াছিলেন আমাদের সময়টাও নানা কারণে অনেকটা সেই রকমের। এই অনিশ্চয়তার, অবিশ্বাসের; নাস্তিকতার সাহিত্যিক পরিণাম satire এবং বাংলা সাহিত্যে ইহার একমাত্র আদর্শ ভারতচন্দ্র। কাজেই প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পরে এই যুগটাতে ভারতচন্দ্রের পুনরাবির্ভাব আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

# আধুনিক সাহিত্য

গোপাল হালদার

'আধুনিক সাহিত্য' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গোড়াতেই প্রশ্ন ওঠে, 'আধুনিক সাহিত্য' বল্‌তে সত্যই কিছু আছে কি? তা কি পুরনো সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র? কি অর্থে স্বতন্ত্র?

আলোচনায় অগ্রসর হবার আগেই বোধ হয় দু'একটা কথা বুঝে নেওয়া ভালো। প্রথমত, সাহিত্য অনেকাংশেই মানুষের মনের সৃষ্টি, মানস-ক্রিয়া; অবশ্য কোন মানস-ক্রিয়াই একমাত্র মানস-জাত নয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মনের ফসল বলেই সাহিত্যের এমন মাপকাঠি পাওয়া শক্ত যা সবাই মেনে নেবে। বহির্জগতের জিনিসপত্রের দাম ঠিক করা অপেক্ষাকৃত সহজ। তারও বাজার অবশ্য ওঠে নামে, তবু মোটের উপর তা নিয়ে আমাদের কেনাবেচা করতে হয়, আমরা তার একটা ব্যবহারিক হিসাব পাই। কিন্তু যে জিনিস প্রধানত মনের সৃষ্টি তার সম্বন্ধে তেমন মাপকাঠি আমাদের হাতে নেই। এমন কি, সাহিত্যের কোনো ব্যবহারিক মূল্য আছে কি না তাও প্রত্যক্ষ বোঝা যায় না। কারণ, সাহিত্যের মূল্য হচ্ছে মনের কাছে; অন্তরাবেগের কাছেই মুখ্যভাবে, তবে যুক্তির কাছেও গৌণভাবে। এইসব জটিল কারণে সাহিত্যের সর্বস্বীকৃত মানদণ্ড বড় নেই। নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড অবশ্য বারে বারে গড়ে উঠে, কিন্তু কালে কালে তা বদলায়। তাই এক-এক সমাজে, এক-এক শ্রেণীতে সাহিত্য-বিচার এক-এক রূপ। এমন কি যাঁরা মোটামুটি একই দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে সাহিত্য আলোচনা করেন, একই জীবন-দর্শন যাঁদের জীবনের অবলম্বন, অনেক সময় দেখি, তাঁরাও সাহিত্যক্ষেত্রে এক মাপকাঠিতে বিচার করতে পারছেন না। তাই সাহিত্যের বিচারে যাঁদের মনের মিল আছে তাঁদেরও দেখা যায় বিশেষ-বিশেষ সৃষ্টির মূল্য সম্বন্ধে মতের মিল ঘট্‌ছে না। তাছাড়া, সাহিত্যেও বাজার দর তো সর্বদাই ওঠে নামে। যা তবু বাজার-দরের ব্যাপারেও মনে রাখা দরকার তা এই: প্রথমত, ব্যবহার্য পণ্যের বাজার-দরের সঙ্গে মূল্যের সাধারণত একটা

সম্পর্ক থাকে,—দর জিনিসটা সব সময়েই একেবারে খামখেয়ালি নয়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের মনের মূল্যবোধ আমাদের দশ জনের আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই, দশটি মনের আদান প্রদানের ফলে আবার প্রত্যেকের নিজের নিকট স্থির হয়ে উঠে।

গোড়ার কথাটা তা'ই এই: সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনায় ব্যক্তিমনের গুণাগুণের ছাপ লেগে যেতে পারে; তাই এখনো কোনো বিচার চরম বিচার বলে গণ্য নয়। আসলে 'চরম বিচার' বলে কিছু নেইও, আছে একটা আপেক্ষিক মূল্যনির্ধারণ। আর এই আপেক্ষিক মূল্যও গড়ে ওঠে, স্থির হয়ে আসে, এমনি নানা মনের নানা ধারার বিচার-বিশ্লেষণের ফলে।

## আলোচনার দৃষ্টিক্ষেত্র

দ্বিতীয় কথাটি এই, সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা নানা দিক থেকে চলে। এক-এক কালে এক-এক দিকে তার রেওয়াজ বেড়ে যায়; যে কালের যেমন জীবনাদর্শ সে কালের বিচারও হয় মোটের উপর সে ধারায়। কিন্তু কাল বদল হয়, জীবনাদর্শ বদলে যায়, ফলে সাহিত্যাদর্শও তেমনি বদলে যায়। আমাদের দেশে দশ বৎসর আগে পর্যন্ত (প্রায় ১৯৩৯ ইং) যে বিচার একচ্ছত্র ছিল সে হল 'রসের বিচার' অথবা 'আর্টের হিসাব'। আজ সে বিচারকে একান্ত করে হয়ত অনেকে মান্‌তে চায় না। অনেকে 'ঐতিহাসিক বিচারের' পক্ষপাতী। কিন্তু 'ঐতিহাসিক বিচার' বলতে যে সবাই আমরা এক কথা বুঝি তাও নয়। 'ঐতিহাসিক' কথাটির অর্থ এক্ষেত্রে অনেকেই ধরেন "কালানুক্রমিক" বলে, অনেকেই বলেন "বাস্তব"। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার শুধু জড় বস্তুর কালানুক্রমিক হিসাব নয় তাও আমরা অনেকেই মানি। ইতিহাসে আমরা কি দেখি? ইতিহাসের মধ্যে আমরা দেখেছি চেতনাচেতনের সংঘাত, বিকাশ, জীবনের অভিযান। এ চক্ষে মানুষের সৃষ্টিকে দেখে অনেকেই আমরা আজ সাহিত্যের বিচার করি জীবন-বাণী হিসাবে। এ অর্থে আমরা সাহিত্যকে "জীবনের শুধু মুকুর" হিসাবেও দেখি না। জীবন সাহিত্যের মধ্যে মুকুরিত তো হয়ই, তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু সাহিত্যের থেকে জীবনও সংগ্রহ করে উপজীব্য, পরিণতির প্রেরণা, বিকাশের আভাস। সত্যই তাই সাহিত্যের একটা বড় রকমের ব্যবহারিক মূল্য আছে। **Life-ই literature**কে মূলত

**create** করে, আর এই শেষের অর্থে **literature**ও আবার **create** করে **life**কে, অন্তত **great literature** তা'ই করে।

কাজেই সাহিত্যকে আমরা এরূপ নানা দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে দেখি বলে আলোচনা এত ভিন্নমুখী হয়। সব ক্ষেত্র থেকেই হয়ত তার একটা মুখ দেখা যায়। কিন্তু যা তার 'দক্ষিণ মুখ'—যে মুখে তার জীবনের বাণী উচ্চারিত হয়—সে মুখ থেকে দেখলেই আমরা পাই পরিত্রাণ। মোটামুটি একালে আমরা সাহিত্যের সে মুখই দেখতে চাই, সাহিত্যকে বুঝতে চাই জীবন-দর্শন হিসাবে, সৃষ্টি হিসাবে এবং নবতর সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে।

'আধুনিক সাহিত্য'ও তা'ই এই আধুনিক কালের সৃষ্টি, এ-কালের জীবন-দর্শন ; আবার নতুন কালের সৃষ্টিরও প্রেরণা, তার জীবন-দর্শনেরও প্রস্তাবনা।

আধুনিক সাহিত্য অবশ্য কাল হিসাবে আধুনিক। কিন্তু শুধু এ বললে সে কথার কোনো মানে হয় না। 'অধুনা' বলব কোন কালকে ? কখন থেকে তার শুরু ? কি তার জীবন-ক্ষেত্র, কি তার জন্ম-লক্ষণ, আর কি-ই বা তার জীবন-লক্ষণ ? এবং সে কাল কি একেবারে স্থির অচল হয়ে আছে ? এসব প্রশ্নও মনে উঠবেই।

**জন্ম-চিহ্ন**

তবু মোটের উপর কাল হিসাবে আধুনিক ও পুরাতন সাহিত্যের এরূপ ভাগ একেবারে মিথ্যা নয়। আমরা মধ্যযুগের যে-কোনো সাহিত্য হাতে নিলেই বুঝি তা একালের নয়। আর সত্যই আধুনিক কোনো সাহিত্য হাতে নিলেও বুঝি পূর্বযুগে তা লেখা হতে পারত না। ধরুন ভারতচন্দ্র—মাত্র সেদিনকার লোক তিনি আমাদের দেশে ; আর খুব বেশি রকমের কলাকুশল কবি, তা'ই তাঁকে নিচ্ছি। আমরা বেশ বুঝতে পারি—যত লিপি-কুশলতা থাক্ তাঁর লেখায়, তা আধুনিক কবিতা নয়। অন্য দিকে নিই আজকের কবিদের—ধরুন নজরুল, বুঝতে পারি এ কবিতা এদেশে মাইকেল-রবীন্দ্রনাথের পূর্বে লেখা হতে পারত না। অথবা ধরুন—সংস্কৃত মহাভারতের আখ্যায়িকা, বা কাশীদাসের লেখা কর্ণের সঙ্গে কুন্তীর সাক্ষাৎ আর আমাদের একালের "কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ"। একই গল্প, কিন্তু পড়েই আমরা বুঝি এই শেষ কবিতা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে লেখা হতে পারে না—এমন কি, রবীন্দ্রনাথ

ছাড়াও আর কেউ তা লিখতে পারেন না। অথচ গল্প তা সেই একই। কিভাবে আমরা তা বুঝতে পারি, তা'ই ভেবে দেখবার মত।

অনেক ছোটখাটো 'জন্ম-চিহ্ন' থাকে প্রত্যেক লেখার গায়ে, তা দিয়ে তাদের কাল ঠিক পাওয়া যায়। সে সবকে মিলিয়ে আমরা বলতে পারি "যুগধর্ম"। বোধ হয় তার থেকে আরও যথার্থ নাম হয় 'পরিবেশের ধর্ম'। মানে, দেশ-কালের যৌগিক ছাপ, শুধু যুগের একান্ত ছাপ নয়, পারিপার্শ্বিকের ছাপ—পরিবারের এবং পরিবেশের গুণাগুণ। প্রত্যেক লেখাতেই এসব কম বেশি থাকে। যাকে আমরা বলি কবির 'নিজস্ব বৈশিষ্ট্য' তারও হু'টি দিক্ আছে—এক দিকে তা কাল থেকে কবির সংগ্রহ, আর দিকে তা কালকে কবির যোগানো।

## বিষয়বস্তু ও রূপ

এই "ছাপ" জিনিসটিকে বিশ্লেষণ করলে মোটের উপর তার হু'টি দিক্ দেখতে পাই। এক, বিষয়-বস্তুর বা **Content** এর দিক্, দুই, প্রকাশের, রূপায়ণের বা **Form** এর দিক্। এ দু'টি কিন্তু পরস্পর নিঃসম্পর্কিত বিচ্ছিন্ন দিক নয়। বিষয়বস্তু আর প্রকাশ-কলা দু'য়ে মিলে সাহিত্য একটি অখণ্ড সৃষ্টি হয়ে ওঠে বলেই সাহিত্য গ্রাহ্য হয়। খুব একটা মোটা তুলনা দিলে বলা যায়, দেহ আর মন দু'য়ে মিলেই যেমন মানুষ, এও তেমনি একটা আরটার থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই, এমন কি, দু'য়ের সমন্বয় না হলে সাহিত্যে কোনোটারই বিশেষ কোনো মূল্য থাকে না। যে রচনায় এ দু'য়ের সুসঙ্গতি ঘটে তা অখণ্ড হয়, সৃষ্টি হয়; যাতে এ সঙ্গতি যত কম তা 'সৃষ্টি' হিসাবে তত কম সার্থক। আমরা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই শুধু এদের স্বতন্ত্র করে নিতে পারি। সৃষ্টির মধ্যে বিষয়-বস্তু আর প্রকাশ-কলার তেমন দ্বৈত অস্তিত্ব থাকা নিয়ম নয়।

অবশ্য বলা বাহুল্য, বিশ্লেষণের দিক্ থেকেও এ হল সাহিত্যের খুব মোটা রকমের ভাগ। কারণ বিষয়বস্তুকেও আবার অন্তত দু'দিক্ থেকে দেখা যেতে পারে: এক, কথা-বস্তু হিসাবে, দুই, ভাব-বস্তু হিসাবে। তাজমহলের কথা-বস্তু তো তাজমহল ও সাজাহান, কিন্তু ভাববস্তু হয়ে উঠল বিচিত্র আর মহৎ—তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহৎ, জীবনের রথ তোমাকে নিয়ে ছুটল লোক-লোকান্তরে। শকুন্তলার বিষয়বস্তু মহাভারতে আছে; তা'ই মূলত কালিদাসের গল্পাংশ। কিন্তু মহাভারতের ও সেই নাটকের ভাব-বস্তুতে কি তফাৎ ঘটেনি?

তার পক্ষে কালিদাসের আর বেদব্যাসের বিষয়বস্তু কি আর এক বলা সম্ভব ? উপনিষদ, বৌদ্ধ কাহিনী ও শিখ-গুরুদের কাহিনী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন। তাঁর প্রকাশ-কলা যে একেবারে স্বতন্ত্র তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁর ভাববস্তুই কি আর সম্পূর্ণ পূর্ববৎ আছে ? আবার কথাবস্তু স্বতন্ত্র হলেও ভাববস্তু যে মোটের উপর একরূপ হতে পারে তাও আমরা জানি। আসলে এই ভাববস্তুই হল আইডিয়ার দিক্, বাণীর দিক্, message এর দিক্। আর যেখানে সৃষ্টিতে তা রূপান্বিত হয় না, সেখানে এ ভাববস্তু তত্ত্ব মাত্র থেকে যায়, সত্য হয়ে ওঠে না। সত্য হয় প্রকাশে ও রূপায়ণে, সার্থক হয় 'অর্থ' লাভ করলে। এই অর্থেই লেখার আসল মূল্য—তার significance বা তাৎপর্য।

এ জন্যই আবার প্রকাশের বা রূপের দিক্ থেকে বিশ্লেষণ করলে কেউ কেউ সাহিত্যকে শুধু 'আর্ট' বলে সিদ্ধান্ত করেন ; বলেন রূপকলা বা প্রকাশকলাই হল সৃষ্টির আসল রহস্য। এই রূপকলাকে আবার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তারও নানা দিক্ আছে—রীতি বা ষ্টাইল, আঙ্গিক ( টেক্‌নিক্ ), অলঙ্কারভঙ্গি। নানা কলাকৌশলের দিকে ক্রমে দৃষ্টি পড়ে। ওসব জিনিসে পাঠকের দৃষ্টি বরং সহজেই পড়ে,—আর দৃষ্টি-বিভ্রমও তাতে ঘটে। সংস্কৃতের সাহিত্য-শাস্ত্রীরা রসশাস্ত্র নিয়ে মেতে যেমন ভাববস্তুর নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করেছেন, অন্য দিকে আবার অলঙ্কারশাস্ত্র নিয়েও তেমনি বাড়াবাড়ি করেছেন। সে-সবে তাঁদের বুদ্ধির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। এবং শুধু বিশ্লেষণে যে সাহিত্যের সত্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় অথচ সাহিত্যের মূল সত্যও ধরা পড়ে না, সেই বিশ্লেষণে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আসলে যা মনে রাখবার মত কথা তা এই : 'শারীর-তত্ত্ব জানা থাক্‌লে মানুষকে বুঝতে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু শুধু সে সব তত্ত্ব মিলিয়ে মানুষের শরীর গঠন করা যায় না, প্রাণ তো পাওয়া যায়ই না, মনও ফাঁকি দেয়। দেহ-মনের বিচিত্র লীলাতেই জীবন ; তা'ই সাহিত্যের বস্তু, তাতেই সৌন্দর্য—সে জীবন অর্থ-অলঙ্কারময়, 'শুধু দেহ নয়, শুধু মনও নয়।' তবু সেই জীবন-রহস্যকে আরও ভালো করে চিনবার জন্যই দেহের কথা, মনের কথা, সব কথা বোঝা চাই।

## পরিবর্তিত মূল্যবোধ

কিন্তু কথা এই—এই বিষয়বস্তু ও রূপ দুই-ই আবার কাল থেকে কালে বদলায়। এবং আধুনিক সাহিত্যের ও পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে

বিশেষ ছাপ দেখি তা এই দুই দিকেও বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা যায়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু বদলেছে আর রূপায়ণের পদ্ধতিও বদলেছে। আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু কত বিচিত্র তার ঠিক ঠিকানা নেই। কারণ সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের প্রসার বেড়ে গিয়েছে। আর, আধুনিক সাহিত্যের শুধু নানা বিভাগগুলোর দিকে তাকালেও বোঝা যায় যে আধুনিক সাহিত্য এই সহস্রমুখী জীবনকে প্রকাশ করবার জন্য কত বিচিত্র পথের আশ্রয় নিয়েছে—সেকালের মহাকাব্য খণ্ডকাব্যের জায়গায় এসেছে গদ্য ও পদ্যের কত বিচিত্র ধারা; আর তারও পরে কত অদ্ভুত নিত্য নূতন ছন্দ, রীতি, টেক্‌নিক্, তার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি। অবশ্য পুরনো যা তা সমূলে বাতিল হয়ে গিয়েছে, এমন কথা বলা ঠিক নয়। তবে তার অনেকাংশ আজ আর চল্‌তে পারে না। মানুষ এখনো দেব-দেবীকে মানে, কিন্তু তাই বলে চণ্ডীমঙ্গল আর তেমন করে সে লিখ্‌বে না। কালকেতুর কাহিনীর ভাববস্তু অচল এখনো হয়নি—মানুষের দুঃখ-বেদনা নিয়তি এখনো লেখা হচ্ছে গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে; কিন্তু মঙ্গলকাব্য আর লেখা হয় না। সেই কথাবস্তু একেবারে বদলেছে, সেই প্রকাশ-পদ্ধতিও একেবারে বদলেছে—যদিও সে তুলনায় ভাববস্তু বদলেছে কম।

## মানুষের মূল্য

সাহিত্যের ভাববস্তুও যে নিতান্ত কম বদলেছে তা নয়। আমাদের দেশের দৃষ্টান্তই ধরা যাক্। দেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, অকালে মানুষ মরছে; প্রজারঞ্জক রাজা শ্রীরামচন্দ্র বুঝছেন তার কারণ শূদ্র বেদপাঠ করছে। অতএব শম্বুকের শিরশ্ছেদ হল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে শূদ্রের বেদ পাঠের সম্পর্ক আজ আমরা মানি না; কারণ মানুষের মর্যাদা খানিকটা আজ আমরা বুঝি। উত্তর বিহারের ভূমিকম্পের কারণ হিন্দুদের হরিজনদের প্রতি অবজ্ঞা, গান্ধীজী এ কথা বললেও আমরা কুণ্ঠিত হই :—এ রকম 'পাপে' ও রকম 'দণ্ড' হয় তা আমরা মান্‌তে পারি না। তবু পুরনো দিনে হয়ত মানুষ তাই মানত। ধূমকেতু উঠলে রাষ্ট্রবিপ্লব হবে, এ তারা মানত;—এখনো আমরাই কি 'চেতাবনি' মানি না? যাই হোক্ কথাটা এই : একদিন শম্বুকের শিরশ্ছেদে সাহিত্যিক দেখেছেন রাজার সুবিচারের চমৎকার প্রমাণ। একশ' বছর আগেও আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ

নিশ্চয় এ চক্ষেই দেখতেন সে কাহিনী। কিন্তু আজ আমরা তাতে দেখছি রাজশক্তির এবং উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের একটা মূঢ় অবিচারের প্রমাণ। কারণ মোটামুটি **man's man for a that.**

মানুষের মর্যাদা, একথাটা আজ অনেক ক্ষেত্রে আমাদের নিকট প্রায় স্বতঃসিদ্ধ; তবু তা 'একান্ত' বা 'চরম' সত্য হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। সর্বক্ষেত্রে সর্বরূপে মানুষকে আমরা এখনো মর্যাদা দিই না—এখনো সাত কোটি অচ্ছুত রয়েছে। আর অচ্ছুত ছাড়াও প্রায় সব দেশেই এখনো চাষি-মজুরের সমাজ আর ভদ্রলোকের সমাজ স্বতন্ত্র। তাছাড়া, কথাটা সরলভাবে বলা হলেও আজকের সমাজের এটা মোক্ষম কথা—মুটে-মজুর চাকর-পিয়াদা ওদের পনের টাকা মাইনে ও পিঁপড়ের আহারই যথেষ্ট, আর মন্ত্রী উজীর এঁদের পনের শ' টাকা আর হাতীর খোরাক না হলে চলবে কেন? এ কথার মানে, সব মানুষ মানুষ নয়, কেউ পিঁপড়ে-জাতের মানুষ, কেউ হাতী-জাতের মানুষ। তবু মোটের উপর বেদ-পাঠক শূদ্রদের জন্য শিরশ্ছেদ বা তপ্ত শলাকার ব্যবস্থা করলে আমরা অনেকেই তা সইব না। কারণ, হাজার হোক্ মানুষ মানুষ, এ ও আমরা আজ মানি।

অর্থাৎ এদিকে আমাদের মূল্যবোধ আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মূল্যবোধ থেকে বেশ স্বতন্ত্র। পুরনো মূল্যবোধ বদলে গিয়েছে। আর এদিকের এই বিশেষ পরিবর্তন একটু মৌলিক—তা শুধু সামান্য আচারগত বা আচরণগত পরিবর্তন নয়। এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে দেব-দেবী ও আগেকার ধর্মাধর্মের বোধ সাহিত্যে গৌণ হয়েছে—সাহিত্যে প্রধান হয়েছে মানুষ—পৃথিবী আর জীবন।

**আধুনিক সাহিত্য মানুষের সাহিত্য**—এই হল আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে প্রধান কথা। মানব-সত্য নিয়েই আধুনিক সাহিত্য।

## ব্যক্তিত্বের মূল্য

মানুষের সম্বন্ধে আমাদের মূল্যবোধ ক্রমশঃ আধুনিক যুগে গভীর ও নিগূঢ় হচ্ছে। রামায়ণের আর একটি দৃষ্টান্ত নিই। কারণ, রামায়ণ অমর সাহিত্য—আদর্শ রাজা শ্রীরামচন্দ্র। কী আশ্চর্য তাঁর পত্নীপ্রেম। পিতা যাঁর সাড়ে সাত শত বিবাহ করেছিলেন সেই রাজা এক পত্নীর বেশি দ্বিতীয় পত্নী-গ্রহণ করলেন না। এমন কি, পত্নীকে বনবাস দিতে হলে স্বর্ণ-সীতা নিয়ে অশ্বমেধ

যত্ন করলেন, তবু দ্বিতীয় মহিষী গ্রহণ করলেন না। বলতে হবে, এরূপ একনিষ্ঠ প্রেম সে যুগে অসাধারণ। কেমন করে, সে কালের কবির চক্ষে এ আদর্শ স্পষ্ট হয়েছিল, কে জানে। কিন্তু এ আদর্শের থেকেও সেই রামচন্দ্রের পক্ষে আরও বড় আদর্শ ছিল—তাই বিনা দোষেও তিনি সীতাকে বনবাস দিলেন প্রজানুরঞ্জনের জন্য। রাজার উপযুক্ত কাজ হয়েছে, এ দেশের সবাই বলবে। কিন্তু আজ আমরা কেউ কেউ তাতেও নিজেদের সংশয় প্রকাশ করতে পারি—মানুষের উপযুক্ত কাজ করেছিলেন কি শ্রীরামচন্দ্র? নিজের প্রেম, সীতার প্রেম এ সব কি রাজার রাজত্ব বা রাজকর্তব্যের থেকে তুচ্ছ? অন্তরের ভালবাসাকে বাইরের সমাজের (অযৌক্তিক) দাবীর কাছে বলি দেওয়াই কি সত্যধর্ম? রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সমস্ত ভারটা এরূপ ক্ষেত্রে কোন্ দিকে পড়ছে, তা আমরা জানি। আজ শ্রীরামচন্দ্রের প্রজারঞ্জনে আমাদের আর তত অবিচলিত আস্থা নেই। আমরা ব্যক্তির অধিকারও আজ মানি; রাজত্বের থেকে ভালোবাসা কম নয় বলে জানি। তা'ই ডিউক অব উইণ্ডসরের অন্যপূর্বা-রমণীর জন্য সিংহাসন ত্যাগকেও নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে করি না। আজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে ব্যক্তির অধিকার আমাদের নিকট শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে উঠেছে। আমরা কি সুস্থিরভাবে আজ বল্‌তে পারি—কে বেশী সমর্থনযোগ্য, পত্নীত্যাগী শ্রীরামচন্দ্র, না সিংহাসন-ত্যাগী উইণ্ডসর? অবশ্য একটা কথা,—আজই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিকট ব্যক্তির দাবীর সীমাটাও আবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে—ব্যক্তির দাবী আবার সমাজ প্রগতির অনুযায়ী হয়ে না উঠ্‌লে আমাদের চোখে সংশয়ের বস্তু হয়ে পড়েছে—আমরা একথাও মান্‌ছি, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। অর্থাৎ এই বিংশ-শতকে এসে আমরা ক্রমেই আবার নূতন ধারায় সমাজ-সচেতনও হয়ে উঠছি। কাজেই ব্যক্তির 'অন্তরের দাবী'কে তেমন সব ক্ষেত্রে এক তরফা ডিক্রী আর দিতে পারছি না। এ বোধ অবশ্য অনেক সমাজেই এখনো ঝাপসা; ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনাই প্রচলিত বাজারে 'তেজী' চল্‌ছে। মোটের উপর আমরা বুঝ্‌ছি ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তি-স্বরূপের দাবী একটা বড় সত্য—ব্যক্তির আত্ম-বিলোপ চরম কিছুই নয়।

পুরনো সাহিত্যের তুলনায় আজ এদিকে আমাদের আধুনিক সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত প্রেম-ভালোবাসার মূল্য অনেক বেশি। এ মূল্য

পরিবর্তন কেবল একই আদর্শের উনিশ-বিশে ওঠানামা মাত্র নয়। এতবড় পরিমাণগত এই পরিবর্তন যে একেও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং মৌলিক পরিবর্তন বলে মানতেই হবে।

## "বিপ্লবী-নিয়তির" স্বীকৃতি

এমনি আরও নূতন মূল্যবোধও আধুনিক সাহিত্য উকি-ঝুঁকি মারছে—হয়ত এখনো তা দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। অন্তত মানুষের মূল্য এবং ব্যক্তিত্বের মূল্যের মত সে মূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্বীকার্য হয়ে ওঠেনি। যেমন, পুরনো সাহিত্যে দেখি মানুষ যত বড়ই হোক্ সে ভাগ্যের দাস। বিশ্বকর্মা নূতন পৃথিবী গড়বার স্পর্ধা করে, এটা মানুষের নিকট সে-দিন ঠেকেছিল ভয়ঙ্কর ও হাস্যকর। তবু, একমাত্র দেবদেবীর খেয়াল-খুশীর উপর মানুষের ক্রমেই অনাস্থা এসে গেছল। অপ্রাকৃতে অবিশ্বাস আসছিল; কিন্তু নিজের শক্তিতে আস্থা পুরোপুরি আসছিল না। এখনো কি তা এসেছে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ দেখে মানব-ভাগ্য সম্বন্ধে আরও নিরাশা আমাদের চেপে ধরছে—এটোম বোমা দেখে আজ আমাদের ভীতি ও নিরাশা বেড়ে গেছে। কিন্তু পুরনো কালের স্বর্গ, পরকাল, বিধিলিপি, প্রাকৃতিক নীতি, "নিয়তি-নিয়ম" প্রভৃতি ধারণার জায়গায় ক্রমেই এসেছে ইহজন্ম ও নর-জীবনের প্রতি আস্থা, প্রাকৃতিক নির্বাচনের "বিশ্বলীলা", "বিশ্বরহস্যের" ধারণা। অর্থাৎ বুঝেছি মানুষ নিষ্ক্রিয় নেই, সক্রিয়ই; তবে সেই খেলার নিয়ম তার সাধ্যাতীত।

এই ছিল এতদিনকার পরিচিত চিন্তা—"মানব-ভাগ্য" সম্বন্ধে। কিন্তু আজ আর-একটা চিন্তাও এরই সঙ্গে সঙ্গে উঁকি মারছে—মানুষ তার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে প্রকৃতির নিয়মকে যত বুঝছে তত প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এমন কি মানব-প্রকৃতিকেও সে করতে পারে পরিবর্তিত, বিকশিত আর প্রকাশিত। মানুষের এই "বিপ্লবী-নিয়তি" হচ্ছে মানুষের আধুনিকতম আবিষ্কার। ক্রমশই মানুষ বুঝছে সে সৃষ্টির অধিকারী, নতুন নতুন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সে সৃষ্টির দুয়ার খুলে দিচ্ছে চিরকাল। এই যে মানুষের অফুরন্ত সৃষ্টিশক্তিতে বিশ্বাস, প্রকৃতির মহারাজ্যে মানুষের অভাবনীয় সম্ভাব্যতায় আস্থা, আর মানুষের এই বিপ্লবী ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ—নিজের সম্বন্ধে মানুষের এই মূল্যবোধ,—আজও মানুষের ইতিহাসে তা নতুন,—তবু এইটিও আধুনিক সাহিত্যে আমরা দেখেছি, এখন ফুটে উঠছে।

কিন্তু প্রশ্ন হবে পুরনো সাহিত্যে কি এসবের কোন চিহ্ন পাই? আমরা গ্রীক্ নাটকের ও সেক্সপীয়রের লেখা—What a piece of work is man থেকে, আরও এখানকার ওখানকার সাহিত্য থেকে কথা তুলে দেখাতে পারি মানুষ নিজের মহিমা আগেও উপলব্ধি করতে পারছিল। সে সব কথার স্থির তাৎপর্য পরে দেখব। কিন্তু এখানে যা আমাদের লক্ষণীয় তা এই—নিজেকে স্রষ্টারূপে, বিপ্লবী-শক্তির বাহকরূপে এই বিংশ শতাব্দীর পূর্বে মানুষ এমন স্পষ্ট করে ভাবতে সাহস করত না। সেরূপ ভাবনা ছিল তার তখনকার বিবেচনায় মূঢ়তা বা বিকৃত দম্ভ—বিশ্বকর্মার ও ফাউষ্টের দুর্বুদ্ধির কাহিনীই তার প্রমাণ। এ ধারণার ক্রমে পরিবর্তন হল। প্রথম এল রিনাইসেন্স—জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিস্ময়। তারপরে এল ফরাসী-বিপ্লবের শেষে "প্রোমিথিউস্ অনবাউণ্ডের" স্বপ্ন-যুগ এবং স্বপ্ন-ভঙ্গেরও যুগ; এল টেনিসন্—আর্নল্ডের যুগ; আর ওদিকে হুইট্‌ম্যান, এদিকে ব্রাউনিংএর নতুন আশাবাদ। সেটা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিজ্ঞানের বিজয়োৎসবের দিন। তার শেষে এল সন্ধ্যা, শেষে নিশীথ রাত্রি, ওয়েষ্টল্যাণ্ডের বর্তমান বিলাপ—প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই তার প্রারম্ভ, আজও তার শেষ হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে আবার মানুষের বিজয়ে নতুন আস্থা, তার বিপ্লবী শক্তির স্বীকৃতিও এসেছে—এই বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় পাদে।

**মানবতাবাদ**

আধুনিক, সাহিত্যে যে আধুনিক, তা, এইরূপে বুঝা যায় তার এই নতুন মূল্যবোধ থেকে। সেই সাহিত্যের বিষয় বা বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এতক্ষণ দেখছি; বুঝ্‌ছি তার মূল্যবোধ বদলেছে। অন্ততঃ তিনটি প্রধান দিকে মানুষের মূল্যবোধ আজ নতুন—যেমন, প্রথমত, নরমানুষের মর্যাদাবোধ; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি-সত্তার মুক্তি; আর মানুষের বিপ্লবীনিয়তিতে বিশ্বাস। অবশ্য এ তিনটি ছাড়া আরও অনেক নতুন বক্তব্য আমরা উল্লেখ করতে পারি। যেমন, নতুন সমাজসত্তা বা নতুন সঙ্ঘচেতনা (social egoতে বিশ্বাস), এমন কি নতুন বিশ্ব-মানবতাবাদ (internationalism), তেমনি নতুন 'জাতীয় আত্মবাদ' (national self), ইত্যাদি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখব, কম বেশি এ সবই এক-না-এক দিকে পূর্বকথিত ঐ তিনটি মূল সুরের বাদী-প্রতিবাদী সুর। অবশ্য আর একটি কথাও এদিকে লক্ষণীয়।

আসলে ইতিহাসের একটি কথাই এখানে পাই :—মূলতঃ স্ফিংক্সের প্রশ্নের যা উত্তর এ সাহিত্যেরও তা উত্তর, জীবন-রহস্যের সামনে ; সে উত্তর—"মানুষ"। অত্যন্ত পুরাতন এই কথা—কিন্তু আধুনিক সাহিত্যেরও প্রধান্ কথা এই "মানবতাবাদ"।

## প্রাচীন মানবতা-বোধ

কথা হবে, এ তো অতি-পুরাতন কথা। আমরা কি প্রাচীন সাহিত্যে এই মানবতাবাদ পাই না ? পশ্চিমদেশের কথা ভাবলে গ্রীকদের সাহিত্য ও শিল্পের কথা এখানে আমরা স্মরণ করব—স্মরণ করব প্রাচীন লাতিন ও ইতালীয়দের অনেকের কথা ; তারপর রিনাইসেন্স ও বোকাচিয়ো প্রভৃতি লেখকদের কথা। পরে আসেন মার্লো আর সেক্সপীয়র। পূর্বদেশে অন্যদের কথা ভালো জানি না, কিন্তু নিশ্চয়ই চীনা শিল্প ও সাহিত্য এ সম্পর্কে আমাদের মনে রাখা উচিত। তাতে সুরটা বেশ পার্থিব এবং সামাজিক, বিশেষত পারিবারিক। শেষে অবশ্য স্মরণ করব আমাদের নিজেদের শিল্প-সাহিত্যের কথা। আমরা বলি, আমরা কি মানুষের মর্যাদা কম করেছি ? দেবতাকে পর্যন্ত আমরা মানুষ করে তুলেছি। আমাদের অবতার শ্রীরামচন্দ্র ; তিনি পুত্রের রূপে, অগ্রজের রূপে, স্বামীর রূপে, রাজার রূপেও মানুষ হয়ে আমাদের মধ্যে গ্রাহ্য হলেন। আমাদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ; তিনিও শত সম্বন্ধেও মানবীয় সম্পর্ক নিয়ে মানুষ হয়ে আমাদের কল্পনায় আবির্ভূত হয়েছেন। শুধু বৈকুণ্ঠের তরে দেবতা তিনি নন, শুধু বৈকুণ্ঠের তরে "বৈষ্ণবের গান"ও নয়। বরং আমাদের মধ্যযুগের প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবির মুখেই প্রথম শুনেছি এই আশ্চর্য বাণী—

> "শুনহ মানুষ ভাই,
> সবার উপরে মানুষ সত্য—
> তাহার উপরে নাই।"

যত দূর জানি, পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে এ সত্য এমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বাণীরূপ লাভ করেনি—এ যুগেও লাভ করতে পারেনি। তাই প্রশ্ন হবে—তা হলে মানবতাবাদকে আমরা আধুনিক সাহিত্যের বিশেষ বাণী বলি কোন্ যুক্তিতে ? আর আধুনিক ও প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেই বা তফাং দেখি কিসের ?

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরই প্রথম বুঝে নিই। আমরা দেখেছি আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার বাণীতে আর তার রূপ রচনায়। কিন্তু যা সেই সঙ্গে স্মরণীয় তা এই : অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলবে যা কাল হিসাবে আধুনিক হয়েও এই দুই দিকেই আধুনিক নয়। এমন অনেক পুঁথি পাঁচালি এখনো রচিত হয় যাতে এই বৈশিষ্ট্য নেই, কিংবা থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত গৌণ। যেমন ষাট সত্তর বৎসর আগেকার এক এক জন আধুনিক কবিও আমাদের দেশে পুরনো চালে কবিতা লিখতেন—'কে তুমি রে বল পাখী' ইত্যাদি। এ রকম লাইন শুনলেই মনে হবে এ কবিতা আধুনিক নয়; তারও ষাট বৎসর আগেকার কীটসের নাইটেঙ্গলের তুলনায় তা কত সেকেলে—ভাবে এবং রূপে! অথচ যদি বলি—

"বেঁচে থাক' মুখুজ্জের পো !···একটি চালে
করলে বাজি মাৎ।"

তাহলে এ কালের অনেকের পক্ষে বলা শক্ত হবে এ কোনো জীবিত কবির রচনা না, পরলোকগত কবির রচনা। এই কবিতাংশ শুনেই মনে হয় 'আধুনিক'। কেন তা মনে হল ? কবিতাটি ভাবে ও ভাষায় অখণ্ড; কাজেই সর্বকালেই সার্থক। কিন্তু তার 'আধুনিকতা' বিশেষ করে এ জন্ত যে, প্রথমত, এর ভাববস্তু ও কথাবস্তু জীবন্ত—মানুষের কথা, মানুষী ভাষায় বলা। দ্বিতীয়ত, এর ছন্দ হচ্ছে ছড়ার ছন্দ, বাঙলা কথার জীবন-ছন্দ,—আশ্চর্য রকমের যা একালেরও ছন্দ। অর্থাৎ এ কবিতার প্রাণ হচ্ছে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য নয়, জীবন্ত সমাজের কথা, সাধারণ মানুষের ভাব ও ভাষা। কবি হেমচন্দ্র তাঁর বিদ্রূপের কবিতায় যত 'আধুনিক', 'বৃত্র-সংহারের' কবি এমন কি 'ভারত-ভিক্ষার' কবি হিসাবেও ততটা 'আধুনিক' নন। তেমনি যত বড় কবি হোন হেম-নবীন আমাদের চক্ষে মনে হয় 'মহিলা' কাব্যের কবি বা 'সারদামঙ্গলের' কবি তাঁদের অপেক্ষাও বেশি আধুনিক। ঐ হিসাবেই মাইকেল বাঙলা কাব্যের বিষয়বস্তুতে ও রূপায়ণে বিপ্লব আনেন; এবং আর এক দিকে বঙ্কিমে বাঙলা সাহিত্যের আধুনিকতার প্রারম্ভ।

নভেল প্রায় জন্মাবধি মানুষের কথা। মানুষের চরিত্র আর ঘটনা নভেলের প্রধান বস্তু। নভেল জন্মেছেও আধুনিক কালে—যখন থেকে মানুষ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য, বিশিষ্ট হয়ে উঠল। বঙ্কিম থেকে আমাদের সাহিত্যে সেই নভেল শুরু হল। বুঝতে পারি—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুণে আধুনিকতার এই প্রধান

বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমের কালে সর্বগ্রাহ্য হচ্ছিল। ঠিক এই কারণেই মুকুন্দরামের অঙ্কিত চণ্ডীমঙ্গলের মানুষগুলোকে দেখেও আমরা তৃপ্ত হই—বুঝি এ হচ্ছে চসার বোকাচিয়োর সগোত্র কবি, যাঁরা ছন্দে লিখেছেন কথাসাহিত্য, সৃষ্টি করেছেন চরিত্র, বুঝেছেন মানুষের বৈচিত্র্য। এরূপ আধুনিকতার স্বাক্ষর পাই আরও প্রাচীন সাহিত্যে, বিশেষ করে গ্রীক সাহিত্যে আর লাতিন সাহিত্যে। যে পরিমাণে সে সব লেখা এই মানবীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সে পরিমাণেই মনে হয় সে সব লেখা আমাদের স্বকালের, আধুনিক যুগের।

**'সহজ মানুষ ও মানবতাবাদ'**

কথা না বাড়িয়ে এই সূত্রেই আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখন বলতে পারি: সত্য বটে, মানুষ যখন থেকে নিজেকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র বলে জেনেছে তখন থেকেই তার সৃষ্টিতে তার মানব-চেতনার সাক্ষ্য মিলবে। তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে মানুষ নিজের শক্তির বা মর্যাদার খবর বুঝে উঠতে প্রায়ই পারেনি। তাই প্রাচীন যুগে সে নিজেকে প্রায়ই দেখেছে দেবতার ক্রীড়নক হিসাবে; জীবনের অর্থ তার কাছে অনেকাংশে গোচর হয়েছে দেবতার লীলা বলে। মোটামুটি আমাদের দেশের, এবং অন্য অধিকাংশ দেশেরও প্রাচীন সাহিত্যে তাই মানুষের কথা কীর্তিত হয়নি, হয়েছে দেবদেবীর কথা, ধর্মের কথা, পরলোকের কথা, অতি-প্রাকৃত শক্তির কথা; এবং অবশেষে মানুষের নামেও কীর্তিত হয়েছে দেবতার (শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির) মাহাত্ম্য। এটাই সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ,—এখনো তার জের বহু সাহিত্য থেকে লুপ্ত হয়নি। বাঙলা মঙ্গলকাব্যে এ জিনিসই প্রচণ্ড রকমে দেখি—ভাগ্য-তাড়িত মানুষ দেবতার মুখ চেয়ে আছে।

রামায়ণ মহাভারতেও এই দেবলীলাকে মানবভাগ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা দেখি। অবশ্য আমাদের মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যে দেখি—সেই অস্ফুট মানবতাবোধের আরও স্পষ্টতর প্রকাশ। তবু বোঝা উচিত, চণ্ডীদাস বা সহজিয়াদের "মানুষ" সবার উপরে সত্য বটে, কিন্তু কি হিসাবে সে সত্য? সমস্ত সুখদুঃখের অতীত মানুষ হিসাবে, সমাজ-সম্পর্কের অতীত সত্তা হিসাবে। অর্থাৎ পরমাত্মার স্বাক্ষর-স্বরূপ মানবাত্মা বলে—নির্গুণ নির্বিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব আত্মা হিসাবে। আধুনিক মানবতাবাদ কিন্তু এমন 'আধ্যাত্মিক" মানবতাবোধ নয়। আধুনিক মানুষের চোখে মানুষ সত্য মর-জগতের মানুষ হিসাবে,

আত্মার প্রতীক হিসাবে নয়; মানবীয় সম্পর্কের জন্যই বরং মানুষ সত্য—সত্য হাসির জন্য, কান্নার জন্য; সমাজ সম্পর্কের সমস্ত বাঁধন নিয়ে, সমস্ত বাঁধন মেনে—আর সমস্ত বাঁধন ছিঁড়েও,—কিন্তু বন্ধনমুক্ত বলে নয়। আধুনিক মানুষ সত্য secular জীবন নিয়ে, social মানুষ হিসাবে। আর চণ্ডীদাস বা মধ্যযুগের চোখে মানুষ সত্য—spiritual সত্তা হিসাবে, **divinity-র** প্রতীক হিসাবে। আজ এ যুগে মানুষের মহিমা যখন আমরা উপলব্ধি করছি, তখন তাই নতুন করে ব্যাখ্যা করছি চণ্ডীদাসের 'সহজ মানুষ'কে। লক্ষ্য করা দরকার—ত্রিশ বছর আগেও বাঙলা দেশের সাহিত্যিকরা সহজিয়া চণ্ডীদাসের এই বাণী নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন নি, এরূপ ভাবে নতুন করে তা ব্যাখ্যা করার কথাও তাঁরা ভাবেন নি। কারণ তখনো বাঙালীর চোখে মানুষ এত সত্য হয়ে ওঠেনি।

**গ্রীক্ মানবতাবাদ**

আসলে কথাটা এই, প্রাচীন সাহিত্যে একটা মানবতাবোধ ছিল, কিন্তু এমন মানবতাবাদ ছিল না। তবে প্রাচীন কালের সেই মানবতাবোধই ক্রমশ পরিস্ফুট হয়েছে এই মানবতাবাদে; ইতিহাসের এক এক স্তরে তা এক এক ভাবনায় ও লক্ষণে প্রভাবিত হয়ে এভাবে ক্রমশই স্পষ্টতর হয়েছে। সবচেয়ে আগে সম্ভবত গ্রীস দেশেই এই মানবতাবোধ অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর হয়েছিল। সে জন্যই গ্রীক্ সাহিত্যকে মনে হয় এত আধুনিক। তার কারণ, প্রাচীন গ্রীসের জীবন-যাত্রা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবেশ অনেকটা বেশি উন্নত হয়েছিল। সেখানে দাসপরিশ্রমের উপর বনিয়াদ করে ছোট ছোট শহরে পৌরসভ্যতা, বহির্বাণিজ্য, গণতন্ত্র, এমন কি, কাঞ্চন-কৌলীন্য বা 'money economy'রও প্রায় প্রতিষ্ঠা হতে চলেছিল। অ্যাথেন্স্ তো প্রায় একটা সাম্রাজ্যও স্থাপন করে ফেলেছিল। অর্থাৎ এক দিক থেকে দেখলে সেই গ্রীক-সভ্যতার সামাজিক বনিয়াদ ছিল আধুনিক সভ্যতার "অনু-রূপ" ( শুধু অনুরূপ নয় )। ( দ্রষ্টব্যঃ ইস্কাইলুস্ ও অ্যাথেন্স,—জর্জ টমসন্ রচিত ) পরবর্তী মধ্যযুগে ইউরোপে তা মুছে গেছল, অন্য অনেক দেশে গ্রীসের মত সামাজিক বনিয়াদ স্থাপিতও হয়নি। সে জন্যই গ্রীক্ চিন্তায় আধুনিকতার বেশি পূর্বাভাস দেখি। আমরা জানি, সেই আভাসই পুনঃ-প্রস্ফুট হল ইউরোপে রিনাইসেন্সের সময়—যখন গ্রীক্ চিন্তা-জগৎ নতুন করে আবিষ্কৃত হল, আর মধ্যযুগের সভ্যতার

ভূমিদাস-ভিত্তি কাটাবার জন্ম স্থাপিত হচ্ছিল আধুনিক বণিক্-ধনিক্ যুগের বনিয়াদ—ইতালির শহরে-বন্দরে (দ্রঃ **Sociology of Renaissance—Alfred Von Martin**)। এবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বনিয়াদ আরও দৃঢ়তররূপে স্থাপিত হল, আর সেই সুস্থির সামাজিক বনিয়াদ এবার লুপ্ত হল না। কারণ ক্রমেই বিজ্ঞানের আবিষ্কার এসে তাকে পাকা করলে। এমন কি দেশ-বিদেশেও তারই নতুন সম্ভাবনা বিজ্ঞান এবার সুস্থির করে দিলে। এবং আরম্ভ হল, 'আধুনিক কাল' রিনাইসেন্সের জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে। রিনাইসেন্সকে এ হিসাবেই বলি আধুনিক কালের প্রথম সোপান। নইলে চীন দেশে কনফুশীয় যুগ থেকে সুস্থ ঐহিক দৃষ্টিতেও সমাজবোধ স্থান পেয়েছিল। কিন্তু প্রধানত চীন সমাজ ছিল পরিবার-কেন্দ্রিক—প্রাচীন সমাজ অনেকাংশে তা'ই থাকে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার (যেমন বারুদ আর কাগজ, সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটায় যা ইউরোপের ইতিহাসে) চীনের সমাজে বেশি দূর গড়াল না, সমাজের পুরনো কাঠামো ও মান্দারিন (scholastic) ঐতিহ্য এত অনড় হয়ে রইল যে, তার ফলে চীনে মানুষের মূল্য, ব্যক্তিত্বের ও গণতন্ত্রের স্ফুরণ বিশেষ হল না। চীনা সাহিত্য তাই রইল সুদূর নৈর্ব্যক্তিকতায় আবদ্ধ। এখন সবে তার সেই বাঁধ ভাঙতে আরম্ভ করেছে গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরে, ল্যু স্যুন্-এর সঙ্গে—নতুন চীনের জন্মে।

রিনাইসেন্সের কাল থেকে যে মানবতাবাদ সমুত্থিত হল তা প্রাচীন যুগের মানবতা-বোধেরই ঐতিহাসিক পরিণতি। তবু তার সঙ্গে প্রাচীন মানবতা-বোধের পার্থক্যও শুধু কালে, আয়ুতে, আর পরিমাণে নয়। বলতে হবে সব শুদ্ধ এ পার্থক্য গুণগত। তখন থেকে মানুষ ও পৃথিবী হয়ে উঠল মানুষের সবচেয়ে প্রধান আলোচ্য বিষয়।

**How beauteous mankind is!**
**O brave new world;**
**That has such people in't!**

'আধ্যাত্মিকতার' দিন এভাবে ফুরোতে লাগল। তারপর আমেরিকায় ও ইউরোপে ঐতিহাসিক গতি এই মানবতাবাদকে আরও নতুন রূপ দিল সমাজে রাষ্ট্রে "মানুষের অধিকার" ঘোষণা করে। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব হল তার সর্বজন-স্বীকৃত ঘোষণা—যদিও এই বাণী আগেই রূপ নিচ্ছিল ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়। ১৭৮৯ র পর থেকেই ব্যক্তিসত্তার দাবী স্বীকৃত হতে লাগল, স্বীকৃত হল

গণতন্ত্রেরও দাবী। আধুনিক সাহিত্যও তখন তার এই দ্বিতীয় সত্যকে আবিষ্কার করল, ব্যক্তিহিসাবে কত বিশিষ্ট আর বিচিত্র মানুষ, এবং Man's man for a that। কিন্তু সেই মানবতাবাদ, সেই গণতন্ত্র আর ব্যক্তিসত্তাবোধও প্রশস্ত হয়ে ইতিহাসের নতুনতর বিকাশে আজ আর-এক নতুন সত্য ও চেতনাকেও মানুষের নিকট ক্রমশই স্পষ্ট করে তুলেছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গণতন্ত্রের জন্য চাই শোষণতন্ত্রের অবসান। এই বাণী ইতিহাসে রূপলাভ করেছে ১৯১৮ এর সোভিয়েত বিপ্লবে। তাতে করে আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের আর্থিক ও যথার্থ আধ্যাত্মিক বিকাশে এই নতুনতর সত্য—মানুষ বিপ্লবীশক্তির অধিকারী, কারণ মানুষ সৃষ্টিধর্মী;—সে গড়তে পারে আপনার জীবনকে আপনার প্রযত্নে।

## আধুনিক বাংলা সাহিত্য

আধুনিক কালের এই মানবতার বাণী একই কালে সব দেশে সমভাবে স্ফূর্তিলাভ করেনি, তা স্পষ্ট। এখনো যে এসব বাণীকে আমাদের দেশে আমরা কতটা ঘোলাটে চোখে দেখি, তাও স্পষ্ট। কিন্তু মানবতাবাদের বিকাশ যে সব সাহিত্যে ও সমাজে সমান ভাবে হয়নি তার কারণ এই—সব দেশে ইতিহাস সমভাবে সমতালে বিকাশ লাভ করেনি। এই তো দেখছি আজ যখন সোভিয়েত দেশে মানুষ আপনার বিপ্লবী-নিয়তি সম্বন্ধে সচেতন, ইংলণ্ড আমেরিকার মত দেশেও তখন পর্যন্ত মানুষ ভাবছে নিজেকে অনেকটা অসহায় বলে, অভিশপ্ত বলে; আর আমাদের দেশে আমরাও ভাবছি তদনুরূপ। ইংলণ্ড ও আমেরিকা, সমাজ বিকাশের এক স্তর নিচে দাঁড়িয়ে, ধনিকতন্ত্রী সংকটে তাদের চেতনা দ্বিধাগ্রস্ত। আমরা অবশ্য আরও নিচে, আরও জটিলতর এক অবস্থায়। একই কালে সাম্রাজ্যবাদী আওতায় প্রাচীন সামন্ত-তন্ত্রের বোঝা আমাদের ঘাড়ে, ধনিকতন্ত্রী আশা ও চেষ্টার তাড়নাও আছে; আর সমাজতন্ত্রী চিন্তা ও চেতনার স্বপ্নেও আমরা এখনি আকুল হই। আমরা জাতীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে স্বতন্ত্র করে দেখতে চাই। পরাধীনতা, শাসন ও শাস্ত্রাধীনতাকেই জাতীয় ঐতিহ্য মনে করে বসি। তাই কখনো এই তরঙ্গে ভেসে আমরা খাপছাড়া ভাবে উল্লসিত হচ্ছি, কখনো হচ্ছি উৎকট নিরাশায় উদভ্রান্ত। এই অস্বাভাবিক কারণে আমাদের সাহিত্যে প্রাচীন সাহিত্যের সুরকে ছাপিয়ে আধুনিকতার সুরও এসেছে এক অসাধারণ তীব্র আবেগে। প্রথম তা দেখা দিল যখন মধুসূদন-বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যের

নতুন দ্বার খুলে দিলেন। দু-জনেই আধুনিক সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী। সাহিত্যে পরমার্থ ছেড়ে তাঁরা ঐহিক জীবনকে আশ্রয় করেন, দেবতা ছেড়ে মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেন। অমনি আমাদের চেতনায় এই ফরাসী 'মানব অধিকার'-বোধ তীব্র আবেগে দুকূল ছাপিয়ে ব'য়ে গেল—অথচ আমাদের জীবনে আমরা এখনো তার অনুরূপ সুস্থ খাদ রচনা করতে পারিনি—সাম্রাজ্যবাদের তাড়না আমাদের সে মানব-অধিকার প্রতিষ্ঠার মত সুস্থির অবকাশ দেয়নি। কাজেই একটা সুস্থ স্থির বিকাশের দিকে আমাদের সাহিত্য এগিয়েও এগোতে পারছে না।

১৮৬০ থেকে ১৯৪০, এই আশী বৎসরের মধ্যে আমরা বাঙলা সাহিত্যে অদ্ভুত তীব্রগতিতে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছি প্রায় চারশ' বৎসরের 'আধুনিক যুগের' ইউরোপীয় সাহিত্যের নানা স্তরকে। অথচ জীবনে আমরা এখনো বাঁধা নানা পুরনো ব্যবস্থার ও আধুনিক অব্যবস্থার যূপকাষ্ঠে। আমাদের এ চেষ্টা যত তালহারা হোক, তা বিস্ময়াবহ। মানুষের মূল্য ও ব্যক্তিত্বের মূল্য আমরা যেমন তীব্র বাণীতে বলতে পেরেছি আমাদের এই আধুনিক আশী বছরের সাহিত্যে, তা অপূর্ব, কেউ তা স্বীকার না করে পারবে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে তা আমরা সম্পূর্ণ স্থাপিত করতে পারি না, মানুষের স্বীকৃতি আমাদের সাহিত্যে তাই অব্যাহত হয়নি, তাও সত্য।

মানুষের "বিপ্লবী-নিয়তি" আমাদের সাহিত্যে এখনো বাণীরূপ গ্রহণ করেনি, একথা তাই বলাই বাহুল্য। ইউরোপের বহু সাহিত্যেও তার স্বাক্ষর এখনো ঝাপসা। তার সুস্পষ্ট চেতনা শুধু সোভিয়েত জীবনেই এখনো ফুটেছে; এবং ফুটছে তাই কতকটা তালকানা ভাবে সোভিয়েত সাহিত্যেও। কিন্তু একটা কথা আছে। ইউরোপের অনেক অতি-স্থির জাতির থেকেও (যেমন, ইংরেজ) বিপ্লবী ব্যাকুলতা আমাদের জীবনে বেশী উগ্র ও উত্তাল হবার সম্ভাবনা। তাই, এ কথা অসম্ভব নয়—অদূর ভবিষ্যতে—আমাদের সাহিত্যে একই কালে মানব সাম্যের ও মানুষের বিপ্লবী-নিয়তির বাণী প্রস্ফুট হয়ে উঠতে পারে—মানব-প্রগতির সমস্ত পথটিই আলোকিত হয়ে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে হয়ত এক বিপ্লবী জাগরণে। অন্তত মানুষ ও মানব-সত্য যে ক্রমেই সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করবে, তা নিঃসন্দেহ।

কারণ, যাই হোক ভবিষ্যৎ, এ কথা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারি—আধুনিক সাহিত্যের "আধুনিকতার" অর্থ কি, কি তার মূল বাণী। ইতিহাসের

তিনটি বড় রকমের সমুত্থানের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার এই ক্রম-বিকাশকেও আমরা চিহ্নিত করতে পারি : ইউরোপীয় রিনাইসেন্সে উদ্বোধন ঘটেছে মানুষের মহিমা বোধের, ফরাসী-বিপ্লবে ঘটেছে "মানুষের অধিকারের" ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা, আর সোভিয়েত বিপ্লবে ঘটেছে মানুষের বিপ্লবী যাত্রার সূচনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মানুষের এই স্বীকৃতি, এই মানব-সত্য, ব্যক্তিমহিমার ও জাতীয় স্বাধীনতার বাণীরূপে কতটা প্রকাশ লাভ করেছে, তা একটা মূল প্রশ্ন।

# পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমালোচনার ধারা

## সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

১.

কোন পার্থিব বস্তুই অনাদি নয়। যাহাকে আমরা প্রথম বলিয়া মানিয়া লই বস্তুতঃপক্ষে সেও বহু বিবর্তনের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য কোন একটা জায়গায় আরম্ভ করিতেই হইবে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশে প্লেটো ও আমাদের দেশে ভরতমুনিকে প্রথম সুরি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। পণ্ডিতেরা মনে করেন ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে। প্লেটো জন্মিয়াছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৮ অব্দে, তাঁহার মৃত্যু হয় ৩৪৭ অব্দে। সুতরাং দেখা যাইতেছে গ্রীক সাহিত্যশাস্ত্র ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। আমরা সকল বিষয়েই পূর্বগামিতার দাবি করি, কিন্তু আমাদের অলংকারশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত নবীন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী সমালোচক অ্যারিষ্টটল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে কোথাও অ্যারিষ্টটলের পোয়েটিক্সের প্রভাব দেখা যায় না। পোয়েটিক্সের আরবি অনুবাদ বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল, এমন কি এখনও ইহা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু প্রাক্-আধুনিক যুগে কোন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচক এই গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন মনে হয় না। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথের রসগঙ্গাধর পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনা নিজস্ব পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র এবং ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্র উভয়েরই উদ্দেশ্য কাব্য, নাটক প্রভৃতির তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন ও মূল্য-বিচার। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের দুহিতা, সুতরাং ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক আমরা সংস্কৃতের গণ্ডি অতিক্রম করিতে পারি না। আমরা কাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই, সংস্কৃত জানি আর না জানি, উপমা, রূপক, শ্লেষ, প্রসাদগুণ, রস ও ব্যঞ্জনা

প্রভৃতির উল্লেখ করি। 'রস' বাংলা সমালোচনায় সর্বাধিক প্রচলিত শব্দ। আবার আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে ইংরেজি তথা ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের দ্বারা-প্রভাবিত; কেহ কেহ মনে করেন আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ইউরোপীয় শাস্ত্রের প্রভাবেই জন্ম নিয়াছে এবং সেই প্রভাবেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই দুই ধারার সমন্বয়ের কোন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয় নাই।

২.

ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের উদ্ভব প্লেটোর জিজ্ঞাসায়। প্লেটো গদ্যে লিখিতেন এবং তাঁহার বিষয় ছিল দর্শন। কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা ছিল, তাই অ্যারিষ্টটলের আমল হইতে তাঁহার রচনা কাব্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তিনি কাব্যের মূল্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন; সেই প্রশ্নগুলিই ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের গতি নির্ধারিত করিয়াছে। সুতরাং এই প্রশ্নগুলি স্পষ্ট করিয়া উপস্থাপিত করিতে হইবে:

(১) কবি অর্দ্ধোন্মাদ এবং তাহার কল্পনা এই উন্মাদনারই অভিব্যক্তি। কিন্তু এই উন্মাদনা ঐশী উন্মাদনা; ইহা দিব্যদৃষ্টি দান করে। তাই অর্দ্ধোন্মাদ কবি-সত্যের নিহিত তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারেন, এই সকল তত্ত্ব ধীর, অবিকৃত বুদ্ধির অনধিগম্য। প্লেটোর অন্যতম ব্যাখ্যাতা এ. ই. টেইলার বলিয়াছেন এই দাবির মধ্যে খানিকটা ব্যঙ্গের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তাই ইহাকে অগ্রাহ্য করাও যাইবে না আবার খুব বড় করিয়া কবিপ্রতিভাকে নির্বিচারে শিরোধার্য করিলেও চলিবে না। প্লেটোর এই উক্তি ইউরোপীয় সাহিত্যশাস্ত্রের একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছে। কবির কল্পনা নিরঙ্কুশ; তাহা আপনার বেগে নূতন বস্তু রচনা করিয়া চলে, কিন্তু তাহা কি বিচারবুদ্ধির সঙ্গে অসম্পৃক্ত? যদি বলা যায় যে, মানুষের বিচারবুদ্ধির দ্বারা কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে কবির জগতের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়া যায়, কাব্য দর্শন-বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে। আবার যদি কবির কল্পনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে কবির সৃষ্টি আকাশকুসুমের অধিক মূল্য পাইবে না। কিন্তু কবি যে ভাবেই সৃষ্টি করুন, সাহিত্য-পাঠক সাহিত্যের বিচারকও। তাঁহার কল্পনা কখনও বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। এমন কি কবি যখন নিজের কাব্য ব্যাখ্যা করেন তখন তিনিও বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাই দিয়া থাকেন।

যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাঁহার স্বজনী কল্পনা কি বুদ্ধির অনুশাসনমুক্ত হইতে পারে ?

প্লেটো তাঁহার 'রিপাব্লিক' নামক গ্রন্থে কাব্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদর্শ রাষ্ট্র হইতে কবিদিগকে নির্বাসিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি যে যুক্তি দিয়াছিলেন তাহা উপরি-উক্ত প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। প্লেটোর মতে পারমার্থিক সত্য কতকগুলি ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সার্বভৌম আইডিয়া ( Eidos ) বা ভাবমূর্তি ; বাস্তব জগতে আমরা যে টুকরো টুকরো, পৃথক বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হই তাহারা সার্বভৌম ভাবমূর্তির বা Form-এর প্রতিচ্ছবি মাত্র। ইহার অধিক মূল্য তাহাদের নাই। মানবত্ব সার্বভৌম সত্য। প্রত্যেক মানুষ এই সার্বভৌম সত্যের ছায়ামাত্র। কাব্য কিন্তু এই সকল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিদেরই কাহিনী রচনা করে অর্থাৎ ইহা তাহাদের খণ্ড জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, কাব্য ছায়ার ছায়া, নকলের নকল ; ইহার সঙ্গে খাঁটি সত্যের সম্পর্ক খুবই ফিকে। প্লেটোর দর্শনে যে সকল ভাবমূর্তির কথা বলা হইয়াছে তাহাদের অস্তিত্ব সবাই স্বীকার করিবে না এবং এইখানে সেই আলোচনা প্রাসঙ্গিকও হইবে না। কিন্তু ইহার সঙ্গে অপর যে প্রশ্নটি জড়িত আছে তাহা সাহিত্য ও কাব্যের পক্ষে মৌলিক। কাব্যের কলার সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক কি ? যদি কাব্য বাস্তবেরই অনুকরণ করে, তাহা হইলে কাব্যপাঠে মনোনিবেশ করিয়া লাভ কি ? নকল ছাড়িয়া আসলের প্রতি মনোনিবেশ করাই ভালো ? হেগেল বলিয়াছেন যে, সাহিত্য যদি জীবনের অনুকরণ করিতে চায় তাহা হইলে সে শুধু হাস্যাস্পদ হইবে, মনে হইবে যেন গজেন্দ্রের পশ্চাতে নগণ্য কীট তাল রাখিয়া সঞ্চরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অথচ এই কথাও বলা শক্ত যে, জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নাই। সাহিত্যে সেতুবন্ধ, সমুদ্রলঙ্ঘন প্রভৃতি আজগুবি কাহিনী থাকে, দেবতাপিশাচাদির অবতারণা করা হয় ; তাহা হইলেও মনে হয় তাহার মধ্যে মানবজীবনের কাহিনীই রূপান্তরিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক, মরমী কবি ; তিনিও বৈষ্ণব কবিকে প্রশ্ন করিয়াছেন :

এত প্রেমকথা—<br>
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা<br>
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার<br>
আঁখি হতে।

(২) প্লেটো কবি ও কাব্যের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি তুলিয়াছিলেন সম্পূর্ণ নীতিগত কারণে। স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধে এথেন্স পর্যুদস্ত হইয়াছিল। প্লেটো হয়ত মনে করিতেন কবিদের কোমল কথা পড়িয়া ও শুনাইয়া এথেন্সের তরুণরা শৌর্যহীন হইয়াছিল। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কবিতা মানুষের কোমল, করুণ প্রবৃত্তিগুলিকে প্রবুদ্ধ করে; সেইজন্য কাব্যপাঠ মানুষের পক্ষে হানিকর। শুধু কোমল প্রবৃত্তির কথাই বলি কেন? সুস্থ সবল মানুষ হৃদয়ের ভাবগুলিকে সংহত, সংযত রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কবিতা অনুভূতির অতিশয়িত বর্ণনা দিয়া মানুষকে ভাবালু করিয়া দেয়। সেই দিক্ দিয়া বিচার করিলে কাব্যপাঠ মানসিক স্বাস্থ্যের হানিকর। আর এক দিক হইতেও কবিতা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। প্লেটো গ্রীক কাব্য সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, কবিরা দেবদেবীর যে চিত্র আঁকেন তাহার দ্বারা দেবদেবীরা হাস্যাস্পদ ও ঘৃণ্যচরিত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন। এই জাতীয় বর্ণনা পড়িলে পাঠকবর্গ দেবতাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করিবে এবং তাহাদের ধর্মবিশ্বাস শ্লথ হইবে। রামায়ণ-মহাভারতে ইন্দ্রাদি দেবতাদের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা সব সময় নীতিসম্মত হয় নাই। কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে হরপার্বতীর মিলনের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি প্রাচীন কালেও সোচ্চার হইয়াছিল, এবং অনেকেই মনে করেন এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। আজকাল আমরা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু মৌলিক প্রশ্নটির সমাধান হয় নাই। সাহিত্য কি প্রচলিত নীতির সমর্থন করিবে? বার্ণার্ড শ' প্রভৃতি মনে করেন, সাহিত্য নীতিশিক্ষা দেয় প্রচলিত নীতিকে পরিহার করিয়া, নূতন নীতির প্রবর্তন করিয়া। অপর একদল বলেন সাহিত্য নীতি-দুর্নীতির ধার ধারে না। ইহা নীতি-নিরপেক্ষ—**Amoral**।

উপরি-সন্নিবেশিত নাতিদীর্ঘ আলোচনায় তিনটি মৌলিক প্রশ্ন উল্লিখিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই প্রশ্নগুলি এইভাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে: প্রথমতঃ, কবির কল্পনায় বিচারবুদ্ধির স্থান আছে কি? দ্বিতীয়তঃ, ইহা স্বীকার করিয়া লইতে পারা যায় যে, কাব্যের বিষয়বস্তু বা মালমশ্‌লা জীবন হইতে সংগৃহীত হয়। কিন্তু সাহিত্য কি জীবনের প্রতিচ্ছবি দিবে (বাস্তববাদী বা রিয়ালিষ্টদের মত)? না, জীবন হইতে মালমশ্‌লা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে রূপান্তরিত করিবে (আইডিয়ালিষ্ট বা আদর্শবাদীদের মত)? তৃতীয়তঃ, সাহিত্যের সঙ্গে ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক কি?

প্লেটো ছিলেন প্রধানতঃ দার্শনিক, সাহিত্য সমালোচক নহেন; দর্শন ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি কবি ও কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন এবং সেই মন্তব্যই ইউরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যের ধারা নিয়মিত করিয়াছে। তাহার কারণ তাঁহার শিষ্য অ্যারিষ্টটলের অভ্যাগম। অ্যারিষ্টটল দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়—এক ইতিহাস-ভূগোল ছাড়া—লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এক সময় সকল বিষয়েই তাঁহার আধিপত্য স্বীকৃত হইত। গ্যালিলিও, ব্রূণো, বেকন প্রভৃতির অভ্যাগমে দর্শনবিজ্ঞানে তাঁহার প্রাধান্য টুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ছোট্ট একখানা সমালোচনা গ্রন্থের দৌলতে সাহিত্য জগতে তাঁহার একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রথম সমালোচক এবং এখনও বহুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বহু বিরোধী মন্তব্য সত্ত্বেও তাঁহার প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিয়াছে।

পোয়েটিক্স গ্রন্থে তিনি কোথাও গুরু প্লেটোর নামোল্লেখ করেন নাই কিন্তু তিনি প্লেটো-উত্থাপিত সমস্যার সমাধান করিতে ও বিপরীত মতসমূহের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবিপ্রতিভা যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা এবং তাহা যে যুক্তির অধিগম্য নহে তাহা তিনি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধ প্রতিভা বা স্বজ্ঞা ( Intuition ) যুক্তির অনধিগম্য হইলেও ইহা যুক্তি বা বুদ্ধি-বৃত্তিকে বাদ দিয়া সঞ্চারিত হয় না, ইহাকেও সম্ভাব্যতার নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কবি যাহা সৃষ্টি করেন তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানলব্ধ নহে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাসযোগ্য বা সম্ভাব্য হইতে হইবে এবং এইজন্য তাহার ধাপে ধাপে পরিণতির মধ্যে অনিবার্য নিয়মের সূত্র থাকিতে হইবে। ইহাই কবির সৃষ্টি ও উন্মাদের আকাশকুসুম কল্পনার মধ্যে পার্থক্য। এই জন্যই অ্যারিষ্টটল কাব্য, বিশেষ করিয়া নাটক লিখিবার কতকগুলি সূত্র নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, পরবর্তী লেখকেরা এই সকল নিয়মকানুন মানিয়া চলিলে সার্থক কাব্য রচনা করিতে পারিবেন, অবশ্য যদি তাঁহাদের জন্মগত কবিপ্রতিভা থাকে।

যেহেতু কবিপ্রতিভা উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাবিলাস মাত্র নহে, সেই জন্যই তাহাকে মানুষের সমগ্র মনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে হইবে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সাধারণ বিচারবুদ্ধিকে আঘাত করিলে চলিবে না। যে নাটকে অপাপবিদ্ধ উন্নতচেতা নায়কের অধঃপতন অথবা পাপাসক্ত নায়কের শ্রীবৃদ্ধি বর্ণিত হইয়াছে সেই নাটক পাঠে আমাদের এই সাধারণ বিচারবোধ আহত হইবে। সেইজন্য

অ্যারিষ্টটল এই জাতীয় নাটককে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে তিনি নীতি-বোধের কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়াছেন। তিনি অন্য ভাবেও কাব্যের সঙ্গে নীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্লেটো অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, কাব্য মানুষের মধ্যে ভাবালুতার সঞ্চার করে, বিশেষ করিয়া যে সকল ভাব সংযত করা উচিত তাহাদিগকে সঞ্জীবিত ও পরিপুষ্ট করে। অ্যারিষ্টটল এই অভিযোগ অংশত মানিয়া লইয়া ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন ইহা সত্য যে, কাব্য নানা অনুভূতি সঞ্চারিত করে, কিন্তু ইহাদের পরিশোধন করিয়া পাঠক বা ( নাটকের ) দর্শকের চিত্ত পরিশোধনও করে। কেমন করিয়া এই চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয় তাহা লইয়া টীকাকারদের মধ্যে মতভেদ আছে, কিন্তু অ্যারিষ্টটল যে কাব্যকে নীতিনিরপেক্ষ করিতে চাহেন নাই এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

অ্যারিষ্টটলের প্রধান অবদান অনুকরণবাদের রূপান্তরীকরণ। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অনুচিকীর্ষা মানবের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিই কাব্য ও শিল্প সৃষ্টি করিয়াছে—সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য, অঙ্কনবিদ্যা, কাব্য সকল শিল্পই অনুকরণবৃত্তির অভিব্যক্তি। অনুকরণের আনন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সেইদিক হইতে বিচার করিলে শিল্পচর্চা অন্তফলনিরপেক্ষ। ইহাকে কলাকৈবল্যবাদ বা **Art for Art's sake** বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অ্যারিষ্টটলের মতের এক অংশ মাত্র; তিনি যাহাকে শিল্প ও কাব্যের অনুকরণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা শুধু বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নহে। কোন বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিরই অনুকরণ সম্ভব এবং সেই জাতীয় অনুকরণ বাস্তবের ছায়ামাত্র। সেই জাতীয় অনুকরণ সম্পর্কে প্লেটোর অভিযোগ প্রযোজ্য। কিন্তু কবি একটি বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর অনুকরণ করিতে যাইয়া যাহা রচনা করেন তাহা বিশেষের চেয়ে বড়, তাহা সর্বজনপ্রযোজ্য সত্য—**Universal ( Kalholou ) statement**। পরবর্তী সমালোচকেরা বলিয়াছেন যে, কবি যে রূপ সৃষ্টি করেন তাহা ব্যক্তির রূপ, কিন্তু তাহা সার্বজনীন ভাব ও চিন্তার রূপক। এই সার্বজনীনতা মানিয়া লইলে অনুকরণ ও রূপান্তরণের দূরত্ব কমিয়া যায়।

প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের উত্তরসূরিরা কেহ প্লেটোর অনুগামী হইয়াছেন, কেহ অ্যারিষ্টটলের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছেন, কেহ কেহ উভয়ের মতের সামঞ্জস্য করিয়া নূতন সূত্র আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন কেহই তাহার বাহিরে যান নাই। কবি যে কাব্য রচনা

করিলেন তাহা বাস্তবানুগ বা বাস্তবাতিশায়ী কিনা, কাব্যে যে ভাব প্রকাশিত হয় তাহার গভীরতা ও ব্যাপ্তি—এই সব প্রশ্নই ইউরোপীয় কাব্য বিচারে মুখ্য হইয়াছে—ইহারাই কাব্যতত্ত্বের বিষয়। কাব্য প্রকাশিত হয় ভাষার মাধ্যমে, সুতরাং উপযুক্ত ভাষারও প্রয়োজন, কিন্তু কাব্যের ভাষা হইল ভাবের আবরণ ও আভরণ। অ্যারিষ্টটল অনুকরণ-শিল্পকে তিন দিক হইতে দেখিয়াছেন—অনুকরণের উপজীব্য বিষয়, অনুকরণের উপায় ও অনুকরণের ভঙ্গি। এই বিভাগের ফলে ইউরোপীয় শিল্পবিচারে প্রথমেই একটা ভেদসৃষ্টি হইল – উপজীব্য ভাব ও তাহার বহিঃপ্রকাশক আঙ্গিক, এই দুইয়ের মধ্যে। ইংরেজিতে ইহাকে বলে Content ও Form-এর বিভেদ ও সংযোগ। ঠিক কোন অংশ ভাবের আঙ্গিনায় পড়িবে এবং কোন অংশ আঙ্গিকের বহিরঙ্গনে যাইবে তাহা বিতর্কের বিষয় এবং এই বিষয়ে মতৈক্য আশা করা যাইতে পারে না। একজন যাহাকে ভাব বলেন অপরে তাহাকে রূপের অঙ্গ বলিবেন। যে সব যুক্তির ( Dianoia ) দ্বারা পাত্রপাত্রীরা নিজেদের কার্য সমর্থন করে অ্যারিষ্টটল নিজেই তাহাকে আঙ্গিকের পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। তবে তাঁহার আমল হইতেই সমালোচনার অঙ্গ হিসাবে দুইটি শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে—একটি সাহিত্যশাস্ত্র বা পোয়েটিক্স আর একটি অলংকারশাস্ত্র বা রেটরিক।

এই বিভেদের জন্য ভাবের সৃষ্টি ও ভাষার আলোচনা পৃথক হইয়া গিয়াছে। আর যেহেতু সাহিত্যের সৃষ্টি প্রধানতঃ ভাবের প্রকাশ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে সেইজন্য বিচারকের নিজের মনোভাব সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, অনেক সময় মনে হয় যাহা সমালোচনা বলিয়া পরিবেশিত হইতেছে তাহা সহৃদয়ের মনের কথা, আলোচ্য কাব্য তাহাদের উপলক্ষ্য মাত্র। সফোক্লিসের নাটক অ্যান্টিগোনের মধ্যে হেগেল দেখিয়াছেন দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবের সংঘাত এবং তিনি এই নাটকের মধ্যে সংঘাতের সমন্বয়ের সূত্রেরও সন্ধান করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, এই আলোচনা কি সফোক্লিসের নাটকের বিশ্লেষণ না হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক দর্শনের ব্যাখ্যা? কোলরিজ প্রভৃতি রোমান্টিক সমালোচকগণ হ্যামলেটের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ডেনমার্কের রাজকুমারকে দুর্বল, চিন্তাশীল, কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক নায়ক বলিয়া মনে হয়, তিনি যেন কোলরিজেরই আদিরূপ। নাটকে পাত্রপাত্রীগণ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন ঘণ্টা দুই তিনেকের জন্য, ইহার মধ্যে সব সময় সবাই রঙ্গমঞ্চে থাকেন না। ব্র্যাড্‌লি এই টুকরো টুকরো প্রকাশকে একত্র করিয়া বাড়াইয়া ওড়াইয়া

শেক্সপীয়রের নায়ক নায়িকাদিগকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বর্ণিত করিয়াছেন। ব্রাড্‌লির শেক্সপীয়র-আলোচনা খুব প্রসিদ্ধ, কিন্তু প্রশ্ন এই: ব্রাড্‌লি-বর্ণিত চরিত্রগুলি কি শেক্সপীয়রের নাটকে আছে? অনেক নাট্যসমালোচক মন্তব্য করিয়াছিলেন, ব্রাডলি দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিয়া অর্ধডজন যোগফলে উপনীত হইয়াছেন। অর্থাৎ শেক্সপীয়রের নাটকে দুই আর দুই (চরিত্রের বিভিন্ন দৃশ্যে প্রকাশ) বিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ব্রাড্‌লি তাহাদিগকে একত্র যোগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং যেখানে ফাঁক দেখিয়াছেন স্বীয় কল্পনার দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়াছেন এবং এই ভাবে দুই আর দুইয়ে মিলিয়া ছয় হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর সময় হ্যামলেট কোথায় ছিলেন, ম্যাক্‌বেথ বাল্যকালে কিরূপ লোক ছিলেন, ডান্‌ক্যানের হত্যা সম্পর্কে ম্যাক্‌বেথ দম্পতির মধ্যে পূর্বে কিরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সমালোচক এই জাতীয় জল্পনাকল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু শেক্সপীয়রের নাটকে ইহা নাই। এই সব আলোচনায় সহৃদয়-কল্পিত ভাব (Content) কাব্যের Form বা রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্য সমালোচনায় একটা নূতন সুর ধ্বনিত হইতেছে। নানাকারণে দার্শনিক ও সাহিত্যতত্ত্ববিদদের দৃষ্টি ভাষার বৈশিষ্ট্যের দিকে নিবদ্ধ হইয়াছে। দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে এক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে যাহারা বাক্য-গঠনকে প্রাধান্য দিয়া থাকে। এই নব্য তর্কশাস্ত্রের পাশাপাশি ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) ও শব্দার্থ বিদ্যা বা Semantics শাস্ত্রের খুব প্রসার হইয়াছে। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও নূতন হাওয়ার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক শ্রেণীর নব্য সমালোচকরা কাব্যকে নিছক কাব্য হিসাবেই দেখেন; তাঁহারা মনে করেন শব্দার্থই কাব্যের শরীর এবং ভাষার কারচুপি এবং image বা চিত্রকল্পের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াই ইহার সারবস্তু আহরণ করা যাইবে। এই নব্য সমালোচকদের মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব নাই, কিন্তু সবাই কবিতার শব্দ, বাক্য গঠন ও চিত্রকল্পের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কেহ কেহ শব্দের, পদবিন্যাসের বা বাক্যগঠনের চাতুর্য বিশ্লেষণ করিয়া নানা অর্থের সন্ধান করেন এবং এই বহু অর্থের বৈচিত্র্যের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কবিতার তাৎপর্য দেখিতে পান, কেহ কেহ কোন একটি শব্দ বা একটি চিত্রের পুনরাবৃত্তির মধ্যে সমগ্র কবিতা বা গ্রন্থের রহস্য আবিষ্কার করেন, আবার কাহারও কাহারও কল্পনা কবির ভাষাকে নূতন দ্যোতনায় মণ্ডিত করে। এই সব সমালোচকদের সমালোচনা ভঙ্গিতে পার্থক্য থাকিলেও ইঁহারা প্রত্যেকেই কবির ভাষাকেই প্রাধান্য দেন।

জনৈক ফরাসী কবি বলিয়াছিলেন, কবিতা শব্দের দ্বারা লিখিত হয়, ভাবের দ্বারা নয়। ইঁহারা ভাবকে বাদ দেন না; ভাষার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হইতেই কাব্যের ভাবে উপনীত হয়েন। কিন্তু ইঁহাদের সম্পর্কেও পূর্বোল্লিখিত অভিযোগ প্রযোজ্য এবং বেশী করিয়া প্রযোজ্য। ইঁহারা যে তাৎপর্যের সন্ধান করেন তাহা প্রধানতঃ স্বকপোলকল্পিত ; আলোচ্য কবিতা উপলক্ষ্য মাত্র। ব্র্যাড্‌লি দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিয়া অর্ধ ডজনে উপনীত হইয়াছিলেন এইরূপ আপত্তি করা হইয়াছিল; নব্য সমালোচকেরা দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিয়া পুর্ণ ডজনই পাইয়া থাকেন। কোলরিজ-ব্র্যাডলিপন্থী সমালোচনা ও আধুনিক বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা—ইহাদের মধ্যে যে টানা-পোড়েন চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে বাক্ ও অর্থের বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ অতি প্রাচীন। প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল কাব্য সম্পর্কে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু উভয়েই কাব্যের **Content** ও **Form** বা ভাব ও ভাষাকে পৃথক করিয়া দেখিয়াছিলেন। সেই বিচ্ছেদ জোড়া লাগে নাই।

৩.

সংস্কৃত সাহিত্যে সমালোচকের পরিচয় পাওয়া যায় না। যাঁহারা সাহিত্যের ব্যাখ্যা করিতেন বা উহার রস পরিবেশন করিতেন তাঁহারা টীকাকাররূপে আখ্যাত হইতেন। তাঁহাদের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণমূলক; সর্বাপেক্ষা নামকরা টীকাকার হইলেন মল্লিনাথ আর তাঁহার শ্রেষ্ঠ টীকা মেঘদূতের 'সঞ্জীবনী'। প্রবাদ আছে মাঘ ও মেঘদূত কাব্যের (মাঘে মেঘে) টীকা রচনা করিতে করিতে তাঁহার বয়স অতিক্রান্ত হইয়াছিল। মেঘদূতের টীকার প্রারম্ভে তিনি বলিয়াছেন:

ইহান্বয়মুখেনৈব সর্বং ব্যাখ্যায়তে ময়া।
নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে॥

আমি এখানে সবই অন্বয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধ দেখাইয়া ব্যাখ্যা করিতেছি। এখানে মূলের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কিছু থাকিবে না এবং অনপেক্ষিত অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত কিছু বলিব না। মনে হয় এখনকার মত তখনও অনেক লেখক কালিদাসের কাব্যের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া এমন অনেক কিছু লিখিতেন যাহার সঙ্গে মূলের সংস্রব নাই। মল্লিনাথ সেই প্রকারের ব্যাখ্যায় তাঁহার আপত্তি জানাইয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বই এই জাতীয় বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্যালোচনার পরিপোষকতা করিয়াছে। সাহিত্যতত্ত্ববিদদের মতে কাব্য কাব্যই, ইহা ইতিহাসও নয়, শাস্ত্রও নয়; আর ইহার আস্বাদ অ-লৌকিক। এই কারণে লৌকিক নীতি ও দুর্নীতির প্রশ্ন ইঁহাদের বিচার-বিশ্লেষণে প্রাধান্য পায় নাই। কোন কোন রুচিবাগীশ দেবদেবীর সম্ভোগবর্ণনায় আপত্তি তুলিয়াছিলেন এই পর্যন্ত। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে ব্রহ্ম রসস্বরূপ এবং ব্রহ্মাস্বাদই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। পরিপূর্ণ আস্বাদ আস্বাদকারীর চিত্তবৃত্তিতেই লভ্য; কিন্তু নানা আবরণ বা বিঘ্নের জন্য চিত্ত আপনাকে আপনি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। চৈতন্য যেখানে ভগ্নাবরণ হয় সেইখানেই রসাস্বাদ সার্থক হয়। এই আবরণভঙ্গ বা বিঘ্নের অপসারণ ব্রহ্মাস্বাদেই পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যায়। কাব্যরস ব্রহ্মাস্বাদেরই সহোদর। ইহা যোগীর জ্ঞানের মত তন্ময় বা নির্লিপ্ত নহে। কিন্তু ইহাও অ-লৌকিক; ইহাও আস্বাদস্বরূপ এবং সেইজন্যই লৌকিক নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন এখানে গৌণ। কাব্যচর্চা চৈতন্যের বিঘ্ন অপসারণ করিয়া যে বিশুদ্ধি আনয়ন করে তাহা চতুর্বর্গ লাভের সহায়ক হয়। কিন্তু কাব্যের আস্বাদ অ-লৌকিক। কবি কি ইচ্ছা করেন সেই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু তাঁহার কাব্যে যদি নীতিকথা প্রাধান্য পায় অথবা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহই যদি প্রাধান্য পায় তাহা হইলে নূতন বাধা বা আবরণের সৃষ্টি হইবে এবং রসাস্বাদ বিঘ্নিত হইবে।

কাব্য বাস্তবের অনুগমন করে, না বাস্তবকে রূপান্তরিত করে—এই প্রশ্ন প্লেটো-অ্যারিষ্টটল প্রবর্তিত সাহিত্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা। কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যশাস্ত্রের এই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াই অপনীত হইয়াছে। আলংকারিকেরা যে এই সমস্যা এড়াইয়া গিয়াছেন তাহার অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। কাব্যের আস্বাদ স্বসংবিদানন্দস্বরূপ অর্থাৎ তাহা স্বীয় চিত্তেই উদ্ভূত হইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে; ইহা ক্ষণজীবী, ইহার কোন পৌর্বাপর্য নাই। ইহা প্রমাণ শাস্ত্র নহে, তাই এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক নাই; ইহা পরের অনুকরণ করে না এবং অপরের সম্পর্কে কোন কিছু অনুমান (প্রমাণ) করে না। শঙ্কুক ও মহিমভট্ট অনুকরণ ও অনুমানের দ্বারা রসনিষ্পত্তির ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই মত গ্রাহ্য হয় নাই। এই সম্পর্কে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যালোচনার ধারা হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি।

তাই ইহাদের একটু ব্যাখ্যা দরকার। বাস্তবজীবনে যাহাকে বলে কারণ, কাব্যে তাহাকে বলা হয় বিভাব। শৃঙ্গাররসের কাব্যে দুষ্মন্ত শকুন্তলা মুখ্য নহেন, কবি সামাজিকের চিত্তে যে রস প্রতীত হয় ইঁহারা তাহা বিভাবিত করেন অর্থাৎ সামাজিকের চিত্তকে এই রসে অনুরঞ্জিত করেন। বাস্তবজীবনে ইঁহাদিগকে বলা যাইতে পারিত রসসৃষ্টির কারণ। রস যে সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয় তাহাদিগকে কার্য না বলিয়া অনুভাব বলা হয়। যে সমস্ত ক্ষণস্থায়ী ভাব সহচররূপে থাকে তাহাদিগকে বলা হয় সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। ভরতমুনি রসের সংজ্ঞা দিলেন এই বলিয়া, বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ভাবের সংযোগ অর্থাৎ সম্মিলনে রসের নিষ্পত্তি হয়। পরবর্তী টীকাকারেরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যদিও রতি, শোক, প্রভৃতি ভাবই শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি রসে পরিণত হয়, তথাপি সূত্রে ভাবেরই উল্লেখ নাই। ইহার কারণ পরের অর্থাৎ দুষ্মন্ত শকুন্তলাদির ভাবের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ গৌণ, সেই ভাবকে জানা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। বোধ হয় এই কারণেই মল্লিনাথ কালিদাসের দর্শন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন নাই। সাহিত্যশাস্ত্রে নায়ক নায়িকাদের শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, কিন্তু আমরা যেমন হ্যামলেট, লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণ করি, কোন প্রাচীন আলংকারিক সেইভাবে দুষ্মন্ত শকুন্তলাদির চরিত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। নায়ক প্রভৃতির শ্রেণীগত লক্ষণ নির্দেশ করিয়াই থামিয়া গিয়াছেন।

বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি হয়, লৌকিক ভাব অলৌকিক রসে নীত হয়। ইহারা রসাস্বাদের উপাদান, যেমন গুড়মরিচাদি পানক রসের উপাদান। সাহিত্যের ব্যাখ্যাতারা এই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ করিয়াছেন ; সেই কারণেই তাঁহাদের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ হইয়াছে। ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন এবং তিনি নাটকের শব্দবহির্ভূত আঙ্গিকেরও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কাব্য লিখিত হয় শব্দের দ্বারা, নাটক দৃশ্যকাব্য হইলেও কথোপকথনধর্মী কাব্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলে পলায়মান মৃগের অঙ্গভঙ্গির অপরূপ বর্ণনা আছে ; সেই সকল অঙ্গভঙ্গি বর্ণিত হইয়াছে শব্দের মাধ্যমে। কাজেই আমাদের দেশের অলংকারশাস্ত্রের প্রধান বিষয় শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্যময় সন্নিবেশ। এই সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া আলংকারিকেরা উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ প্রভৃতি নানা অলংকারের নামকরণ করিয়াছেন। কোন্ শক্তির বলে অলংকার অলংকৃতিত্ব লাভ করে অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে

সৌন্দর্য দান করে এই প্রশ্নও এই সকল আলংকারিকদের মনে জাগিয়াছিল। তাই ভামহ বলিলেন, সমস্ত কাব্যের গোড়ার কথা বক্রোক্তি বা অতিশয়োক্তি: কবিরা অনেক সময়ই যে ছোট কথাকে বাড়াইয়া বলেন সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। অ্যারিষ্টটলও বলিয়াছেন যে, ইহা সর্বত্রই দেখা যায় যে আমরা কোন গল্প শুনিয়া যখন অপরের কাছে নিবেদন করি তখন একটু বাড়াইয়া বলি। এই প্রবৃত্তি কাব্যসৃষ্টিতে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। কিন্তু অতিশয়োক্তি ছাড়াও কাব্য রচনা করা যায়, ইহা যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য বিচার করিলেই দেখা যায়। তারপর, কাব্যে অতিশয়োক্তি থাকে—কিন্তু অতিশয়োক্তি মাত্রই কাব্য নহে। ভামহের পরবর্তী আলংকারিক কুন্তক বক্রোক্তিকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিয়া এই আপত্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনিও অবশ্য স্বভাবোক্তিকে মানিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন প্রচলিত প্রয়োগ হইতে বিভিন্ন উক্তিবৈচিত্র্যই সাধারণতঃ কাব্য-সৌন্দর্য আনয়ন করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি কুমারসম্ভব হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণবেশী মহাদেব পতিকামনায় তপস্যারত পার্বতীর মনে কাম্য পতির প্রতি জুগুপ্সা সঞ্চার করিবার জন্য বলিতেছেন:

> দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং
> সমাগমপ্রার্থনয়া কপালিনঃ।
> কলা চ সা কান্তিমতী কলাবত
> স্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী॥

[সম্প্রতি কপালী মহাদেবের আসঙ্গ প্রার্থনা করিয়া দুইজন শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—এক চন্দ্রের কান্তিমান কলা আর ত্রিলোকের নেত্রজ্যোৎস্না-রূপিণী তুমি নিজে।]

এখানে অধিকাংশ শব্দই তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাদিগকে বাদ দিয়া অন্য কোন প্রতিশব্দ বসাইলে সৌন্দর্যহানি হইবে। মহাদেবের সঙ্গে সমাগম যে কাকতালীয়বৎ আকস্মিক নয় 'প্রার্থনয়া'-শব্দ তাহাই সূচিত করিতেছে। পার্বতীর মনে জুগুপ্সা সঞ্চার এই শ্লোকের উদ্দেশ্য; তাহা 'কপালিনঃ' শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।*

সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন বিশেষ অলংকার নহে, শব্দের প্রয়োগ ও বিন্যাস বৈচিত্র্যই কাব্য শোভার মূল। এই যুক্তিতেই আমরা অলংকারবাদ

* পাঠান্তর 'পিনাকিনঃ' গ্রহণ করিলে এই ভাবটি পাওয়া যাইবে না।

অতিক্রম করিয়া গুণবাদ ও রীতিবাদে পহুঁছিব। এই শেষোক্ত আলংকারিকেরা মনে করেন পদসংঘটনা হইতে শব্দ ও অর্থ যে মাধুর্য, ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি গুণে ভূষিত হয় তাহাই কাব্যশোভার হেতু। অসমাসবদ্ধ পদবিন্যাস মাধুর্যগুণ আনয়ন করে, সমাসবদ্ধ পদ ওজস্বিতা বা দীপ্তিগুণের আধার। কিন্তু এখানেও দেখা যাইতেছে যে, কোন বিশেষ অর্থই কাব্যের উদ্দেশ্য, পদসংঘটনা সেই উদ্দেশ্যলাভের উপায় মাত্র। মহাদেব নিজের সম্পর্কে জুগুপ্সা উৎপাদন করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই 'কপালিনঃ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই কারণেই গুণ প্রভৃতির সম্পর্কে কোন স্থির, সর্বথাপ্রযোজ্য নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। বলা হইয়া থাকে যে, সমাসবদ্ধ পদবিন্যাস ওজস্বিতার পরিপোষক। কিন্তু নিম্নোক্ত শ্লোকটি বিচার করা যাক :

> যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি স্বভুজগুরুমদঃ পাণ্ডবীনাং চমূনাং
> যো যঃ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরধিকবয়া গর্ভশয্যাংগতো বা।
> যো যস্তৎকর্মসাক্ষী চরতি ময়ি রণে যশ্চ যশ্চ প্রতীপঃ
> ক্রোধান্ধস্তস্য তস্য স্বয়মপি জগতামন্তকস্যান্তকোঽহম্॥

(পাণ্ডবীয় সেনাসমূহের মধ্যে যে যে বাহুবলের অহংকার করিয়া শস্ত্র ধারণ করে, পাঞ্চাল বংশে শিশু, অধিকবয়স্ক অথবা গর্ভশয্যাশায়ী, যে যে সেই কর্মের সাক্ষী, আমি রণে অবতীর্ণ হইলে যে যে আমার বিরোধী হইবে তাহাদের মধ্যে যদি স্বয়ং জগতের বিনাশকও থাকেন তাহা হইলেও ক্রোধান্ধ আমি তাহাদের বিনাশ সাধন করিব।)

জিঘাংসু অশ্বত্থামার উক্তিতে দীপ্তি বা ওজস্বিতার অভাব নাই, কিন্তু এখানে সমাসবদ্ধ পদ বিরল। অর্থের স্বরূপকে অপ্রধান করিয়া শব্দ বা অর্থের নিয়ম রচনা অসম্ভব। গুণবাদ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইল তাহা রীতি ও বৃত্তি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অর্থকে আশ্রয় করিয়াই উপনাগরিকাদি বৃত্তি ও বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতি তাৎপর্য লাভ করে। ইহাদের কোন নিজস্ব অস্তিত্ব নাই।

এই উপলব্ধিতেই আনন্দবর্ধনের যুগান্তকারী ধ্বনিবাদের উদ্ভব। কাব্যের অর্থই প্রাণ; তাহাই অঙ্গী এবং রচনার গুণ অঙ্গী অর্থকে আশ্রয় করে। অলংকার রমণীর কটককেয়ূরাদির মতই বাহিরের ভূষণ। তাহাকে তখনই কাব্যের শোভা বলিয়া গ্রহণ করা যায় যখন তাহা অঙ্গী অর্থের অপরিহার্য অঙ্গ হয়। প্রথমেই একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। শাস্ত্র, ইতিহাসাদিতেও

অর্থ থাকে ; সেই অর্থকে সুন্দর ভাষায় সজ্জিত করিলেই কি কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে ? অধিকাংশ সমালোচক ও পাঠকের তাহাই মত। আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শাস্ত্রের বাক্য প্রভুসম্মিত, ইতিহাসাদির বাক্য বন্ধুসম্মিত এবং কাব্যের বাক্য কান্তাসম্মিত। পাশ্চাত্য দেশেও এই মত নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন সাহিত্য সার্বজনীন, কারণ যে সকল অনুভূতি ও বিশ্বাস আদিমকাল হইতে মানুষের মনে সংক্রমিত হইয়াছে, যাহা নানারূপ আবরণের চাপে ঢাকা পড়িয়াছে, কবির কাব্যে তাহাই উদ্ঘাটিত হয়। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, নীতি শিক্ষা দেওয়া অথবা চিরাচরিত নীতির দোষত্রুটি দেখানই কাব্যের উদ্দেশ্য। শুধু দর্শন ও প্রবন্ধ নীরস বলিয়া কবিরা সাহিত্যের সরস বচনভঙ্গি গ্রহণ করেন। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন ও তৎশিষ্য অভিনবগুপ্ত অন্যমত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

শব্দ উচ্চারণ করিলেই অর্থ অভিহিত হয় ; শব্দ ও অর্থ পার্বতী ও পরমেশ্বরের মতই নিত্যসম্পৃক্ত। সাধারণতঃ এই ভাবেই শব্দ ও অর্থের নিয়ত সম্পর্ক মানিয়া লওয়া হয়। মীমাংসকরা অর্থের কোনরকম সচলতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধনের মতে শব্দ প্রাথমিক বাচ্য অর্থ অভিহিত করিয়া আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত করিতে পারে। শব্দের এই শক্তির উপরই ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠিত। এমন জায়গা আছে যেখানে প্রাথমিক অর্থ গ্রহণই করা যায় না। সেইখানে আভিধানিক অর্থ বাধা পাওয়ায় যে নূতন অর্থ উদ্ভূত হয় তাহাকেই প্রাথমিক অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রাথমিক অর্থকে অতিক্রম করিয়া কখনও কখনও আর একটি অর্থ দ্যোতিত হয়। এই নূতন অর্থই—আনন্দবর্দ্ধনের ভাষায় প্রতীয়মান অর্থ—কাব্যের প্রাণ; ইহার মাধ্যমেই রস আস্বাদ্যমান হয়। একটি সরল দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। মহর্ষি অঙ্গিরা ঋষিদের মধ্যে বাক্‌পটু ছিলেন। তিনি পিতা হিমালয়ের কাছে সবিস্তারে পার্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সেই সময় পার্বতী পিতার কাছেই ছিলেন। পার্বতীর বর্ণনা কালিদাস দিয়াছেন এইভাবে :

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী।

ইহার বাচ্যার্থ খুব সহজ। দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন বরের বিষয় বলিলেন তখন পার্বতী লীলাকমলের পত্র গণনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার ধ্বনিত অর্থ পুলকিত, প্রণয়ভীরু কুমারীর লজ্জা। এই কথা সোজা করিয়াও বলা যাইতে পারে, যেমন বলা হইয়াছে, নিম্নলিখিত শ্লোকে :

কৃতে বরকথালাপে কুমার্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ ॥

[ বরসম্বন্ধীয় কথার আলাপ হইলে কুমারীরা অন্তর্লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া দেহে পুলক সঞ্চারের দ্বারা নিজেদের প্রণয়াভিলাষ সূচিত করে। ]

৪.

পূর্বেই বলা হইয়াছে রসের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করিয়া ভারতীয় আলংকারিকেরা অনেক সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়াছেন, কিন্তু এড়াইয়া গেলেই সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথমে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কের কথাই ধরা যাক্ না কেন। আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন, বাচ্য অর্থ ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির ভিত্তিভূমি, বাচ্য অর্থ শাস্ত্র-ইতিহাসাদির বাহন। অর্থাৎ শাস্ত্র-ইতিহাসাদি অথবা ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার উপরই কাব্য প্রতিষ্ঠিত।

অভিনবগুপ্ত রসের অলৌকিকত্ব প্রমাণ ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তিনিও যোগীর ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে রসচর্বণার পার্থক্য করিয়াছেন। কবি সহৃদয়ের রসাস্বাদ যোগীর জ্ঞানের মত 'একঘন' নহে, সকল বৈষয়িক ব্যাপারের 'উপরাগ-শূন্য' নহে। পরিপূর্ণ তন্ময়তা বা নির্লিপ্ততার জন্যই ব্রহ্মাস্বাদ কাব্যের আস্বাদের মত সৌন্দর্যময় হইতে পারে না। স্বয়ং ভরতমুনিও বলিয়াছেন, ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীর। ইহা একটা তুলনা মাত্র ; কিন্তু ইহাও প্রমাণ করে, কাব্যের সঙ্গে ইতিবৃত্তের নিবিড় সম্পর্ক। দেহের সৌন্দর্যের সঙ্গে আত্মার সৌন্দর্যের কার্যকারণ সম্বন্ধ নাও থাকিতে পারে, কিন্তু ইতিবৃত্তাদি বৈষয়িক ব্যাপারের সঙ্গে কাব্যের সৌন্দর্যের যে সম্পর্ক আছে তাহা অভিনবগুপ্তও পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতীয় আলংকারিকেরা কাব্য ও সাহিত্যকে যতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া উপস্থাপিত করিতে চাহিয়াছেন, ততটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা তাহাদের নাই। অভিনবগুপ্ত কাব্যকে দীপশিখার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন ; দীপ শুধু নিজেকে আলোকিত করে না অপর বস্তুকেও উদ্ভাসিত করে। অর্থাৎ রস নিজেকে

প্রকাশ করিয়া রত্যাদি বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। ইহা মানিয়া লইলে রসকে আস্বাদ মাত্র বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। রস স্বয়ংসম্পূর্ণ আস্বাদস্বরূপ কিন্তু তাহা মানবজীবনের ও সমাজের বহু গুহাহিত রহস্যকে উদ্ঘাটিত করে। আত্মাই প্রধান বটে কিন্তু শরীর যদি না থাকে? এই কারণেই সাহিত্য সুনীতি-দুর্নীতি সম্পর্কেও উদাসীন নয়; জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে আলোকপাত করিতে পারে বলিয়াই আজগুবি গল্পও আমাদের কাছে সমাদর লাভ করে। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আলংকারিকেরা বলেন রতি, হাস, শোকাদি ভাব আমাদের মনে বাসনাসংস্কাররূপে নিহিত থাকে; ইহারাই গোচরীকৃত হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়—প্রাগ্বিনিবিষ্টবাসনারূপো রত্যাদিরেব রসঃ (জগন্নাথ)। এই প্রাগ্বিনিবিষ্ট বাসনাগুলি তো লৌকিক ব্যাপার; রসসৃষ্টির আদি ও অন্তে ইহাদিগকে পাওয়া যাইবে। ইহাদের গুণাগুণ বাদ দিয়া রসের বিচার করিতে গেলে সেই বিচার খণ্ডিত হইতে বাধ্য।

আমাদের দেশের প্রাচীন আলংকারিকেরা বাচ্যার্থকে গৌণ করিয়া শুধু ধ্বনিপ্রধান কাব্যকেই শ্রেষ্ঠ বা উত্তমোত্তম কাব্য বলিয়া থামিয়া গিয়াছেন এবং ধ্বনির অশেষ প্রকার ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়া শুধু চুলচেরা বিভাগ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অসংখ্য প্রকার কল্পনা করিয়াছেন। এই অগণিত শ্রেণীভেদের দ্বারা কাব্যের বিচার হয় না এবং যেহেতু শুধু এই একটি ব্যাপারের বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে সেই জন্য তাঁহাদের বিশ্লেষণও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা শুধু শ্লোকের বিশ্লেষণের উপর জোর দিয়াছেন; সেই জন্য সমগ্র কবিতার বিচার না করিয়া এক একটি শ্লোককে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'সংস্কৃত শাস্ত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি যাহাতে মনে হইতে পারে যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার কাব্যদেহপরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটি সমালোচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল? প্রত্যেকটি রেখার টান, বর্ণানুরঞ্জনের সূক্ষ্মতম অণুমিশ্রণ যে কেন্দ্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতা, কাব্যরসের সামগ্রিক বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন সমালোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায়? এই প্রশ্ন আনন্দবর্দ্ধনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি ধ্বনিবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ধ্বন্যালোক গ্রন্থের প্রথম তিন উদ্দ্যোতে এবং

পরিশিষ্টাকারে লিখিত স্বল্পপরিসর চতুর্থ উদ্দ্যোতে ধ্বনিবাদের সামগ্রিক আবেদনের কথা তুলিয়াছেন। 'ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব বিবিধ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলেও কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাবে যত্নবান হইবেন।' তিনি স্বীয় মতের পোষণার্থে রামায়ণ ও মহাভারতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রামায়ণে শোক শ্লোকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সীতার তিরোভাব পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া আদি কবি করুণ রসের প্রাধান্য দিয়াছেন। মহাভারত সম্পর্কে আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন, 'মহামুনি যাদব ও পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ তিরোধানজনিত সংসারবিতৃষ্ণাদায়িনী সমাপ্তির বর্ণনা দিয়া দেখাইয়াছেন যে, মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং শান্তরসই তদীয় কাব্যের প্রধান বক্তব্য বিষয়।' আনন্দবর্দ্ধন উভয় মহাকাব্যেরই পরিণতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্য অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মন্তব্যের যাথার্থ্য মানিয়া লইলেও এইরূপ আলোচনায় মহাকাব্য দুইখানির সাহিত্যিক গুণাগুণের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে, রামায়ণে করুণ রস প্রাধান্য পাইয়াছে বা মহাভারতে শান্তরস প্রাধান্য পাইয়াছে তাহা হইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায় অন্যান্য করুণরসাত্মক বা শান্তরসাত্মক কাব্য হইতে এই দুই মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বা শ্রেষ্ঠত্ব কেমন করিয়া নির্ণীত হইবে? এবং এই আলোচনায় প্রবিষ্ট হইলেও অন্যান্য ব্যাপারের অবতারণা অপরিহার্য হইয়া পড়িবে।

যে সাহিত্য-তত্ত্ব শুধু প্রতীতি বা অভিব্যক্তিকে আশ্রয় করে তাহা কখনও কল্পনার তীব্রতা বা আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব মানিতে পারিবে না এবং সেই কারণে তাহা ভাসা-ভাসা আলোচনায় পর্যবসিত হইবে। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্তের ধ্বনিবাদের সঙ্গে ক্রোচের অভিব্যক্তিবাদের সাদৃশ্যের কথা পূর্বেই উল্লেখিত হইয়াছে। ক্রোচে স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, কবির ও অ-কবির intuition বা অনুভব বা স্বজ্ঞার কোন গুণগত পার্থক্য নাই। সমস্ত পার্থক্য বিস্তৃতিতে, জটিলতায় অথবা সংখ্যায়। যদি ইহাই মানিতে হয়, তাহা হইলে যে কাব্যে যত বেশী অলংকার, গুণ বা ধ্বনি থাকিবে সেই কাব্য তত বেশি বড় হইবে। এইজন্যই সর্ব সম্প্রদায়ের আলংকারিকগণ অলংকার, গুণ, ধ্বনি প্রভৃতির প্রকারভেদ বাড়াইয়া চলিয়াছেন এবং কাব্যের সামগ্রিক আবেদন হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া শুধু অলংকার, গুণ দোষ প্রভৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। এইসব আলোচনার সঙ্গে কাব্যের মূলীভূত সৌন্দর্যের

সংশ্রব কম এবং এখানে ধ্বনিবাদী ও অলংকারবাদীর পন্থার মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশি নয়।

ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে একটা ক্রমিক সঙ্কোচন ও পরে অধোগতির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই শাস্ত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল—রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণ বাদ দিলেও সেই পদ্ধতিতে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত এই শাস্ত্রের সর্বপ্রধান প্রবক্তা এবং ইহাদের নাম একই সঙ্গে কীর্তিত হইয়া থাকে, এবং অভিনবগুপ্তই সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অভিনব গুরুর ধ্বনিবাদকে খানিকটা সঙ্কুচিত করিয়া অসামান্য ধীশক্তি বলে তাহার প্রচার করেন ও বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন করেন। পরবর্তী লেখকরা মহাসম্ভ্রম-সহকারে অভিনবগুপ্ততাতপাদাচার্য বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আলোচনার মধ্যেই ধ্বনিবাদের সঙ্কীর্ণতা ও ভঙ্গুরতার প্রথম আভাস পাওয়া যায়। আনন্দবর্দ্ধন একাধিকবার বলিয়াছেন যে, বাচ্য ব্যঙ্গের ভিত্তিভূমি, বাচ্য অর্থ গৌণ হইয়া গেলেও অবলুপ্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য এই যে শাস্ত্র-ইতিহাসাদির সঙ্গে কাব্যের নিবিড় সংযোগ আছে। অভিনব এই ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিবেন ইহাই আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি সেই পথে যান নাই; বরং তাঁহার ব্যাখ্যায় রসের অলৌকিকত্ব এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে ইহার বাস্তবভিত্তি যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে।

অভিনবের যুক্তি এত শাণিত, উপলব্ধি এত তীক্ষ্ণ এবং বিশ্বাস এত দৃঢ় যে ক্ষয়িষ্ণুতার প্রারম্ভিক লক্ষণ তাঁহার রচনায় ধরা পড়ে না। কিন্তু তাঁহার আলোচনা হইতেই বোঝা যায় যে, ধ্বনিবাদ পরিসংখ্যানে পর্যবসিত হইবে। অভিনবের পরেই এই অধোগতির পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। অভিনবের পরবর্তী লেখকদের মধ্যে মম্মট ভট্ট সমধিক প্রসিদ্ধ; এক সময়ে তৎপ্রণীত কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থের টীকা গৃহে গৃহে পঠিত হইত। কিন্তু এই গ্রন্থে ধ্বনিবাদ এক চুলও অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আনুষঙ্গিক ব্যাপারেই তাঁহার বিশ্লেষণনৈপুণ্য ব্যয়িত হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের অনেকগুলি উল্লাস বা অধ্যায় আছে; সর্বাধিক প্রসিদ্ধি পাইয়াছে দোষ-বিষয়ক সপ্তম উল্লাস। এইরূপ প্রবাদ আছে মম্মটভট্ট নৈষধচরিতকারকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নৈষধকাব্য কাব্যপ্রকাশের পূর্বে প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে দোষাবলীর দৃষ্টান্ত দেখাইতে অন্যত্র যাইতে হইত না। এই বহু-প্রচলিত প্রবাদবাক্য এই

জাতীয় সমালোচনার অন্তঃসারহীনতা প্রমাণ করে। আলংকারিকেরা যে সকল গুণ বা দোষের কথা বলেন তাহা কাব্যে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই তুলাদণ্ডে কাব্যের মাহাত্ম্য পরিমাপ করা যায় না। বস্তুতঃপক্ষে কাব্যের কাব্যত্ব পরিমাপনীয় বা পরিসংখ্যানীয় বস্তু নহে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা শেক্সপীয়রের নাটকে অনেক ব্যাকরণগত ভুল এবং অলংকারশাস্ত্রের নিয়মভঙ্গের বহু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু শেক্সপীয়র শেক্সপীয়রই।

## 'রক্তকরবী'র তিনজন

### অন্নদাশঙ্কর রায়

'রক্তকরবী'র নন্দিনীকে সবার চেয়ে কে বেশী ভালবাসত? রঞ্জন না কিশোর না বিশু-পাগল? বলা যায় না, কিন্তু নন্দিনী কাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত তা বলা যায়। রঞ্জনকে।

রঞ্জনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তাকে আমরা দূর থেকে চিনি, নন্দিনীর প্রেমের ভিতর দিয়ে সর্দারদের সশ্রদ্ধ আতঙ্কের আড়াল থেকে। এই রঞ্জন কাব্যবিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি; না আছে তার ভয়, না আছে সংকোচ। "দুই হাতে দাঁড় ধরে সে তুফানের নদী পার করে দেয়, বুনো ঘোড়ার কেশ ধরে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।" সে যেন জমে-জমে ওঠা, ফুলে-ফুলে-ওঠা প্রাণ, বন্যার নদীর মতো উদ্বেলিত, ঝড়ের আগে বাতাসের আবেগের মতো উচ্ছ্বসিত। রাজার সর্দারেরা তাকে যক্ষপুরীর প্রাচীরের মধ্যে ধরে আনল, নিয়োগ করল সুড়ঙ্গ খোদাই করার কাজে, আপন খেয়ালে ছুটে চলা প্রাণকে তারা পুরল নিয়মের গণ্ডিতে, সুবিধা উৎপাদনের শৃঙ্খলায়। কিন্তু রঞ্জনের স্বভাবই স্বতন্ত্র। ছাট-কাট করা, সুবিধার উপযোগী-করা, যন্ত্রের ভিতর দিয়ে সমান ছাঁচে ঢালাই-করা, নম্বর-লেবেল-আঁটা ক্লিষ্ট কৃপণ সংকীর্ণ প্রাণের মাঝখানে সে এল তার বিচিত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে, শৃঙ্খলা-না-মানা, শাসন-তুচ্ছ-করা দুরন্ত সাহস নিয়ে, নদীকূলভাঙা বন্যাস্রোতের মতো বেপরোয়া বেহিসাবী অকারণ হাসির হিল্লোল নিয়ে। "ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তা হলেই ওদের চটক ভেঙে যায়। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।" খোদাইকরদের মমির মতো প্রাণ সে এক নিমেষেই মাতিয়ে তুলল। সে ধরল গান, আর সেই গানের তালে পড়তে লাগল হাজার হাজার কোদাল। হুকুম মেনে কাজ করা তার ধাতে সয় না, সে কাজ করে চলে নিজের ভরপুর আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়। তাতে হয়তো শৃঙ্খলা থাকে না, কাজ কিন্তু

এগিয়ে চলে বেশ। যক্ষপুরীর ইতিহাসে এ-হেন অঘটন এর আগে ঘটেনি। কাজেই লাল-ফিতের দল তাকে শিকল দিয়ে কষে বাঁধল। কিন্তু প্রাণকে ধরে রাখবে কে? সে পিছলে বেরিয়ে এল। কথায় কথায় সাজ বদলে, চেহারা বদলে, লোক খেপিয়ে সে যখন সর্দার সম্প্রদায়কে নাস্তানাবুদ করে তুলল, তখন রাজার সঙ্গে তার বলপরীক্ষা হয়ে গেল। প্রকাণ্ড একটা মেশিনের ঘায়ে মানুষ যেমন করে গুঁড়িয়ে যায় অনেক যুগের পুঞ্জীভূত শাসনশক্তির সংঘাতে প্রাণের হাসি তেমনি করেই মিলিয়ে গেল।

কিশোর ছিল ছোট্ট একটি প্রাণ; যক্ষপুরীর প্রাচীর-ফাটলে চোখ-মেলে চাওয়া তরুণ অশ্বত্থতরু; বড়ো কচি, বড়ো কাঁচা। বসন্তের কোকিলটির মতো শুধু নামের নেশায় সে বারবার নন্দিনীকে ডাকে—"নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!" সে কাজে ফাঁকি দিয়ে নন্দিনীর জন্য ফুল তুলে আনে; তার একটিমাত্র গোপন কথার মতো তার এই ফুল তুলে আনা অভ্যাসটি। নন্দিনী ভালবাসে বলে সে দুর্গম ঠাঁই থেকে খুঁজে পেতে রক্তকরবী ফুল এনে দেয়, নন্দিনীর জন্য যত বেশী দুঃখ পায় তত তার সুখ উথলে ওঠে। একদিন তার জন্যে প্রাণ দিয়ে দেবে এই ছিল তার সাধ। একদিন দিলও।

আর বিশু-পাগল। সেও এক অপরূপ সৃষ্টি। দুঃখের আনন্দে সে গান গেয়ে বেড়ায়, কেউ জানে না কোথায় তার সত্যিকারের ব্যথা। তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে গিয়েছিল তার দশার ফের দেখে, তাই লোকে ভাবে লোকটা স্ত্রীর অকৃতজ্ঞতায় বৈরাগী হয়ে উঠেছে। বিশুর ব্যথা কিন্তু অন্যরকম। সে ভালবাসত একজনকে, বিয়ে করল অন্যকে। যে-দিন সে নন্দিনী-রঞ্জনদের খেলা ছেড়ে একলা বেরিয়ে গেল, সে-দিন যাবার সময় কেমন করে নন্দিনীর মুখের দিকে তাকাল, নন্দিনী বুঝতে পারল না। তারপর কতকাল খোঁজ পায়নি, শেষে যক্ষপুরীতে দেখা। হঠাৎ তীর খেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে পড়ে যায়, একজন মেয়ে তাকে তেমনি করে যক্ষপুরীর ধুলোর মধ্যে এনে ফেলল। সে নিজেকে ভুলেছিল। "তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তারপর দিক্‌হারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।" একদিন পশ্চিমের জানালা দিয়ে বিশু দেখছিল মেঘের স্বর্ণপুরী, আর সে দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়ো। সে বিশুকে বললে, "ঐখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি তোমার সামর্থ্য।" বিশু স্পর্ধা করে বল্লে, "যাব নিয়ে।" আনলে তাকে ঐ সোনার চূড়োর নিচে। তখন বিশুর ঘোর ভাঙল। আবার হলো

নন্দিনীর সঙ্গে দেখা। এবার সেই পুরানো প্রেম তার ঘুম ভাঙিয়ে দুঃখ জাগিয়ে দিল। নন্দিনী তাকে "পাগল ভাই" বলে ডাকে, সাথী মনে করে। এইটুকু তার একটিমাত্র সুখ। নন্দিনীকে সে গান শুনিয়ে বেড়ায়। নন্দিনী বলে, "পাগল, তুমি যখন গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল, কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারিনি।" বিশু উত্তর দেয়, "তোর সেই কিছু না দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প কিছু দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।"

এরা তিনজনেই নন্দিনীকে ভালবাসত, আর নন্দিনীও ভালবাসত তিনজনকেই। কিন্তু ভালবাসার রকমফের থাকে। এদের ভালবাসারও ছিল।

নন্দিনী যাকে সত্যিকার ভালোবাসা দিয়েছিল, সর্বস্ব দিয়েছিল, সে রঞ্জন। তার দুরন্ত সাহস আর জ্বলন্ত প্রাণের দ্বারা রঞ্জন তাকে জয় করেছিল, তাদের "নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, নন্দিনীকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ দিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে।" সেই খেলাতেই সে নন্দিনীকে জিতে নিয়েছিল; অসাধারণ তার তেজ, তাইতেই সে নারীর হৃদয় জিতে নেয়। রঞ্জন যেন খানিকটা সন্দীপের মতো; কিন্তু সন্দীপের মধ্যে কামনা ছিল, পাবার ইচ্ছা ছিল, আর ছিল কামনার জোর, ক্ষুধার প্রচণ্ডতা। রঞ্জনের মধ্যে জোরটুকুই দেখি, কামনার আভাস পাইনে, প্রচণ্ডতা দেখি, ক্ষুধার সত্তা দেখিনে, তাই সে শেষ পর্যন্ত নারীকে পেল, আর সন্দীপ লোভের আতিশয্যে হারাল। তা ছাড়া সন্দীপের পৌরুষে একটা ফাঁকি ছিল, তা অসাধ্য সাধনাকে ডরাত। সে ফলে বিশ্বাস করত, তার কাজ করার মূলে থাকত ফলাকাঙ্ক্ষা। রঞ্জনের কাজ করা প্রাণের তাড়নায়— সে ছিল তার লীলা।

তফাৎ যতই থাক, রঞ্জন আর সন্দীপ সেই শ্রেণীর পুরুষ যারা স্বভাবতঃ জেতা। নারীকে এরা জয় করে জয়ের আনন্দে। বাঘ যেমন শিকার নিয়ে খেলা করে প্রাণে মারবার আগে, এরাও তেমনি হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলে— হয়ত পরমুহূর্তেই তাকে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে। এরা প্রচণ্ড সুন্দর, এরা আগুন, এদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরা পতঙ্গের গৌরব, নারীর সৌভাগ্য। প্রাণের ওপর এদের দরদ নেই। হারাতেও যেমন দ্বিধা নেই, হারতেও তেমনি দয়া নেই। ঝড়ের সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে; বিরাট একটা নিঃশ্বাসের মতো এরা সমস্ত শক্তি নিয়ে আসে, ভাঙে, দোলায়, আঘাত

করে, আর আপনাতে আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ঝড়ের পাখিরা এদের ভীষণতাকে ভালবাসে, তাদের বুক কাঁপে পুলকে আর ভয়ে, আনন্দে আর আতঙ্কে তারা মরতে এগিয়ে আসে। আমাদের রঞ্জন ঠিক ঝড় নয়, আমাদের নন্দিনীও ঝড়ের পাখি নয়। সেও প্রাণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা প্রাণ, সে কানায় কানায় ভরা প্রাণবতী স্রোতস্বিনী; সে ঝড়ের মেঘের বিদ্যুৎ।

পৌরুষ বলতে নন্দিনীরা যা বোঝে, তা রঞ্জনদের মধ্যেই তারা পায়, একটা প্রবল আকর্ষণ। যুগযুগান্তকাল পুরুষ নারীকে প্রবলভাবে চেয়েছে, প্রাবল্য দিয়ে পেয়েছে, প্রাবল্যের দ্বারা রক্ষা করেছে, নিজের ইচ্ছার প্রবলতা দিয়ে গড়ে তুলেছে। তাই সে অভিভূত হয় এই অনেককালের চেনা, বহুবার চোখে-চাওয়া, প্রাণভরাসী প্রাণ-দোলানো পৌরুষ দেখে,—যে পৌরুষ প্রাণের মমতা রাখে না, প্রাণের মূল্য জানে না, প্রাণকে দুই মুঠো করে ধরে, দুই পা দিয়ে দলে। নারী তাই মালা হয়ে তার কণ্ঠে লতায়, ছিন্ন হলে পায়ে লোটায়। তার স্বার্থ প্রাণকে ঘর বাঁধানো, মাঠ চষানো, বশ মানানো। তা সে করেও এসেছে। তবু তার রক্তে রক্তে মিশে আছে প্রলয়-মেঘের সিঁদুরে আভা দেখে আতঙ্কে আনন্দে শিহরণ।

রঞ্জন স্বভাবজয়ী, সে না চাইতে পেয়েছে, কিংবা চাওয়ার ঢের বেশী পেয়েছে। কিশোর কিছুই চায়নি; শুধু দিয়ে ফেলেই তার সুখ। কিশোর কিছুই পায় নি; কিছু না পাওয়াতেই তার আনন্দ। নন্দিনীকে সে ভালোবাসে। তাই সর্বস্ব দিয়ে ঐ ভালোবাসার মান রাখে। তার প্রেমের মধ্যে এমন একটা ছেলেমানুষী আছে যা নন্দিনীকে কৌতুক দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সে এই কচি প্রাণটির কল্যাণ-কামনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। নন্দিনী তাকে তেমন করে ভালবাসতে পারে না, যেমন রঞ্জনকে ভালবাসে। কিশোর শুধু একটুখানি স্নেহ-শঙ্কিত কল্যাণ-কামনায় আশীর্বাদ উৎকণ্ঠাই পায়,—দিদির হাতের ভাইফোঁটার ফোঁটাটির মতো,—"ঘরে বাইরে"র অমূল্য যা পেয়েছিল। যেটুকু পায় সেটুকুও তার প্রাপ্যের অধিক, প্রাপ্য যে তার কিছুই নেই, সে শুধু নাম ধরে ডেকে সুখ পায়, প্রাণ দিয়ে আনন্দ পায়, ক্লেশ পেয়ে তৃপ্তি পায়।

জগতের চিরন্তন প্রেমিক এরা,—এই কিশোরের দল। প্রেমের মধ্যে নিহিত আছে এক প্রকার কৈশোর, এক প্রকার শ্যামলতা। তাই শ্রীকৃষ্ণ কিশোর, শ্রীরাধা কিশোরী। যে-প্রেম এদের মধ্যে মূর্ত, এদের মধ্যে স্ফূর্ত, সে-প্রেম সবুজ, সে প্রেম কাঁচা। এদেরও প্রাণের ভয় নেই, এদেরও সাহস

অসামান্য। কিন্তু এদের মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার সেই নেশা নেই, যা রঞ্জনদের শতধা-উদ্ভিন্ন প্রস্ফুট যৌবন-শতদলের লোহিত রাগের মধ্যে আছে। এদের ঐশ্বর্য নেই, আনন্দ আছে। রঞ্জনের প্রেমের রঙ রাঙা, রক্তকরবী যার প্রতিরূপক। কিশোরের প্রেমের রঙ সবুজ।

একটি মানুষ নন্দিনীকে গান শোনাবার আনন্দটুকু চেয়েছিল ও পেয়েছিল। সে বিশু-পাগল। সে দুঃখবিলাসী, সে বিরহরসিক। তার দুঃখ কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার দুঃখ নয়, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার দুঃখ। সে নন্দিনীকে ভালবাসে বলেই তাকে চায়নি। না, চেয়েছে বৈকি! কিন্তু অন্তরের অন্তরালে। কিন্তু সে চাওয়া পরম চাওয়া, সবখানি চাওয়া। নন্দিনী কিন্তু রঞ্জনকে তা দিয়ে রেখেছিল। বিশুর ভাগে তাই জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের প্রীতি। বিশু যে বলেছিল—"অল্প কিছু দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রী করব না,"—সে কেবল আর একজন বলতে পারত, সে নিখিলেশ। বিশুর সঙ্গে নিখিলেশের মিল আছে। এরা পুরো পাওয়াটাকেই পছন্দ করে, তা না হলে পুরো না-পাওয়াটাকে। নিখিলেশ তবু বিমলাকে পাবার জন্য সাধনা করেছিল, অপেক্ষা করেছিল, আশা রেখেছিল। বিশুর তাও ছিল না, সে শুধু গোপনেই চাইত, প্রতিদিনের প্রত্যাশা রাখবার মতো ধৃষ্টতা তার ছিল না, তাই তার দুঃখ নিখিলেশের চেয়েও বেশী। নন্দিনীর যে-রূপটি তার ভালো লেগেছিল সে 'দুখ-জাগানিয়া'।

বিশু অনেক দুঃখ পেয়ে প্রেমের উদাসরূপ দেখেছিল। তার সুর ফসল-কাটার সুর। তার ভালোবাসায় না আছে কৈশোরের ভাবপ্রবণতা, দিয়ে-ফেলার উপচে পড়া রস, নাম ধরে ডাকার স্বপ্নমদির নেশা, ক্লেশ স্বীকারের অহেতুক ঝরে যাওয়া; না আছে যৌবনের প্রাণোজ্জ্বল বলদৃপ্ত সহজ জয়ের কাছে-আনা, দূরে-ছুঁড়ে-ফেলা, বুকে-দোলানো, পায়ে দলার ভাব। যৌবনের সোপানে দাঁড়িয়ে সে ত্যাগের অঙ্গে নেশা লাগায় না, ভোগের রাজ্যে বাহু বাড়ায় না। তার প্রেমে কিশোরের আবেশ বা রঞ্জনের স্বাচ্ছন্দ্য নেই, আছে একটি তপঃকরুণ উদাসমধুর ভাব। প্রেম পাবার ভরসা নেই, তাই জানাবারও সাহস নেই। সে যে কত বেশী চায় তা কেউ বুঝবে না, তাই নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার সুগভীর দুঃখ গানে গানে গালিয়ে ঝরিয়ে ছড়িয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের মনের একটি কোণে যে উদাসীটি আছে সে তাঁর নানা রচনায় বিশুর মতো রূপ নিয়েছে,—সে এক নিত্যকালের ক্ষ্যাপা। তার "দশা দেখে

হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়, একেবারে পেতে চায় পরশ-পাথর !" ব্যথার আনন্দে আপনভোলা, শুধু আনন্দ বেঁটে বেড়ায় সে, কোথাও ঠাকুরদাদা, কোথাও দাদাঠাকুর। সে "মুক্তধারা"র বৈরাগী, "ফাল্গুনী"র অন্ধ বাউল ; শান্ত-সমাহিত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ, আপনাকে সে লুকিয়ে রাখে নিজের চারপাশে গানের বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করে। ধরা তো সে দেয় না, তাকে কেই বা বুঝবে, কেই বা জানবে ? তার গোপনতম কামনা, "তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।" তাই জ্ঞানীর কাছে সে সাজে সাধারণ, সাধারণের কাছে সমদরদী, সকলের কাছে পাগল। ফাগু-চন্দ্রার দল তার গানটুকুই নেয়, বাকিটুকু যার জন্যে সে তার খোঁজ রাখে না। তাই বিশুর মতো নিঃসঙ্গ আর কেউ নয়। সে সেই প্রেম, যা ধরা দেয় না, অপেক্ষা করে, ধরতে চায় না, ছাড়া দেয়। এর রঙ সবুজ নয়, রাঙা নয়, গৈরিক। কেননা, এর বোঁটা আলগা হয়ে এসেছে।

নন্দিনী ভালবাসে প্রাণের রং।- সে রঙ সবুজে সবে উন্মেষিত হচ্ছে, গৈরিকে নিঃশেষ হতে চলেছে, রক্তেই তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। গৈরিক ফসল-কাটার রং, পাকা ধানের রং ; সবুজ গজিয়ে ওঠার রং, কাঁচা ধানের রং। আর লোহিত আমাদের বক্ষের শোণিত, যৌবন যাকে নাচিয়ে ফেনিয়ে উথলিয়ে উপচিয়ে চলে। রক্তকরবী সেই রঙের নেশার রঙ্‌মশাল। রঞ্জন তাকে ভালবাসে, নন্দিনী তাকে সিঁথিতে পরে, কিশোর তাকে আহরণ করে এনে দেয়।

নন্দিনী কাকে সব চেয়ে ভালবাসে তা তো জানলাম। কিন্তু নন্দিনীকে সবচেয়ে ভালোবাসে কে ? রঞ্জন নয়, সে আপনাকেই ভালবাসে, প্রাণের নেশায় প্রাণকেই বিলিয়ে বিলিয়ে যায়, হারিয়ে হারিয়ে যায়। বিশু নয়। তার চাওয়া অসামান্য চাওয়া, এই চাওয়াকেই সে ভালবাসে, এরই মর্যাদা রাখবে বলে সে যেটুকু পায় নেয় না।

নন্দিনীকে সবার চেয়ে ভালবাসে কিশোর। তারই প্রেমে পথে চলার সুরটি বাজে, সে সুর চিরকালের চিরনতুন সুর। সে ডাকে, "নন্দিনী নন্দিনী ···নন্দিনী···নন্দিনী !" এ যে অকারণে ডাকা, নামের নেশায় ডাকা, সব-চাওয়া, সব-পাওয়া ডাকার আনন্দে গলিয়ে দিয়ে ডাকা। বাঁশি কোন্ সুরে কাঁদে ? সে কি "আমি চাই, আমি পাই ? এর আসল কথাই যে-আমি ! না, বাঁশি বলে—"তুমি ! তুমি ! তুমি !" শুধু নাম ধরে ডেকেই তার আনন্দ। চেয়েও নয়, পেয়ে নয়, শুধু ভালোবেসেই তার তৃপ্তি।

# রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক

বুদ্ধদেব বসু

১.

বাংলায় স্বভাবকবি কথাটা বোধহয় প্রথম উচ্চারিত হয় গোবিন্দচন্দ্র দাসকে উপলক্ষ করে। কে বলেছিলেন জানি না, কিন্তু কোনো এক বোদ্ধা ব্যক্তিই বলেছিলেন, কেননা গোবিন্দচন্দ্রকে এই আখ্যা নির্ভুল মানিয়েছিলো, তাছাড়া এতে কবিদের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগের অস্ফুট উল্লেখ আছে সেটাকেও অর্থহীন বলা যায় না। 'নীরব কবি'র অস্তিত্ব উড়িয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভালো করেছিলেন, তাতে মূক-মিল্টনি কু-সংস্কারের উচ্ছেদ হ'লো, কিন্তু 'স্বভাবকবি' কথাটা যে টিকে গেলো তার রীতিমতো একটা কারণ আছে। অবশ্য সাধারণ অর্থে কবিমাত্রেই স্বভাবকবি, যেহেতু কোনোরকম শিল্প-রচনাই সহজাত শক্তি ছাড়া সম্ভব হয় না, কিন্তু বিশেষ অর্থে অনেক তার ব্যতিক্রম—বা বিপরীত—যদিও সেই উল্টো লক্ষণের এ-রকম কোনো সহজ সংজ্ঞার্থ তৈরি হয়নি। এই অর্থে 'স্বভাবকবি' বলতে শুধু এটুকু বোঝায় না যে ইনি স্বভাবতই কবি—সে কথা না বললেও চলে; বোঝায় সেই কবিকে, যিনি একান্তই হৃদয়নির্ভর প্রেরণায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ যিনি যখন যেমন প্রাণ চায় লিখে যান, কিন্তু কখনোই লেখার বিষয়ে চিন্তা করেন না, যার মনের সংসারে হৃদয়ের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সতিন সম্বন্ধ। এ কথা সত্য যে কবিতায় আবেগের তাপ না থাকলে কিছুই থাকে না, কিন্তু সেই আবেগটিকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দিতে হ'লে তার দাস হ'লে চলে না, তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে শাসন করতে হয়। এই শাসন করার, নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যেখানে নেই, সেখানেই এই বিশেষ অর্থে 'স্বভাবকবিত্ব' আরোপ করতে পারি। এই লক্ষণ কবিদের মধ্যে বর্তায় কখনো বা ব্যক্তিগত কারণে আর কখনো বা ঐতিহাসিক কারণে; কেউ কেউ স্বভাবতই স্বভাবকবি, আবার কোনো কোনো সময়ে সাহিত্যের অবস্থার ফলেই স্বভাবকবি তৈরি হ'য়ে থাকে।

গোবিন্দচন্দ্র দাসকে বলা যায় স্বভাবতই স্বভাবকবি, একেবারে খাঁটি অর্থে তা-ই ; কেননা হার্দারসের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অসংযমজনিত পতনের তিনি উল্লেখ্য উদাহরণ, উপরন্তু তাঁর রচনায় এই অদ্ভুত ঘোষণা পাই যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হ'য়েও তিনি রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বসুদ্ধ অনুভব করেন নি। অথচ এ কথাও নিশ্চিত বলা যায় না যে তিনি রাবীন্দ্রিক দীক্ষা পেলেই তাঁর ফাঁড়া কেটে যেতো, কেননা ঐ দীক্ষার ফলেও দুর্ঘটনা ঘটেছে, দেখা দিয়েছেন বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্বভাবকবিরা : রবি-রাজত্বের প্রথম পর্বে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে নজরুল ইসলাম পর্যন্ত, তাঁদের সংখ্যা বড়ো কম নয়।

এ-কথা বললে কি ভুল হয় যে বিশ শতকের আরম্ভকালে যাঁরা বাংলার কবি-কিশোর ছিলেন, স্বভাবকবিত্ব তাঁদের পক্ষে ঐতিহাসিক ছিলো, বলতে গেলে বিধিলিপি ? কেন ? অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই জন্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যাহ্ন তখন, তাঁর প্রতিভা প্রখর হ'য়ে উঠছে দিনে দিনে, আর যদিও সেই আলোকে কালো বলে প্রমাণ করার জন্য দেশের মধ্যে অধ্যবসায়ের অভাব ছিলো না, তবু তরুণ কবিরা অদম্য বেগে রবিচুম্বকে সংলগ্ন হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমন কবি নন, যাঁকে বেশ আরামে বসে ভোগ করা যায় ; তাঁর প্রভাব উপদ্রবের মতো, তাতে শান্তিভঙ্গ ঘটে, থেই হারিয়ে ভেসে যাবার আশঙ্কা তার পদে পদে। তিনি যে একজন খুব বড়ো কবি তা আমরা অনেক আগেই জেনে গিয়েছি, কিন্তু যে-কথা আজও আমরা ভালো ক'রে জানি না—কিংবা বুঝিনা—সে কথা এই যে বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান। তবু আজকের দিনে তাঁর সম্মুখীন হবার সাহস পাওয়া যায়, কেননা ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্যে আরো কিছু ঘ'টে গেছে—কিন্তু বিশ শতকের প্রথম দশকে—দ্বিতীয় দশকেও কী অবস্থা ছিলো ? অপরিসর, ক্ষীণপ্রাণ বাংলা সাহিত্য—তার মধ্যে এই বহ্নিবীজ, আগ্নেয় সত্তা : এ কি সহ্য করা যায় ? না ;—দাশরথি রায়ের নেহাৎ চাতুরী, রামপ্রসাদের কড়াপাকের ভক্তি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ফিটফাট সাংবাদিকতা, এমন কি মধুসূদনের তূর্যধ্বনি—আগে যখন এর বেশি আর কিছু নেই, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবে বিস্মিত, মুগ্ধ, বিচলিত, বিব্রত, ক্রুদ্ধ এবং অভিভূত হওয়া সহজ ছিলো, কিন্তু সহজ ছিলো না তাঁকে সহ্য করা, এমনকি—সেই প্রথম সংঘাতের সময়—গ্রহণ করাও সম্ভব ছিলো না। এর প্রমাণ দু-দিক থেকেই পাওয়া যায় ; সমালোচনার মহলে নিন্দার অবিরাম

উত্তেজনায়, আর কাব্যের ক্ষেত্রে উত্তরপুরুষের প্রতিরোধহীন আত্মবিলোপে। উপরন্তু অন্য প্রমাণও মেলে, যদি পাঠকমণ্ডলীর মতিগতি লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথের পাঠক সংখ্যা আজ পর্যন্ত অল্প—তাঁর খ্যাতির তুলনায়, তাঁর বিচিত্র বিপুল পরিমাণের তুলনায় অল্প; আর যারা বাংলাদেশের পাঠকসাধারণ, বড়ো অর্থে পারিক, তারা কিছুদিন আগে পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথের স্বাদ নিয়েছে—রবীন্দ্রনাথে নয়, তাঁরই দুই তরলিত, আরামদায়ক সংস্করণে: গদ্যে শরৎচন্দ্রে, আর পদ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে।

বাঙালি কবির পক্ষে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক বড়ো সংকটের সময় গেছে। এই অধ্যায়ের কবিরা—যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কিরণধন এবং আরো অনেকে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁদের কুলপ্রদীপ, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্য বয়সে উদ্গত হ'য়ে নজরুল ইসলামের উত্থানের পরে ক্ষয়িত হলেন—তাঁদের রচনা যে এমন সমতলরকম সদৃশ, এমন আশুক্লান্ত, পাণ্ডুর, মৃদুল, কবিতে-কবিতে ভেদচিহ্ন যে এত অস্পষ্ট, একমাত্র সত্যেন্দ্র দত্ত ছাড়া কাউকেই যে আলাদা ক'রে চেনা যায় না—আর সত্যেন্দ্র দত্তও যে শেষ পর্যন্ত শুধু 'ছন্দোরাজ'ই হ'য়ে থাকলেন—এর কারণ, আমি বলতে চাই, শুধুই ব্যক্তিগত নয়, বহুলাংশে ঐতিহাসিক। এ-সব লক্ষণ থেকে সংগত মীমাংসা, এই কবিদের শক্তির দীনতা নয়, কেননা বিচ্ছিন্নভাবে ভালো কবিতা এঁরা অনেকেই লিখেছেন—সে মীমাংসা এই যে তাঁরা সকলেই এক অনতিক্রম্য, অসহ্য দেশের অধিবাসী কিংবা পরবাসী। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ, এবং অসম্ভব ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথের অনতি-উত্তর তাঁরা বড্ড বেশি কাছাকাছি ছিলেন; এ-কথা তাঁরা ভাবতে পারেন নি যে গুরুদেবের কাব্যকলা মারাত্মকরূপে প্রতারক, সেই মোহিনী মায়ার প্রকৃতি না বুঝে শুধু বাঁশি শুনে ঘর ছাড়লে ডুবতে হবে চোরাবালিতে। যাদের কৈশোর যৌবনে প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার তরী'র পর 'চিত্রা', 'চিত্রা'র পর 'কথা ও কাহিনী'; আর তার পরে 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'গীতাঞ্জলি'—সেই মায়ায় না মজে কোনো উপায় ছিলো না তাঁদের;—সুর শুনে যে-ঘুম ভাঙবে সেই ঘুমই তাঁদের বরণীয় হ'লো; স্বপ্নের তৃপ্তিতে বিলীন হলো আত্মচেতনা; জন্ম নিলো এই মনোরম মতিভ্রম যে, ঝিনিঝিনি ছন্দ বাজালেই রাবীন্দ্রিক স্পন্দন জাগে, আর জলের মতো তরল হলেই স্রোতস্বিনীর গতি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না, অনুষ্ঠানের

ঐকান্তিকতায় স্বরূপচিন্তার সময় পেলেন না; তাঁদের কাছে এ-কথাটি ধরা পড়লো না যে রবীন্দ্রনাথের যে গুণে তাঁরা মুগ্ধ, সেই সরলতা প্রকৃতপক্ষেই জলধর্মী, অর্থাৎ তিনি সরল শুধু উপর-স্তরে, শুধু আপতিকরূপে, কিন্তু গভীর দেশে অনিশ্চিত ও কুটিল; স্রোতে প্রতিস্রোতে আবর্তে নিতামথিত; আরো গভীরে ঝড়ের জন্মস্থল, আর হয়তো—এমনকি—খরদন্ত মকর-নক্রের দুঃস্বপ্ন নীড়। যে আশ্রমে তাঁরা স্থিত হলেন, সেই মহাকবির জঙ্গমতা তাঁরা লক্ষ্য করলেন না, যাত্রার মন্ত্র নিলেন না তাঁর কাছে, তাঁকে ঘিরেই ঘুরতে লাগলেন, তারই মধ্যে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হলেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁরা ঠিক তাই করলেন যা রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই করেন নি। এই ভুলের জন্য, ভুল বোঝার জন্য—তাঁদের লেখায় দেখা দিলো সেই ফেনিলতা সেই অসহায়, অসংবৃত উচ্ছ্বাস, যা 'স্বভাবকবি'র কুলক্ষণ;—শৈথিল্যকে স্বতঃস্ফূর্তি বলে; আর তন্দ্রালুতাকে তন্ময়তা ব'লে ভুল করলেন তাঁরা;—আর ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হলেন এই এই কারণে যে রবি-তাপে 'আত্মাহুতি' দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক করে গেছেন।

২.

আবার বলি, এরকম না হ'য়ে উপায় ছিলো না সে-সময়ে, অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে ছিলো না। এ কথাটা বাড়াবাড়ির মতো শোনাতে পারে। কিন্তু রবি-প্রতিভার বিস্তার, আর তার প্রকৃতির বিষয়ে চিন্তা করলে এ-বিষয়ে প্রত্যয় জন্মে। আমাদের পরম ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মহাকবিকে পাবার জন্য কিছু মূল্যও দিতে হয়েছে আমাদের—দিতে হচ্ছে। সে মূল্য এই যে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার কাজটি তিনি অনেক বেশি কঠিন করে দিয়েছেন। একজনের বেশি রবীন্দ্রনাথ সম্ভব নয়; তারপরে কবিতা লিখতে হলে এমন কাজ বেছে নিতে হবে যে-কাজ তিনি করেন নি; তুলনায় তা ক্ষুদ্র হ'লে—ক্ষুদ্র হবারই সম্ভাবনা—তা-ই নিয়েই তৃপ্ত থাকা চাই। আর এইখানেই উল্টো বুঝেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়। তাঁদের কাছে, রবীন্দ্রনাথের পরে, কবিতা লেখা কঠিন হওয়া দূরে থাক, সীমাহীনরূপে সহজ হ'য়ে গেলো, ছন্দ, মিল, ভাষা, উপমা, বিচিত্ররকমের স্তবক বিন্যাসের নমুনা—সব তৈরি আছে, আর কিছু ভাবতে হবে না, অন্য কোনো দিকে তাকাতে হবে না, এই রকম একটা পুষ্টপোষিত মোলায়েম মনোভাব নিয়ে তাঁদের কবিতা

লেখার আরম্ভ এবং শেষ। রবীন্দ্রনাথ যা করেন নি, তাঁদের কাছে করবারই যোগ্য ছিলো না সেটা—কিংবা তেমন কিছুর অস্তিত্বই ছিলো না; রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন, ক'রে যাচ্ছেন, তাঁরাও ঠিক তা-ই করবেন, এত বড়োই উচ্চাশা ছিলো তাঁদের। আর এই অসম্ভবের অনুসরণে তাঁরা যে এক পা এগিয়ে তিন পা পিছনে হটে যাননি, তারও একটি বিশেষ কারণ রবীন্দ্রনাথেই নিহিত আছে। রবীন্দ্রনাথে কোনো বাধা নেই—আর এইখানেই তিনি সবচেয়ে প্রতারক—তিনি সব সময় দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টানেন, কখনো বলেন না 'সাবধান! তফাৎ যাও!' পরবর্তীদের দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর মধ্যে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে ভক্তির সঙ্গে সুবুদ্ধি-জাগানো ভয়ের ভাবও জাগতে পারে। দান্তের মতো, গেটের মতো, স্বর্গ-মর্ত্য-নরক-ব্যাপী বিরাট কোনো পরিকল্পনা নেই তাঁর মধ্যে। সেই শেক্সপীয়রের মতো অমর চরিত্রের চিত্রশালা, এমনকি মিল্টনের মতো বাক্যবন্ধের বৃহৎরচনাও নেই। তাঁকে পাঠ করার অভিজ্ঞতাটি একেবারেই নিষ্কণ্টক; আমাদের সঙ্গে তাঁর মিলনে যেন মৃণালসূত্রেরও ব্যবধান নেই; কোনোখানেই তিনি দুর্গম নন, নিগূঢ় নন—অন্তত বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয়; একবারও তিনি অভিধান পাড়তে ছোটান না আমাদের, চিন্তার চাপে ক্লান্ত করেন না, অর্থ খুঁজতে খাটিয়ে নেন না কখনো। আর তাঁর বিষয়বস্তু—তাও বিরল নয়, দুষ্প্রাপ্য নয়, কোনো বিস্ময়কর বহুলতাও নেই তাতে; এই বাংলাদেশের প্রকৃতির মধ্যে চোখ মেলে, দু-চোখ ভ'রে যা তিনি দেখেছেন তা-ই তিনি লিখেছেন, আবহমান ইতিহাস লুঠ করেননি, পারাপার করেননি বৈতরণী অলকনন্দা। এইজন্য তাঁর অনুকরণ যেমন দুঃসাধ্য, তার প্রলোভনও তেমনি দুর্দম। মনে হচ্ছে 'আমিও অমন লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি' এই সর্বনাশী ধারণাটিকে সব দিক থেকেই প্রশ্রয় দেয় তাঁর রচনা, যাতে আপাত-দৃষ্টিতে পাণ্ডিত্যের কোনো প্রয়োজন নেই, যেন কোনো প্রস্তুতিরও নয় এতই সহজে তা বয়ে চলে, হয়ে যায়—মনে হয় ওরকম লেখা ইচ্ছে করলেই লেখা যেতে পারে—একটুখানি 'ভাব' আসার শুধু অপেক্ষা। অন্তত পক্ষে আলোচ্য কবিরা এই মোহেই মজেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'মতো' হ'তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথেই হারিয়ে গেলেন তাঁরা—কি বড়ো জোর তাঁর ছেলেমানুষি সংস্করণ লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিজেই নিজেকে ব্যক্ত করে, অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; এই নির্ভরতা, এই স্বচ্ছতার জন্য, পরবর্তীর পক্ষে বিপজ্জনক

উদাহরণ তিনি। যেহেতু তাঁর লেখায় পাঠকের কোনো পরিশ্রম নেই, তাই এমন ভুলও হ'তে পারে যে চোখ ফেললেই সবটুকু তাঁর দেখে নেয়া যায়; যেহেতু তাঁর বিষয়ের মধ্যে দৃশ্যমান ব্যাপ্তি নেই, তাই এমনও ভুল হ'তে পারে যে, ক্ষুদ্রতর কবিদের পক্ষে তাঁর পথই প্রশস্ত। 'আমরা যাকে বলি ছেলেমানুষি, কাব্যের বিষয় হিসাবে সেটা অতি উত্তম, রচনার রীতি হিসাবেই সেটা উপেক্ষার যোগ্য'—রবীন্দ্রনাথের এই বাক্যটিতে তাঁর নিজের এবং অন্য কবিদের বিষয়ে অনেক কথাই বলা আছে। কথাটা তিনি বলেছিলেন 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর 'মানসী'-পূর্ব কবিতাবলীকে লক্ষ্য ক'রে, সে-সব কবিতার দুষ্যতা তিনি দেখেছিলেন, উপাদানের অভাবে নয়, রূপায়ণের অসম্পূর্ণতায়। উপাদান বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখলে তাঁর পরিণত কালের অনেক অনেক কবিতাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রভাতসঙ্গীতে'র সধর্মী, এমনকি সমগ্র ভাবে তাঁর কাব্যই তা-ই; তাঁর কাব্যের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এই 'ছেলেমানুষি', যাকে তিনি বিষয় হিসেবে 'অতি উত্তম' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'ছেলেমানুষি'র মানে হ'লো, তাঁর কবিতা বাইরে থেকে সংগ্রহ করা নানা রকম পদার্থের সন্নিপাত নয়, ভিতর থেকে আপনি হ'য়ে-ওঠা, যেন ঠিক মনের কথাটির অবারিত উচ্চারণ। চারিদিকের প্রত্যক্ষ এই পৃথিবী দিনে দিনে যেমন ক'রে দেখা দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর চোখের সামনে, নাড়া দিয়েছে তাঁর মনের মধ্যে, তা-ই তিনি অফুরন্ত বার বলেছেন; প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের সাড়া, মুহূর্তের বৃন্তের উপর ফুটে ওঠা পলাতক এক-একটি রঙিন বেদনা—তাই ধরে রেখেছেন তাঁর কবিতায়, আর কবিতার চেয়েও বেশি তাঁর গানে। এইজন্য তাঁর কবিতা এমন দেহহীন, বিশ্লেষণ-বিমুখ; তার 'সারাংশ' বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাকে দেখানো যায়না ভাঁজে ভাঁজে খুলে; যেটা কবিতা আর যেটা পাঠকের মনে তার অভিজ্ঞতা, ও দুয়ে কোনো তফাৎই তাতে নেই যেন; তা আমাদের মনের উপর যা কাজ করবার ক'রে যায়। কিন্তু কেমন ক'রে তা করে আমরা ভেবে পাইনা, সমালোচনার কলকব্জা দিয়েও ধরতে পারি না সেই রহস্যটুকু;—শেষ পর্যন্ত হার মেনে বলতে হয় তা যে হ'তে পেরেছে তাই যথেষ্ট, তা ভালো হয়েছে তার অস্তিত্বেরই জন্য—আর কোনোই কারণ নেই তার।

এই রকম কবিতা জীবনের পক্ষে সম্পদ, কিন্তু তার আদর্শ অনবরত চোখের সামনে থাকলে অন্য কবিরা বিপদে পড়েন। বিপদটা কোথায় তা

বুঝিয়ে বলি। সব মানুষেরই অনুভূতি আছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আছে; যখন দেখা যায় যে তারই প্রকাশ আশ্চর্যভাবে কবিতা হ'য়ে উঠছে আর সেই প্রকাশটাও 'নিতান্তই সোজাসুজি' তার পিছনে কোনো আয়োজন আছে বলে মনেই হয় না, তখন যে-কোনো রকম অনুভূতির কাছেই আত্মসমর্পণের লোভ জাগে অন্য কবিদের, কিংবা খাঁটি বস্তুটির অভাবে— নিজেরাই তাঁরা নিজের মনকে উশকে তোলেন। আর তার ফল কী-রকম দাঁড়ায় তারই শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ পাই—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তে। অনেকের মধ্যে তাঁকে বেছে নিলুম সুস্পষ্ট কারণে; সমসাময়িক, কাছাকাছি বয়সের কবিদের মধ্যে রচনাশক্তিতে শ্রেষ্ঠ তিনি, সর্বতোভাবে যুগপ্রতিভূ, এবং রবীন্দ্রনাথের পাশে রেখে দেখলেও তাঁকে চেনা যায়। হ্যাঁ, চেনা যায়, আলাদা একটা চেহারা ধরা পড়ে, কিন্তু সেই চেহারাটা কী রকম তা ভাবলেই আমরা বুঝতে পারবো, কেন, রবীন্দ্রনাথ পড়া থাকলে, আজকের দিনে সত্যেন্দ্রনাথের আর প্রয়োজন হয় না। তফাৎটা জাতের নয়, তা বলাই বাহুল্য; একই আন্দোলনের অন্তর্গত জ্যেষ্ঠ এবং অনুজ কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যও নয় এটা; আবার বড়ো কবি ছোট কবির তফাৎ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাও একে বলা যায় না। ইনি ছোট কবি না বড়ো কবি, কিংবা কত বড়ো কবি— সমালোচনার কোন-এক প্রসঙ্গে এ-সব প্রশ্ন অবান্তর; ইনি খাঁটি কবি কি না সেইটেই হলো আসল কথা। সত্যেন্দ্রনাথে এই খাঁটিত্বই পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের বিরাট মহাজনি কারবারের পর খুচরো দোকানদার হওয়াতে লজ্জার কিছু নেই, সেটাকে প্রায় অনিবার্য বলা যায়, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মালপত্রও আপাতদৃষ্টিতে এক ব'লে বাংলা কাব্যে তাঁর আসন এমন সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই সাজ সরঞ্জাম — সেই ঋতুরঙ্গ, পল্লীচিত্র, দেশপ্রেম; কিন্তু ফুল, পাখি, চাঁদ, মেঘ, শিশির, এইরকম প্রত্যেকটি শব্দের বা বস্তুর পিছনে রবীন্দ্রনাথে যে-আবেগের চাপ পাই, যে বিশ্বাসের উত্তাপ, যার জন্য 'যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে'র শততম পুনরুক্তিও আমাদের মনে নতুন ক'রে জাগিয়ে তোলে স্বর্গের জন্য বিরহবেদনা, সেই প্রাণবন্ত প্রবলতার স্পর্শমাত্র সত্যেন্দ্রনাথে পাই না, তাঁর কবিতা প'ড়ে অনেক সময়ই আমাদের সন্দেহ হয় যে তাঁর 'অনুভূতি'টাই কৃত্রিম, কবিতা লেখারই জন্য ফেনিয়ে তোলা। যে-স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথে দিব্যদৃষ্টি, কিংবা স্বপ্ন মানেই স্বপ্নভঙ্গ, সত্যেন্দ্রনাথে তা পর্যবসিত হ'লো দিবাস্বপ্নে, যে ফুল ছিলো বিশ্বসত্তার প্রতীক, তা' হয়ে উঠলো শৌখিন খেলনা, ভাবুকতা হ'লো

ভাবালুতা, সাধনা হ'লো ব্যসন, আর মানসসুন্দরীর পরিণাম হ'লো লাল পরী নীল পরীর আমোদ প্রমোদে। সেই সঙ্গে রীতির দিক থেকেও ভাঙন ধরলো; রবীন্দ্রনাথের ছন্দের যে মধুরতা, যে মদিরতা, তার অন্তর্লীন শিক্ষা, সংযম, রুচি, সমস্ত উড়িয়ে দিয়ে যে ধরনের লেখার প্রবর্তন হ'লো তাতে থাকলো শুধু মিহি সুর, ঠুনকো আওয়াজ, আর এমন একরকম চঞ্চল কিংবা চটপটে তাল, যা কবিতার অ-পেশাদার পাঠকের কানেও তক্ষুনি গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্যই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে তিনি ঠিক সেই পরিমাণে ভেজাল ক'রে নিয়েছিলেন, যাতে তা সর্বসাধারণের উপভোগ্য হ'তে পারে। তখনকার সাধারণ পাঠক রবীন্দ্রনাথে যা পেয়েছিলো, বা রবীন্দ্রনাথকে যেমন ক'রে চেয়েছিলো, তারই প্রতিমূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ, শুধু কর্ণসংযোগ ছাড়া আর কিছুই তিনি দাবি করলেন না পাঠকের কাছে, তাই তাঁর হাতে কবিতা হ'য়ে উঠলো লেখা-লেখা খেলা বা ছন্দোঘটিত ব্যায়াম। খেলা জিনিসটা সাহিত্য-রচনায় অনুমোদন-যোগ্য, যতক্ষণ তার পিছনে কোনো উদ্দেশ্য থাকে; সেটি না থাকলে তা নেহাৎই ছেলেখেলা হ'য়ে পড়ে।* আর এই উদ্দেশ্যহীন কসরৎ, শুধু ছন্দের জন্যই ছন্দ লেখা। এই প্রকরণগত ছেলেমানুষি, কোনো এক সময়ে ব্যাপক হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো

---

* এই উদ্দেশ্য মানে-সুস্পষ্ট কোনো বিষয় নাও হ'তে পারে, অনেক সময় শুধু একটি অনুভূতি থেকেই জন্ম পায় রচনা, পায় সার্থকতার পক্ষে প্রয়োজনীয় সংহতি। উদাহরণত তুলনা করা যাক সত্যেন্দ্রনাথের 'ফুলফুল টুকটুক / টুকটুক ফুলফুল / কোন ফুল তার তুল / তার তুল কোন ফুল / টুকটুক রঙন / কিংশুক ফুল্ল / নয় নয় নিশ্চয় / নয় তার তুল্য, আর রবীন্দ্রনাথের 'ওগো বধূ সুন্দরী, / তুমি মধুমঞ্জরী, / পুলকিত চম্পার / লহো অভিনন্দন / পর্ণের পাত্রে / ফাল্গুন রাত্রে / মুকুলিত মল্লিকা / মাল্যের বন্ধন।' এ দুটি একই ছন্দে লেখা, প্রায় একই রকম খেলাচ্ছলে রচিত, আর কোনটিতেই স্পর্শসহ কোনো বক্তব্য নেই, কিন্তু কেন যে দ্বিতীয়টি ছন্দের আদর্শ হিসেবেও অতুলনীয় রূপে বেশি ভালো হয়েছে তার কারণ শুধু অনুপ্রাস আর যুক্তবর্ণের বিতরণ দিয়েই বোঝানো যাবে না, তার কাব্যগুণের কথাটাই এখানে আসল। প্রথম উদাহরণটি অনুভব ক'রে লেখা হয়নি, নেহাৎই যান্ত্রিকভাবে বানানো হয়েছে, তাই ওর ছন্দটাও এমন কাঁচা, এমন বালকোচিত। 'ওগো বধূ সুন্দরী'তে প্রাণের যে স্পর্শটুকু আছে, যার জন্য ওটি কবিতা হ'তে পেরেছে, তার ছন্দনৈপুণ্যের মূল কারণটা সেখানেই খুঁজতে হবে। কথাটা এই যে ভালো কবি না হ'লে ভালো ছন্দও লেখা যায় না; যিনি যত বড়ো কবি কলাকৌশলেও তত বড়োই অধিকার তাঁর; আর যিনি শুধু ছন্দ লেখেন, আর সেইজন্য 'ছন্দোরাজ' আখ্যা পেয়ে থাকেন, তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত ছন্দ বিষয়েও শেখবার কিছু থাকে না।

বাংলা কাব্যে ; সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতির চরমে, যখন, এমনকি তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে ছাপিয়ে উঠেছিলো, সেই সময়ে যে-সব ভূরিপরিমাণ নির্দোষ, সুশ্রাব্য এবং অন্তঃসারশূন্য রচনা 'কবিতা' নাম ধ'রে বাংলা ভাষার মাসিকপত্রে বোঝাই হ'য়ে উঠেছিলো, কালের করুণাময় সম্মার্জনী ইতিমধ্যেই তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথের, তারপর তাঁর শিষ্যদের হাতে সাত দফা পরিস্রুত হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত যখন ঝুমঝুমি কিংবা লজঞ্চুষের মতো পদ্যরচনায় পতিত হ'লো, তখনই বোঝা গেল যে ওদিকে আর পথ নেই—এবার ফিরতে হবে।

৩.

সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু ঐতিহাসিক অবস্থাটি দেখাতে চাচ্ছি। তাঁদের স-পক্ষে যা-কিছু বলবার আছে তা আমি জানি; প্রবন্ধের প্রথম অংশে পরোক্ষভাবে তা বলাও হয়েছে। সময়টা প্রতিকূল ছিল তাঁদের, বড্ড বেশি অনুকূল বলেই প্রতিকূল ছিলো; রবিরশ্মিকে প্রতিফলিত করা—এ ছাড়া আর কবিকর্মের ধারণাই তখন ছিলো না। গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনতিপরেই দু-জন রবিভক্ত অথচ মৌলিক লেখকের সাক্ষাৎ পাই আমরা—প্রমথ চৌধুরী আর অবনীন্দ্রনাথ; কিন্তু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উত্থান এমনই সর্বগ্রাসী হয়েছিলো যে তার বিস্ময়জনিত মুগ্ধতা কাটিয়ে উঠতেই দু-তিন দশক কেটে গেলো বাংলাদেশের। এই মাঝখানকার সময়টাই সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠীর সময়; রবীন্দ্রনাথের প্রথম এবং প্রচণ্ড ধাক্কাটা তাঁরা সামলে নিলেন—অর্থাৎ পরবর্তীদের সামলে নিতে সাহায্য করলেন; তাঁদের কাছে গভীরভাবে ঋণী আমরা। এই শেষের কথাটা শুধু বিচার ক'রে বলছি না, এ বিষয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতাপ্রসূত অধিকার আছে আমার। কৈশোরকালে আমিও জেনেছি রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেও অন্যায় মনে হ'তো—যেন রাজদ্রোহের শামিল; আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের আকর্ষণ—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার; আর অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব ব'লেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে

হৈ-হৈ ক'রে নজরুল ইসলাম * এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।

নজরুল ইসলামকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাবকবি বলেছি; সে কথা নির্ভুল। পূর্বোক্ত প্রকরণগত ছেলেমানুষি তাঁর লেখার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে; রবীন্দ্রনাথের আক্ষরিক প্রতিধ্বনি তাঁর 'বলাকা' ছন্দের প্রেমের কবিতায় যেমনভাবে পাওয়া যায়, তেমন কখনো সত্যেন্দ্রনাথে দেখি না; আর সত্যেন্দ্রনাথেরও নিদর্শন তাঁর রচনার মধ্যে প্রচুর। নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংস্কৃত, প্রগল্‌ভ; তাতে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই; আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন, তাঁর নিজের মধ্যে কোনো বদল ঘটেনি কখনো, তাঁর কুড়ি বছর আর চল্লিশ বছরের লেখায় কোনোরকম প্রভেদ বোঝা যায় না। নজরুলের দোষগুলি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমস্ত দোষ ছাপিয়ে ওঠে; সব সত্ত্বেও একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি। সত্যেন্দ্রনাথ, শিল্পিতার দিক থেকে, অন্তত তাঁর সমকক্ষ, সত্যেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যও কিছু বেশি; কিন্তু এ-দু'জন কবিতে পার্থক্য এই যে সত্যেন্দ্রনাথকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথেরই সংলগ্ন, কিংবা অন্তর্গত, আর নজরুল ইসলামকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পরে অন্য একজন কবি—ক্ষুদ্রতর নিশ্চয়ই, কিন্তু নতুন। এই যে নজরুল, রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্য-সাধন করলেন, এটাও খুব সহজেই ঘটেছিলো, এর পিছনে সাধনার কোনো ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিলো এটা। কবিতার যে আদর্শ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, নজরুলও তা-ই; কিন্তু নজরুল বৈশিষ্ট্য পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের পটভূমিকার ভিন্নতায়। মুসলমান তিনি, সেই সঙ্গে হিন্দু মানসও আপন ক'রে নিয়েছিলেন—চেষ্টার দ্বারা নয়, স্বভাবতই। তাঁর বাল্য কৈশোর কেটেছে— শহরে নয়, মফস্বলে, স্কুল-কলেজে 'ভদ্রলোক' হবার চেষ্টায় নয়, যাত্রাগান লেটো গানের আসরে; বাড়ি থেকে পালিয়ে রুটির দোকানে, তারপর সৈনিক

* অবশ্য একটি বিরুদ্ধ ভাবও দেশের মধ্যে একই সময়ে সক্রিয় ছিলো, কিন্তু তার সমস্তটাই সমালোচনার ক্ষেত্রে, আর সেই সমালোচনাও বুদ্ধিমান নয়, শুধু ছিদ্রান্বেষী। যেটা সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিলো, সেটা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যাওয়া নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত রূপ চিনিয়ে দেয়া। এইখানে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বা বিপিনচন্দ্র পাল কোনো সাহায্য করেননি ব'লেই বাংলা কবিতার ভাঙা-গড়ায় তাঁরা একটুও আঁচড় কাটতে পারলেন না।

হ'য়ে। এই যেগুলো সামাজিক দিক থেকে তাঁর অসুবিধে ছিলো, এগুলোই সুবিধে হ'য়ে উঠলো যখন তিনি কবিতা লেখায় হাত দিলেন। যেহেতু তাঁর পরিবেশ ছিলো ভিন্ন, এবং একটু বন্য ধরনের, আর যেহেতু সেই পরিবেশ তাঁকে পীড়িত না ক'রে, উল্টে আরো সবল করেছিলো তাঁর সহজাত বৃত্তিগুলোকে, সেইজন্য, কোনোরকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না দিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথের মুঠো থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত আনতে পারলেন। তাঁর কবিতায় যে-পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো, সে-পরিমাণে পুষ্টি যদিও ছিলো না, তবু অন্তত নতুনের আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগিয়েছিলেন ; তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব যদিও বেশি স্থায়ী হ'লো না। কিংবা তেমন কাজেও লাগলো না, তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব। যে আকাঙ্ক্ষা তিনি জাগালেন, তার তৃপ্তির জন্য চাঞ্চল্য জেগে উঠলো নানা দিকে, এলেন 'স্বপন-পসারী'র সত্যেন্দ্র-দত্তীয় মৌতাত কাটিয়ে, পেশীগত শক্তি নিয়ে মোহিতলাল, এলো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অগভীর—কিন্তু তখনকার মতো ব্যবহারযোগ্য—বিধর্মিতা, আর এই সব পরীক্ষার পরেই দেখা দিলো 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর নতুনতর প্রচেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরার ঘণ্টা বাজলো।

৪.

নজরুল ইসলাম নিজে জানেন নি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন ; তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই। যদি তিনি ভাগ্যগুণে গীতকার এবং সুরকার না হতেন, এবং যদি পারস্য গজলের অভিনবত্বে তাঁর অবলম্বন না থাকতো, তাহ'লে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথেরই আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তিনি। কিন্তু যে অতৃপ্তি তাঁর নিজের মনে ছিলো না, সেটা তিনি সংক্রমিত ক'রে দিলেন অন্যদের মনে ; যে প্রক্রিয়া অচেতনভাবে তাঁর মধ্যে শুরু হ'লো তা সচেতন স্তরে উঠে আসতে দেরি হ'লো না। যাকে 'কল্লোল' যুগ বলা হয়। তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠলো—বন্ধ্যা প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয়, অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হলো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবনদর্শনে

মানুষের অনস্বীকার্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন। এই বিদ্রোহে আতিশয্য ছিলো সন্দেহ নেই, কিছু আবিলতাও ছিলো, কিন্তু এর মধ্যে সত্য যেটুকু ছিলো তা উত্তরকালের অঙ্গীকরণের দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেছে। এর মূল কথাটা আর কিছু নয়—সুখস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করার, প্রতিরোধ করার পরিশ্রম। প্রয়োজন ছিলো এই বিদ্রোহের—বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও সত্য ক'রে পাবার জন্য। লক্ষ করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেইসব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত; অন্তত একজন যুবকের কথা আমি জানি। যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে। অত্যধিক মধুপানজনিত অগ্নিমান্দ্য বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না এটাকে, কেননা, চিকিৎসাও এরই মধ্যে নিহিত ছিলো, ছিলো স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান: 'নিজের কথাটা নিজের মতো ক'রে বলবো'—এই ইচ্ছেটা প্রবল হ'য়ে উঠেছিলো সেদিন, আর তার জন্যই তখনকার মতো রবীন্দ্রনাথকে দূরে রাখতে হ'লো। ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম চাইবো না, আতাফলের ফরমাশ দেবো—'শেষের কবিতা'র এই ঠাট্টাকেই তখনকার পক্ষে সত্য ব'লে ধরা যায়। * অর্থাৎ রবীন্দ্রতর হতে গেলে যে রবীন্দ্রনাথের ভগ্নাংশ মাত্র

---

* এর আগের লাইনেই অমিত রায় বলছে, 'এ কথা বলবো না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলবো অন্য কিছু চাই।' এটা একেবারেই খাঁটি কথা। কবিতার সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে ভালো আর আরো-ভালোর তফাৎটা তেমন জরুরি নয়, সমগ্রভাবে কবির সঙ্গে কবির তুলনাই এই তারতম্যের প্রয়োগের ক্ষেত্র। অর্থাৎ অন্যান্য বাঙালি কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যদিও অপরিমেয় ব্যবধান, তবু যে-কোনো ক্ষুদ্র কবির কোনো একটি ভালো কবিতা রবীন্দ্রনাথেরই 'সমান' ভালো হ'তে পারে, যদি তাতে বৈশিষ্ট্য থাকে থাকে চরিত্রের পরিচয়। আর এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ফজলি আম ফুরোবার পর চালান-দেয়া মাদ্রাজি আম অথবা আম্রগন্ধী পিরাশের চাইতে ঢের ভালো ঋতুপন্থী, প্রকৃতিজাত আতাফল, যেমন ভালো, মধুসূদনের পরে, 'বৃত্রসংহারে'র চাইতে 'সন্ধ্যাসংগীত'। 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের সাহিত্যিক বক্তৃতাটিতে 'কল্লোল' কালীন আন্দোলনেরই একটি বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—যদিও পরিহাসের ছলে, আর অবশ্য সাহিত্যের ইতিহাসের একটি সাধারণ নিয়মও লিপিবদ্ধ করেছেন। নিবারণ চক্রবর্তীর ওকালতি ভালোই হয়েছিলো, কিন্তু বক্তৃতার পর কবিতাটি যথেষ্ট পরিমাণে অ-রাবীন্দ্রিক হ'লো না ব'লেই তার মামলা ফেঁসে গেলো শেষ পর্যন্ত।

হতে হয় এই কথাটা ধরা পড়লো এতদিনে ;—কল্লোল গোষ্ঠীর লক্ষ্য হয়ে উঠলো রবীন্দ্রেতর হওয়া।

অবশ্য এইভাবে কথাটা বললে ব্যাপারটাকে যেন যান্ত্রিক ক'রে দেখানো হয়, খানিকটা জেদের ভাব ধরা পড়ে। জেদ একেবারেই ছিলো না তা নয়, স্রোতের টানে জঞ্জালও কিছু ভেসে এসেছিলো, কিন্তু এই বিদ্রোহের স্বচ্ছ রূপটি ফুটে উঠলো, যখন 'কল্লোলের' ফেনা কেটে যাবার পরে, চিন্তিত স্থিতিলাভের চেষ্টা দেখা দিলো, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়ে' আর 'কবিতা' পত্রিকায় নবীনতর কবিদের স্বাক্ষর পড়লো একে-একে। সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা হাওয়ার ধোঁয়া কাটাতে সাহায্য করলো ; এদিকে, নজরুলের চড়া গলার পরে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের হার্দ্য গুণের পরে, বাংলা কবিতায় দেখা দিল সংহতি, বুদ্ধিঘটিত ঘনতা, বিষয় এবং শব্দচয়নে ব্রাত্যধর্ম, গদ্য পদ্যের মিলন সাধনের সংকেত। বলা বাহুল্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে এইরকম পরিবর্তন কালপ্রভাবেই ঘ'টে থাকে, কিন্তু তার ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন কবির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যেরই প্রয়োজন হয়। আর বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য প্রচুর—কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুস্তর ; দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয়-চেতন সুধীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, আবার এ দু'জনের কারো সঙ্গেই অমিয় চক্রবর্তীর একটুও মিল নেই। তবু যে এই কবিরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভূত তার কারণ এঁরা নানা দিক থেকে নতুনের স্বাদ এনেছেন ; এদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ এই একটি ধরা পড়ে যে এঁরা পূর্বপুরুষের বিত্ত শুধু ভোগ-না ক'রে, তাকে সাধ্যমত সুদে বাড়াতেও সচেষ্ট হয়েছেন, এঁদের লেখায় যে-রকমেরই যা-কিছু পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথে ঠিক সে জিনিসটি পাই না। কেমন ক'রে রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারবো—অবচেতন, কখনো বা চেতন মনেই এই চিন্তা কাজ করে গেছে এঁদের মনে ; কোনো কবি, জীবনানন্দের মতো, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে স'রে গেলেন, আবার কেউ কেউ তাঁকে আত্মস্থ ক'রেই শক্তি পেলেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার। এই সংগ্রামে—'সংগ্রামই' বলা যায় এটাকে—এঁরা রসদ পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে, পেয়েছিলেন উপকরণরূপে আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণা। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধসূত্র অনুধাবন করলে ঔৎসুক্যকর ফল পাওয়া যাবে ; দেখা যাবে, বিষ্ণু দে

ব্যাঙ্গাত্মকতির তির্যক উপায়েই সহ্য করে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে, দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবন-ভুক্ পিশাচ-প্রমথর বর্ণনায়, রাবীন্দ্রিক বাক্যবিন্যাস প্রকাশ্যভাবেই চালিয়ে দিলেন ; আবার অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথেরই জগতের অধিবাসী হ'য়েও, তার মধ্যে বিস্ময় আনলেন প্রকরণগত বৈচিত্র্যে, আর কাব্যের মধ্যে নানারকম গন্ত বিষয়ের আমদানি ক'রে। অর্থাৎ, এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহন রূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন। সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়। 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'-এর বদলে 'গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো', আর 'কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা'র বদলে 'কলসি কাঁখে চলছি মৃদু তালে'—এই রকম আক্ষরিক অনুকরণেরই উপায়ে একটি উৎকৃষ্ট এবং মৌলিক কবিতা লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো এঁদের উদাহরণ সামনে ছিলো ব'লেই ; দশ বছর আগে এ-রকমটি হতেই পারতো না। সত্যেন্দ্র-গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করতেন নিজেরা তা' না জেনে—সেইটেই মারাত্মক হয়েছিলো তাঁদের পক্ষে ; আর এই কবিরা সম্পূর্ণ রূপে জানেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কত ঋণী এঁরা, আর সে-কথা পাঠককে জানতে দিতেও সংকোচ করেন না, কখনো কখনো আস্ত আস্ত লাইন তুলে দেন আপন পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে। এই নিষ্ঠুরতা, এই জোরালো সাহস—এটাই এঁদের আত্মবিশ্বাসের, স্বাবলম্বিতার প্রমাণ। ভাবীকালে এঁদের রচনা যে-রকমভাবেই কীটদষ্ট হোক না, এঁরা ইতিহাসে শ্রদ্ধেয় হবেন অন্তত এই কারণে যে বাংলা কবিতার একটি সংকটের সময়ে এঁরা মৌল সত্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন, যে সত্য-শিব-সুন্দরকে গুরুর হাত থেকে তৈরি অবস্থায় পাওয়া যায় না, তাকে জীবন দিয়ে সন্ধান করতে হয়, এবং কাব্যকলাও উত্তরাধিকারসূত্রে লভ্য নয়, আপন শ্রমে উপার্জনীয়।

নজরুল ইসলাম থেকে-সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী অবকাশ—এই কুড়ি বছরে বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রাশ্রিত নাবালক দশার অবসান হ'লো। এর পরে যাঁরা এসেছেন এবং আরো পরে যাঁরা আসবেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে আর কোনো ভয় থাকলো না তাঁদের, সে ফাঁড়া পূর্বোক্ত কবিরা কাটিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য অন্যান্য ছুটো একটা বিপদ ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে ; যেমন জীবনানন্দের পাক, কিংবা বিষ্ণু দে-র বা অন্য কারো কারো আবর্ত, যা থেকে চেষ্টা ক'রেও বেরোতে পারছেন না আজকের দিনের নবাগতরা! এতে

অবাক হবার বা মন খারাপ করার কিছু নেই ; এই রকমই হ'য়ে এসেছে চিরকাল ; পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের চাপেই পুরোনোর খোশা ফেটে যায়, ভিতর থেকে নতুন বীজ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন যাঁরা কবিতা লিখছেন আজকাল, তাঁরা অনেকেই দেখছি প্রথম থেকেই টেকনীক নিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত ;— সেটা কোথা থেকে এসেছে, তা আমি জানি, যথাসময়ে তার সমর্থনও করেছি, কিন্তু এখন সেটাকে দুর্লক্ষণ ব'লে মনে না ক'রে পারি না। 'চোরাবালি' কিংবা 'খসড়া' লেখার সময় যে সব কৌশল ছিলো প্রয়োজনীয়, আজকের দিনে অনেকটাই তার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ; আর তাছাড়া যখন ভঙ্গি নিয়ে অত্যধিক দুশ্চিন্তা দেখা যায়—যেমন চলতিকালের ইংরেজ-মার্কিন কাব্যে —তখনই বুঝতে হয় মনের দিক থেকে দেউলে হ'তে দেরি নেই। আমি এ-কথা বলে কলাসিদ্ধির প্রাধান্য কমাতে চাচ্ছি না, কিন্তু কলাকৌশলকে পুরো পাওনা মিটিয়ে দেবার পরেও এই কথাটি বলতে বাকি থাকে যে কবিতা লেখা হয়—স্বরব্যঞ্জনের চাতুরী দেখাতে নয়। কিছু বলবারই জন্য। আর সেই বক্তব্য যেখানে যত বড়ো, যত স্বচ্ছন্দ, তার প্রকাশ প্রকরণগত কৃতিত্বও সেখানেই তত বেশি পাওয়া যায়। মনে হয় এখন বাংলা কবিতায় নতুন ক'রে স্বাচ্ছন্দ্য-সাধনার সময় এসেছে, প্রয়োজন হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তিকে ফিরে পাবার। আর এইখানে রবীন্দ্রনাথ সহায় হতে পারেন, এ কথাটি বলতে গিয়েও থেমে গেলুম, যেহেতু আদি উৎস বিষয়ে কোনো পরামর্শ নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথাটা আজকের দিনে যে আর না-তুললেও চলে, সেটাই বাংলা কবিতার পরিণতির চিহ্ন; এবং রবীন্দ্রনাথেরও ভক্তিবন্ধন থেকে পরিত্রাণের প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যে আদিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন তিনি, বাংলা ভাষার রক্তে মাংসে মিশে আছেন ; তাঁর কাছে ঋণী হবার জন্য এমনকি তাঁকে অধ্যয়নেরও আর প্রয়োজন নেই তেমন, সেই ঋণ স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধরা যেতে পারে—শুধু আজকের দিনের নয়, যুগে-যুগে বাংলা ভাষার যে-কোনো লেখকেরই পক্ষে। আর যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে যাবে, সেখানেও, সুখের বিষয়, সম্মোহনের আশঙ্কা আর নেই, রবীন্দ্রনাথের উপযোগিতা, ব্যবহার্যতা ক্রমশই বিস্তৃত হ'য়ে, বিচিত্র হ'য়ে প্রকাশ পাবে বাংলা সাহিত্যে। তাঁর ভিত্তির উপর বেড়ে উঠতে হবে আগামী কালের বাঙালি কবিকে ; এইখানে বাংলা কবিতার বিবর্তনের পরবর্তী ধাপেরও ইঙ্গিত আছে।

# কবিতা বিচার

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১০

কবিতা সম্পর্কে যে সামান্য সচেতনতা ইদানীং বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে তাকে প্রগাঢ় করে তুলতে হলে ভালো কাব্য-সমালোচকের দরকার। খারাপ কাব্য-সমালোচকরা যে কবিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন তা নয়, বরং আত্মবোধ নিবেদন করার সংসাহস দেখিয়ে তাঁরা সমাজমনকে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করে যান। পরবর্তী কোনো ভালো সমালোচকের আবির্ভাবে খারাপ সমালোচকের আত্মবোধ যাচাই হয় এবং ভালো সমালোচক কবিতা সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় মতামত স্পষ্টতর করবার ভরসা পান। এই উপায়ে কবিতার আলোচনা বেড়ে চলে—কবিতার দিকে অনেকের নজর পড়ে। এখন কবিতার দিকে অনেক বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তি নজর দিতে পারছেন বলে আমাদের একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে কবি জীবনানন্দ দাশের স্মরণ-সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে। জীবনানন্দ সহজ কবি নন, দুর্বোধ্য ও দূরচার। তাঁর কুখ্যাতিও করেছেন বহু মান্তগণ্য ব্যক্তি। সে অবস্থা থেকে যে বাংলাদেশ উত্তীর্ণ হতে পেরেছে তা জানতে পারা একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। ইংরেজ কাব্য-সমালোচকেরা সম্প্রতি বলতে চান যে কবির অভিজ্ঞতাই কবিতা। কবিতা যদি কবির ব্যূহবন্দী থাকে, তাহলে সে ব্যূহ ভেদ করবার জন্যে সম্ভবত সপ্তরথীরই দরকার—একটি রথী সেই অভিমন্যু-চক্রে প্রবেশ করতে অসমর্থ। কথাটি নিরর্থক নয়। একটি কবির অভিজ্ঞতা জানতে হলে সপ্ত সমালোচক-রথীরই দরকার। 'ষড়ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং' যে কবি-চিত্ত, তাকে প্রদক্ষিণ করা এক ব্যক্তির কর্ম হতে পারে না। ষড়্-ইন্দ্রিয়ের পাশবদ্ধ বিশ্বরূপের দর্পণ হল কবিমানস—বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পর অন্তঃকরণ নামক ষষ্ঠেন্দ্রিয়ও কবি-দেহে নিযুক্ত থাকে; সুতরাং সেই অন্তঃকরণ-স্বরূপ মনের খবর জানতে না পারলে বা কবি তা জানিয়ে না গেলে, কবিতার পেছনে ঘোরাঘুরি করা অনর্থক।

সৎ কবি বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপ। বিশ্বচিত্র যেমন চাঞ্চল্য নিয়েও স্থিরতায় আসীন, সৎ কবির মানস-লোকও তেমনি চাঞ্চল্য ও স্থিরতা সন্ধানী। কিন্তু সন্ধান করলেই কি মানুষ বিশ্বরূপের সঙ্গে এক আসনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে? নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের গাঁটছড়া বাঁধা হতে পারে কিন্তু যা নিত্য তা থেকে যায়, অনিত্য ঝরে পড়ে—মানুষ তার মন নিয়ে বিশ্বচিত্র থেকে ধুয়ে মুছে যায়। আবার অবশ্য অনুরূপ সন্ধান নিয়ে মানুষ আসে কিন্তু তাতেও বা কি? সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-আকাশ যেমন স্থির তেমন প্রথমের স্থিরতায় কি দ্বিতীয় সন্ধানীর আবির্ভাব হতে পারে মানবজননীর গর্ভে? বিশ্বপ্রকৃতি যে ধাবমানতায় অস্থির তেমন ধাবমানতা মরদেহে কই? অতএব কবির বা যে-কোনো অবতারের (যিনি মানবদেহে অবতীর্ণ) বিশ্বরূপ-প্রাপ্তি ক্ষণকালের চেতনারাজ্যের বিষয়। 'আমি সূর্য'—বললেই কি সূর্য হওয়া যায়? সূর্যের ভাবে অনুরঞ্জিত করা যায় মাত্র চিত্ত। সেই ঝলমল-করা চিত্ত দেখে আমরা বিশ্বরূপভ্রমে পতিত হই। সৎ কবি যদি বিশ্বরূপ তাহলে তিনি যেমন ভ্রান্ত, তেমনি আমরা তাঁকে সে-আখ্যা দিয়ে ভ্রমে পতিত।

তার চাইতে বলা ভালো, সৎ কবি সৎ ব্যক্তি—মনকে তিনি আবৃত রাখতে নারাজ। বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর ইন্দ্রিয়ের দ্বার-পথে মানসিক দ্বারকায় পৌঁছুতে পারলে যে কাণ্ডকীর্তি-কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেয়—অহং-বোধে যে পৌরুষ জাগে তাঁর চেতনায় এবং শেষটায় বিনয়-বোধে যে নম্রতায় শায়িত হয় তাঁর শরীর, তার রেখাপাত করে যাওয়াই সৎ ব্যক্তির স্বরূপ, সৎ কবির কাব্য। তিনি অভিনেতা নন—এটুকু জানলেই তাঁকে সৎ কবি ভাবা যায়।

সমালোচক যদি কাব্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে উৎসুক হন তাহলে প্রথমত তাঁকে বিচার করতে হবে কাব্যের আন্তরিকতা। আমি রুশ-রণাঙ্গনে গিয়ে লড়াই করেছি, একথা অনায়াসে ছন্দে গেঁথে বা চমৎকার বাক্য ব্যবহার করে বলে যেতে পারি, কিন্তু এ-বক্তব্যে কতোটা মানসিক সততা রক্ষিত বা নিবেদিত হল এ বিষয়টি সমালোচককে পরিমাপ করে দেখতে হবে। 'আমি, শ্রেণীহীন, আমি জাতের নামে বজ্জাতি দেখেছি'—একথাটি কেউ বললেই যে সে আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করছে তা না-ও হতে পারে। সততা ও শঠতা হাত ধরাধরি করে চলছে যেকালে, সে কালে ও দিনে বাক্যাবলীর পরিমাপ খুব সাবধানে করতে হয়। সমালোচকের পরীক্ষা-শক্তির প্রাচুর্য না থাকলে এ-কাজ সম্পন্ন হয় না। কবির অভিজ্ঞতার সদসৎ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার

ক্ষমতা না থাকলে আর যে কর্মই হোক, কাব্য-সমালোচনার কর্মটি হয় না। কবিতা পড়ে ভালোলাগার ভাবটি হয়ত অনেক পাঠক লাভ করে থাকেন, কিন্তু তা থেকে এমন কথা বলা যায় না যে তেমন পাঠকই সৎ সমালোচক। সমালোচক ও পাঠক উভয়ে আত্মবোধই নিবেদন করেন সত্য, কিন্তু, নিবেদনের ভঙ্গীটি হয় পৃথক। এই পার্থক্য বিরাজিত থাকে বলেই একজন সমালোচক এবং অপরজন পাঠক। পাঠকের ভালো লাগে কাঁচা আবেগের খাতিরে কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তির কণ্ডুয়ন-চরিতার্থ হয় বলে। কিন্তু কাব্যগুণগ্রাহী সমালোচকের ভালো-লাগা সাহিত্য-শিল্পের একটি অদৃষ্টপূর্ব আলোর পথ সঞ্চার করে দিতে পারে। এমনও হয় যে কবি স্বয়ং সে আলোকপাত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না তাঁর কাব্য-রচনা কালে। কবি যে তাঁর অভিজ্ঞতার সমস্ত অলিগলি আলোকিত দেখে একটি কবিতা সৃষ্টি করেন তা নয়। সৃষ্টির পরও যে তিনি সেই বাক্‌বন্দী রচনাটির কারুকার্য সম্পর্কে সু-অবহিত হতে পারেন তা-ও নয়। বাক্ সামাজিক; বাক্ চিত্রপ্রদায়ক; চিত্র বিচিত্ররসদাতা। একটি বাক্‌বন্দী সৃষ্টি যে ক'টি রসচিত্র দিতে সমর্থ, তা স্রষ্টা কবির চাইতে অনেকস্থলে অবলোকনকারী সমালোচকরা ভালো বলতে পারেন। যে-রচনা কবির মনঃপূত হচ্ছে না, অনেকক্ষেত্রে সে-কবিতা কবিকে যশস্বী করেও তোলে, দেখা যায়। ধ্বনির স্বকীয় গুণের দরুণই তা হয়ে থাকে। তাই আমাদের মনে হয় কবিতা ভাষান্তরিতা হতে পারে না। ভাষান্তরিতা হয়ে যে-কবিতা কাব্যগুণ বজায় রাখে সে-কবিতায় কতকটা স্থায়ী ভাবরস আছে বলা যায়। কিন্তু ভাষা-শিল্পে ধ্বনি অবান্তর এবং স্থায়ী ভাব ও রসই সর্বস্ব, তা তো নয়। গুণী কাব্যরসিকের চোখ আর কান সমান সজাগ থাকে। কাব্য দু'টি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গী হয়ে তবে অন্তরেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে। চিত্র-গীতি চেতনায় যে রঙ ফলায় তা-ই কাব্যের আস্বাদিত রঙ।

তাহলে বল্‌তে হয় যে চোখ-কান থাকলেই চিত্রণ-রূপ দর্শন হয়না—চাই চেতনার অচ্ছোদ-সরসী। সৎ কবি সম্ভবত এই মানস-সরসীর মালিক। সৎ সমালোচক মানস-যাত্রীর কষ্টটুকু স্বীকার করে তবে সেই তীর্থে উপনীত হতে পারেন। তখন সলিল স্নানই তাঁকে বলে দেবে এ সরসী সহৃদয়—বৃহ গুহা-কুহক প্রভৃতি কিছুই নয়। কিন্তু মুস্কিল এই, চেতনার মুখোমুখি দাঁড়াতেই অনেকে শেখেননি—ফলে চোখ-কান-নির্ভর হয়ে স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় বা কুহকের কুয়াশায় বসবাস করে যান। যেমনি কবি, তেমনি তাঁর পাঠক ও সমালোচক এ

দুর্দশা ভুগতে পারেন। সমালোচক যদি কবিতায় ভোজবাজি দেখতে সুরু করেন, তাহলে কবি 'হা হতোঽস্মি' না বলে আর কিছুই বলতে পারেন না।

চেতনায় ফলিত চিত্র স্বপ্নে বা মত্তাবস্থায় ভোজবাজি দেখায়—কিন্তু শিল্পীর এলাকায় যখন তা বিবেচিত হয় তখন পরা বাস্তবতায় তা সুসমন্বিত রূপ ধারণ করে। পরা বাস্তবতা অতীতে পলায়িত মানবিক বা মানসিক জীবন। সে-জীবন যে ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিকের মতোই কতকগুলো গুণবিধৃত বস্তু এ-জ্ঞান নিয়ে যদি আমরা কবির যাদুর সম্মুখীন হই, তাহলে দেখতে পাবো মানুষের অতীত জীবন হতে আমাদেরই মতো কতকগুলো অনুভূতির ছবি কুড়িয়ে এনে কবি জোড়াতাড়া দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। কবির নিকট অতীতের একটি দেশের নাম নামমাত্রে পর্যবসিত নয়—সে-নামে সে-দেশ জীবন্ত তাঁর চিত্তে। এই জীবন্ততার কারকশক্তি ইতিহাস-চেতনা। মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাস যাঁর জানা নেই, তাঁর নিকট কবির অতীতচারণ 'ম্যাজিক' বলে প্রতীত হতে পারে। কিন্তু যিনি অতীতচারী তাঁর দৃষ্টিতে পরা-বাস্তব-সেবী কবি অত্যন্ত বেশি মানব—প্রগাঢ় ব্যক্তিসত্তা।

কিন্তু কবিকে এ-আদর্শে জানা হয়ত আমাদের দেশের নবীন রীতি নয়। যদি তা-ই সত্য হয়, তাহলে অতি দ্রুত সে-রীতির সংস্কার দরকার। অর্থাৎ বিপ্লবী সমালোচকের দরকার, যদি দ্রুতসংস্কারকে আমরা বিপ্লব আখ্যা দিই। অবশ্য বিপ্লবী সমালোচকের আবির্ভাবের আগেই বিপ্লবী কবির আবির্ভাব হচ্ছে বাংলায়, তা-ই জেনে আমরা সুখী।

২.

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বোধ সৌন্দর্য বা শ্রীতত্ত্বে নিহিত ছিল এবং সেই শ্রী হ'ল:

> "একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে, রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিশে যায়—একেই বলে অনুরাগ।" (অবতরণিকা—রবীন্দ্র রচনাবলী)।

সৌন্দর্যানুরাগ কবির বা শিল্পীর মনের পুরণো কথা। সৌন্দর্যের সঙ্গে

কল্যাণ এবং কুৎসিত, কুরূপের সঙ্গে অকল্যাণ মিতালি পাতায়, তা-ও ভারতীয় পুরাতন মানসিকতা। এই মানসিকতায় কবি-কৃতি রঞ্জিত করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বলেছিলেন উল্লেখিত উক্তির পর :

"কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা।"

কবির সামাজিক প্রয়োজন এ-কথাটি থেকে অনুভব করে নেওয়া যায়। সৌন্দর্য ও তার সঙ্গী কল্যাণের অনুরাগে মানুষের চেতনার দর্পণটিকে দীপ্তিময় করতে পারলে জীবনের থেকে নানাবিধ ঔদাসীন্য দূরীভূত হবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি 'কবি-সত্যে' উপনীত হয়েছিলেন যাকে প্রাচীন বাংলার নব্যন্যায়শাস্ত্রীরা 'অনিত্য'-প্রত্যক্ষ বলতেন। এই চেতনার বিষয় নিত্যতায় উত্তীর্ণ হতে পারত ঈশ্বরতত্ত্বে উপনীত হলে। রবীন্দ্রনাথও নিত্যতা, মহিমা, মুক্তি, ব্যাপকতা ও গভীরতা সমন্বিত একটি দৈব আদর্শের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন।

এই অনুভব, বোধ বা অভিজ্ঞতা একটি সৌন্দর্যলিপ্সু মানসিকতা থেকে জন্ম নেয়। সুতরাং মনে করা যায় যে সেই মানসিকতায় কৌৎসিত্য-বোধও আছে। চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের কৌৎসিত্য-বোধ ব্যক্তও করেছেন। কিন্তু কবিকর্মে তিনি কুৎসিত কুরূপের নিকট প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগ বা অনুরাগ দেখান নি। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞায় অনুরাগ হল 'প্রায়-একাত্মতা'। কিন্তু 'অনুরাগ' মানে অনুসরণলব্ধ রঙও হতে পারে এবং সে-রঙ একাত্মক হওয়ার লিপ্সা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা হতেও পারে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায়, বিশেষভাবে কল্লোলযুগের কবিদের কাব্যানুভবে সৌন্দর্যলিপ্সু মানসিকতার সর্বাঙ্গীণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা এক-পদ অগ্রসর হয়ে গেছেন কুৎসিতকে সৌন্দর্যের পাশাপাশি স্থান করে দিয়ে। তাঁদের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য জীবনের সামগ্রিক রূপবোধে।

কেউ-কেউ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বে অসহিষ্ণু হয়ে এমন পংক্তিও সে-যুগে লিখেছেন:

"সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা
সত্যের শাঁস কালো বলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা।"

('মরুশিখা'— যতীন্দ্রনাথ)

কিন্তু এ-অসহিষ্ণুতা সৌন্দর্যতত্ত্বের অর্ধাংশের প্রতি দৃষ্টিপাতের ফলে লাভ

করে যতীন্দ্রনাথ পরবর্তী যুগের অপরার্ধে ঠিক এমনি আসক্তি দেখিয়েছেন। তাঁর চাইতে কল্লোল-যুগের অপর কবিবৃন্দ অনেক বেশি প্রসারিত বৃত্তে সৌন্দর্যকে ও কৌৎসিত্যকে উপলব্ধি করেছেন। যেমন যুবনাশ্ব তাঁর 'শিলালিপি'-র এ-তিনটি পংক্তিতে নিবেদন করছেন:

"মানুষের বলিষ্ঠ বুকে
পুষ্ট মাংসপেশীতে
স্বপ্নময় নয়নে জেগেছিল কী আলোড়ন! শুধু প্রেম?"

কিম্বা প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'প্রথমা'-র 'নটরাজ'-এর দৃষ্টিতে বলেছেন:

"কোন্ দেশেতে লাগল মড়ক, ভাগাড় আঁধার শকুন-ঝাঁকের মেঘে
আবার কোথায় হাঁস চরে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে
ঝিউড়ি মেয়ে ঘস্‌তেছে পা খেজুর-গুঁড়ির পাটে।"

অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'অমাবস্যা'-র লিরিক লিখতে বলেছিলেন:

"জুঁই-জ্যোৎস্নায় ফুলের ফরাসে বিছানা বিছালো বিছা"

অজিত দত্ত 'দৈবদৈত্যে'-র সমাবেশ-চিত্রের কথা এঁকে দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু 'বন্দীর বন্দনা'-য় 'প্রেমিক'-চিত্তের দৃষ্টিতে সেকালেই গোবিন্দচন্দ্র দাসের অথবা পিকাসোর দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছেন:

"নতুন ননীর মতো তনু তব? জানি, তার ভিত্তিমূলে রহিয়াছে
কুৎসিত কঙ্কাল—

(ওগো কঙ্কাবতী)
মৃত-পীত বর্ণ তার; খড়ির মতন শাদা শুষ্ক অস্থি শ্রেণী—"

সুন্দর ও কুৎসিতের দাবী পৃথিবীর ও জীবনের উপর নিত্য সত্য—কার স্থিতি ও বিস্তৃতি কখন যে কতোটুকু হবে তার নিশ্চয়তা নেই। কবি যখন পৃথিবীর জীবন-বহির্ভূত জীব নন, তখন তাঁর অভিজ্ঞতার উপর এই উভয় দিকেরই দাবী আছে। তবে সে-দাবীর সদসৎ লক্ষণ চেতনার প্ররোচনায় যে-কবি সহজে উপলব্ধি করে তাদের চিত্র-কারুকর্মে উদ্দীপ্ত হতে পারেন, তিনিই সর্বকালীন কবি। কল্লোলযুগ থেকে এ-ধরনের সার্বকালীন কবির

প্রতিশ্রুতি নিয়ে অভিজ্ঞতার বিচিত্র পথ অতিক্রম করে গেছেন জীবনানন্দ দাশ। যেহেতু তাঁর রচনা তাঁর মৃত্যুতে সমাপ্ত হয়ে গেছে, তার জন্যে তাঁর সুদীর্ঘ কাব্য-সাধনার পরিমাপ করে এখন আমরা দেখতে পারি তাঁর 'বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস' থেকে বা তাঁরই দেওয়া কাব্যসংজ্ঞা থেকে কোন রস প্রবাহিত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শ্রীতত্ত্বজাত মাধুর্যরস থেকে জীবনানন্দ কোনোকালেই নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ভাবতে পারেন নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী অথবা বাংলা দেশের যে-শতক থেকে এই রস আহরণ করেছিলেন, সে-পৃথিবী জীবনানন্দের বোধে ছিল 'নষ্ট'। আরেকটি রসসমৃদ্ধ পৃথিবী যে নষ্ট পৃথিবীর স্থান অধিকার করেছিল এ-শতকে, তা-ও নয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা আর জীবনানন্দের অভিজ্ঞতা বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মচেতনায় 'মধুর, গভীর, উজ্জ্বল' অথচ আত্মসচেতন বিংশ-শতকের বাঙালী কবি জীবনানন্দ, গভীর হয়েছেন ঠিকই—হয়ত গভীরতরই হয়েছেন, কিন্তু গভীরতর হবার দরুণই রবীন্দ্রনাথের মতো মাধুর্য রসে উজ্জ্বল জাতক হয়ে উঠতে পারেন নি। অনুজ্জ্বলতা ও কঠোরতা বিশ শতকের জীবনের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনালব্ধ ফল ; জীবনানন্দের কাব্য এই দু'টি সম্প্রতি লব্ধ গুণে গুণান্বিত।

অবশ্য এ-সব বিচার রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতীতির আদর্শ সামনে রেখে করা হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেক কবিই তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করে কবিতায় সে সত্য প্রকাশ করে যান। প্রত্যেকেরই কাব্য সম্পর্কে এবং আপন সত্তা সম্পর্কে একটা প্রতীতি ও চিত্র আছে—দু'জন কবি কাব্যে বা সত্তায় এক হতে পারেন না। সমালোচনার ভিত্তি এই জ্ঞানে স্থাপন করলে বাঙালী কবির অভিজ্ঞতা-সমূহ ক্রমশই প্রকাশ্য হতে সুরু করবে।

কবিতার চরিত্র-প্রকাশ করাই সমালোচকের কর্তব্য কর্ম। চরিত্র বলতে প্রথমত বোঝাবে, প্রচলিত সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, ভাবগত সাধারণ বুদ্ধিগ্রাহ্য রস। দ্বিতীয়ত, শ্রুতির ও পাঠের স্থান—ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ এখানেই আসে এবং তৃতীয় প্রসঙ্গ ধ্বনিতত্ত্বে সমালোচককে প্রবেশ করতে হয়। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক সাধারণত আপন সংস্কারগত ধ্বনি-চিত্রের শব্দান্বেষণ করে ভ্রমে পতিত হন। কবিতার শব্দ-বহির্ভূত কোনো চিত্রে বা সুরে চলে যাওয়া হয়ত আত্মরতি। তেমনি কবিতায় বাঞ্ছিত কোনো শব্দের সূক্ষ্ম চিত্র বা সুর উপেক্ষা করাও অনুচিত কর্ম।

আমরা এ-স্থলে উক্ত বিষয়গুলো পরীক্ষার জন্যে জীবনানন্দ দাশের একটি উপেক্ষিতা কবিতা গ্রহণ করছি :

## ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছ বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব !—( মহাপৃথিবী )

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতায় যদি সমালোচকের মন নিবিষ্ট থাকে, তাহলে তিনি এ-কবিতাটিকে উৎকৃষ্ট চিত্তের 'প্রেমরস নিবেদন'মূলক রচনা বলতে বাধ্য হবেন। অন্তত তার চাইতে সাধারণ-বোধ্য অন্য কোনো রস প্রথম-পাঠে কবিতাটি থেকে তাঁর পক্ষে আহরণ করা মুস্কিল। বলা বাহুল্য যে প্রেম-নিবেদন জীবনশক্তিকে। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদীয় মানসিকতা থেকে এখানেই জীবনানন্দ স্পষ্টত বিদায় গ্রহণ করলেন।

সমালোচক যদি বাঙালীর ঐতিহ্য উপেক্ষা করে বিলিতি ঢঙে কবিতাটির রস উপলব্ধি করতে চান, তাহলে 'মনোভঙ্গী' করুণ রস নিবেদন করছে—অর্থাৎ এখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যৌবনবেদনা রস'-এর আভাস আছে বলে উপলব্ধি হবে। অবশ্য তা-ও নিঃসঙ্গ বিরহী প্রেমিক চিত্তেরই রস।

ছন্দ প্রসঙ্গে বলব যে বাংলা প্রবহমান পয়ারের পদের একটি পংক্তি এ-রচনায় মাত্রিক ধ্বনিতে প্রসারিত করে নিতে হবে। 'ঝর্ণা' শব্দটিকে দু'-মাত্রায় বাধা যাবে না। কেন রাখলেন না কবি এ-কথাটিকে পয়ারে প্রচলিত ধ্বনিমাত্রার গণ্ডীর বন্ধনে ? যেহেতু, তিনি এ-শব্দটির উপর ঝোঁক দিতে চান অথচ পয়ারে বা প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রচলিত 'ঝরণা' লিপিটি পছন্দ করে ধ্বনিমাত্রার বিস্তার দেখাতেও অনিচ্ছুক। প্রাচীনতাকে বর্জনের ইচ্ছা ছন্দে ও লিপিতে পর্যন্ত ধাবিত। কিন্তু ভাষা ব্যবহারে তিনি এখানেও বঙ্গীয় পদ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। ক্রিয়াপদ কোথাও কথ্যভাষা অনুযায়ী,

কোথাও বা সাধুভাষা অনুগামী হয়েছে। অবশ্য অচিরেই তিনি স্বকীয় কাব্য-ভাষা-রীতি তৈরী করে আগামী দিনের কাব্যাচারীদের ব্যবহারের জন্য রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এখানে তিনি অস্থির।

ধ্বনিতত্বে প্রবিষ্ট চিত্ত এই অষ্টকটি বা আট পংক্তি থেকে যে-যে ধ্বনিচিত্র লাভ করবে, কাব্যের বিশিষ্টতা বর্ণন তার উপর অনেকটা নির্ভর করে। ধ্বনিবাদী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবেন: কবিপ্রাণ কাকে আহ্বান করছেন? 'পাখির ঝর্ণা' হতে কাকে অনুরোধ জানাচ্ছেন? কোনো সৃষ্টিশীলা নারীর না বহু-নারীর মূর্তি পাখীর ঝাঁক হয়ে এই কবি-পুরুষকে আদি সৃষ্টিস্বপ্ন দেখাচ্ছে? আলঙ্কারিকরা এখানকার 'নীল ডিম' থেকে সুরু করে 'পাখীর ঝর্ণা' পর্যন্ত বিস্তৃত ধ্বনিচিত্রে নায়িকাকে 'সমাসোক্তি' ও 'সঙ্করালঙ্কার'-এ মুড়িয়ে চিনতে চাইবেন। একটা নীল ডিম ফেটে যেমন পাখী হয়, একটি শিশিরবিন্দু যেমন ঝর্ণার ছবি মনে এনে দিতে পারে—জড়, শীতার্ত বস্তু যেমন উষ্ণতায় প্রাণময় হয়, এ-ধ্বনিচিত্রের নায়িকা তেমনই হতে পারেন নায়ক-কবি-পুরুষের উষ্ণতার সান্নিধ্যে এসে। কিন্তু এই অবলোকনে ভারতীয় ধ্বনিতত্ব স্থির বসে নেই। 'ব্যঙ্গ'-ধ্বনি এ-পংক্তিগুলোতে কী আছে—কাব্য-চেতন ব্যক্তি তা ভাবতে থাকবেন। শব্দার্থ যা-ই বলুক তা ছাড়া একটি ভাব-ব্যঞ্জনা ধ্বনিময়ী পংক্তিগুলোতে আবিষ্কার করতে চাইবেন, যা স্থান-কাল-বিশেষিত কোনো জ্ঞানে বিধৃত নয়। আবহমান কাল ধাবিত নর-নারীর বিরহী সত্তার মিলনেচ্ছা যে পরিবেশে অবাধ ছিল, ধ্বনিসূরী কবিচিত্তকে সে-পরিবেশে বিচরণশীল দেখবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবতা যদি সে-যুগ আহ্বান করেছিল বলে ধ্বনিবাদীর প্রতীতি থাকে, যদি তিনি তখনকার সৎ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থেকে বলেন যে কবিচিত্তের এই পুনরাহ্বানে সে-যুগের কারো কণ্ঠ ও চেতনার স্বর তিনি শুনতে পাচ্ছেন, তাহলে তাঁর মানসিক চিত্র সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে কলহ করা যায় না। কবিতা কিন্তু এমন মানসিক চিত্র দিতে পারে বলেই 'মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত' করে থাকে। অবশ্য বিলিতি কাব্যের সমালোচকরা হাত বাড়িয়ে এসব চিত্র ধরতে পারলেও বলে থাকেন, আত্মরতি বা দুর্গমতায় তাঁরা হাত বাড়ালেন। কবিমনের সিঁড়ি তাঁদের স্বর্গের সিঁড়ি না হলে যেন সহজ নয়!

'ফিরে এসো' কবিতার অন্তর্গত নিঃসঙ্গতার আর্তরব ও নির্জনতাপিপাসা কাব্যানুরাগীকে যতোটা সৎ বোধে উদ্বোধিত করবে তেমন আর কাউকে করবে

না—প্রেমিক চিত্তকেও না। প্রেমিক চিত্ত যদি অচৈতন্য অবস্থায় থাকে তাহলে এ-পংক্তিগুলো তাতে কামাতুর বেদনা ভিন্ন কোনো রস ফলিত বা ফেনায়িত করে তুলবে না। বাঙালীর বিদগ্ধতা অচৈতন্যে নয়, চৈতন্যে ও চেতনাদানে।

## সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

### বিষ্ণু দে

আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে দেশ ও কাল, টাইম ও স্পেস্ কি করে মানুষের মনে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, তার বিবরণ আজকাল পণ্ডিত ব্যক্তিরা দিচ্ছেন। বহির্জগতের সম্বন্ধসঙ্ঘাতে এই সব প্রত্যয় জাগে আমাদের মনে। সভ্যতার আর একটি বড় প্রত্যয় হচ্ছে ব্যক্তিত্ববোধ। কি করে সমাজ ও ব্যক্তিতে দ্বন্দ্বাশয়ী সম্বন্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে এই ব্যক্তির স্বরূপ মর্যাদা পেতে লাগল, তার ব্যাখ্যা সভ্যতারই ইতিহাস। বহির্জগতের বিরুদ্ধশক্তি, অন্ধপ্রকৃতি, জন্তু-জানোয়ার, হিংস্র গোষ্ঠীর দলাদলি যতদিন না মানুষের শুভবুদ্ধির কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা পেয়েছে, ততদিন ব্যক্তির এই মহিমা কবিদের মনেও আসেনি। বাল্মীকি বা হোমর গোষ্ঠীর রচনাই করেছেন, রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন ব্যক্তির স্বকীয়তার কথা :

> বহুদিন মনে ছিল আশা
> ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
> ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
> করেছিনু আশা !
> গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
> ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
> চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে
> ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
> তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
> ভরিয়া তুলিব ধীরে
> জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা,
> ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
> করেছিনু আশা।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ে যে বোধ থেকে এই আশার জন্ম, সে বোধ মানব-সভ্যতার বিশেষ একটা পরিণতিতেই সম্ভব। কিন্তু এখনও সম্ভব নয় এই আশাকে সকলের পক্ষে সফল করা। ব্যক্তির এ স্বাধীনতা কোথায়, যেখানে অর্থের প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিত্বই পণ্যদ্রব্য মাত্র? বাণিজ্যচণ্ডীর তাড়নায় তাই রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছে :

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী,
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা!

সকল সচেতন মানুষের মধ্যেই তো অন্তরের ধ্যানখানি আপনার ভাষা খোঁজে। কিন্তু জীবনযাত্রার অমানুষিক রথচক্রঘর্ঘরে সে ভাষা ডুবে যায়, মন ভবিষ্যতে খুঁজে বেড়ায় তার সম্পূর্ণ বাণী। ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে আমার মনে পড়ে ইংরেজী কবি এলিঅটের ধরতাই বুলি : অতীত ও ভবিষ্যৎ দুয়ের অঙ্গুলী-নির্দেশ একদিকে—এই বর্তমানে। বর্তমানের উৎসারিত স্বপ্নের সৃষ্টিই তো আমাদের ভবিষ্যতের ছবি—নানা স্বপ্নের ঐকতান, দুঃস্বপ্নেরও। বর্তমান যদি কিছুমাত্র সুস্থ হত, তাহলে হয়তো আমাদের স্বপ্নপ্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত। কিন্তু নানা লোভে ক্রুরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত। স্বেচ্ছাকৃত অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তারই ঐক্যতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্ছকিত রাস্তায় গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতায়, বীজ কম্প্র নীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিষাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়, উদয়াচলে মেশে অস্তাচলের রক্তস্রোত, ভগ্নদূতের মুখে জাগে মিছিলের প্রবল আশা, প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা।

ব্যাপারটা নিছক কবিত্ব নয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এর পক্ষে। বিজ্ঞান এর সমর্থক। আর বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শেষ নয় বা স্বতন্ত্র পেশা বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানে আবদ্ধ নয়, আজ জীবনে তার ব্যাপ্তি প্রায় জীবনের মতই গভীর ও

জটিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই প্রচণ্ড ব্যাপ্তির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষে একতার বহুধা বন্ধন, বাহির ও ঘরের, দেহ ও মনের, ব্যক্তি ও সমাজের, বস্তু ও রূপের হরিহর আলিঙ্গন! আর বিজ্ঞান বলতে এই ছবিই তো আমাদের মনে জাগে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে এই বিজ্ঞানই, আধুনিক বিজ্ঞানই জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজ যেখানে মানুষ লোভে পড়ে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে না—পাছে মুনাফার হার কমে যায়, সেখানে বিজ্ঞানকে দূরে পরিহার করার ইচ্ছাটা আমার মতো লেখক শ্রেণীর অসহায় জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতির স্তরকে ছাড়িয়ে যখন আমরা মানুষের স্তরে পৌছতে চাইছি, তখন এ আশা অমূলক নয় যে জীববিদ্যার নির্মাণকার্য আরম্ভ হবে মানুষকে নিয়ে। জীবিকা বা জীবনযাত্রার শূলে চড়ানো আজকের মানুষের নয়, স্বাধীন জীবনের পটভূমিতে নিছক মানুষ। অর্থাৎ দুজন মানুষের মধ্যে প্রভেদটা কেন হবে অর্থনীতিগত কারণে, তাদের জীবনযাত্রার আবশ্যিক প্রভেদের জন্যে! কেন হবে না দুজন মানুষের শারীরিক মানসিক ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের জন্য, নিছক মানসিক কারণে? অবশ্য সাহিত্যের আসল কারবার চিরকালই চলেছে মানুষকে নিয়ে, ব্যক্তি-স্বরূপ বা পার্সন্যালিটিকে নিয়েই।—কিন্তু সে মানুষ প্রায়ই হয়েছে তার জীবনযাত্রার দাসানুদাস, ব্যক্তিস্বরূপ বিড়ম্বিত হয়েছে বহিঃসমাজের চাপে, আকস্মিকতায়। ধরা যাক প্রেমঘটিত ঈর্ষার কথা। ওথেলো নাটকের পরস্পরে বিশ্বাস বা আস্থা ঘটিত মুখ্য ভাব-বস্তু সম্ভবত চিরকাল নরনারীর সম্বন্ধে যন্ত্রণার উৎক্ষেপ আনবে, কিন্তু ঈর্ষার যে বিশেষ চেহারা ঐ নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে ও তাদের কর্মধারার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়তো পরিবর্তনশীল। ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে ওথেলোর মুরিশ্ মত্ততা, ইয়াগোর কুটিল স্বার্থপরতা, ডেসডিমনার অসহায় অবলা-ধরন ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নিতে পারে ব্যক্তিত্বের ভিন্ন প্রতিষ্ঠায়। মধ্যযুগের দিকে তাকালেই আমরা এই ভিন্ন রূপের একটা আভাস পাই, দান্তের মুখে পাওলো ও ফ্রানচেসকার অবৈধ প্রেমের যে ভাষ্য, সে পুরুষার্থ মধ্যযুগের ধর্মের ছকে ফেলা সামাজিক জীবনেই শোভন। কিংবা, ত্রুবাদুর কি কবি প্যের ভিদালকেই ধরি, বৈষ্ণব কবির মতো ত্রুবাদুর রীতিতে পরকীয়কে উপলক্ষ্য করে প্রেমের কাব্য সাধনা চলিত ছিল, কাউন্টেস লোবা তাই হেসেই প্যের ভিদালের কবিতা শুনতেন, ভিদালের আজগুবি খেয়ালে কাউন্টও কখনো

বিচলিত হননি। এমনকি ভিদাল যখন আবেগে আত্মবিস্মৃত হন এবং লোবা নিজেই কবির বিরুদ্ধে নালিশ জানান, তখনও কাউন্ট ব্যাপারটা হেসেই ওড়াতে চান, কারণ ত্রুবাদুর রীতিই যে পোর ভিদালের এই আতিশয্যকে সম্ভব করেছিল। সেইরকম বলা যায় যে বিধবা বিবাহ যদি সত্যিই সমাজে স্বাভাবিক হয়ে উঠে, তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি''র রূপ ভিন্ন হয়ে যাবে না? ছেলে মেয়ের কাছে ভালোবাসার দাবি বৃদ্ধ মা বাপের মনে বরাবর থাকবে; কিন্তু কিং লিয়ারের ট্রাজেডির মধ্যে কতখানি অংশ জুড়েছে রাজত্বের ভাগ বাটোয়ারা? এমন কি এডমণ্ডের মধ্যেও তো জারজ সন্তানের গ্লানি এবং পৈতৃক সম্পত্তির লোভটাই সবচেয়ে উগ্র আবেগ। সাহিত্যের অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝোঁকটা দীর্ঘকালের, তাই এইসব বহির্জাত কারণকে, আকস্মিক সামাজিক হেতুকে সাহিত্যিকরা বরাবরই দাবিয়ে রেখেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন মানুষকে, ব্যক্তিকে। তাই আমাদের মনে থাকে না যে গোবিন্দলাল বা রোহিণীকে স্বাধীন মানুষ বলার চেয়ে লোভের পুতুল বলাই সঙ্গত। এই অসঙ্গতি এড়াবার জন্যেই সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকত, না হয় থাকত প্লটের মাহাত্ম্য। প্লটের সম্মোহনে আপাত স্বাধীন মানুষও জীবন মৃত্যুর কাছে নিজেকে দিত বিকিয়ে। কিন্তু সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক বিকাশে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল সাহিত্যের আত্মমর্যাদা। ফলে আধুনিক সাহিত্যে প্লট গৌণ, চরিত্র বা ব্যক্তি ও তার সঙ্গে জড়িত আবহাওয়াই মুখ্য। কিন্তু সমাজ এখনও সেই পুরানো আর্থিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই চলেছে, ফলে এই আধুনিক সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিরা এতই স্বাধীন যে তাদের বাহির রূপ প্রায় নেই বললেই চলে, আছে শুধু তাদের মনের অন্তরঙ্গ স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মনোবিজ্ঞানের অচেতন বা অবচেতনে এবং নিরাকার জগতে রামশ্যামকে আলাদা করে চেনা শক্ত। ফলে ব্যক্তিত্বের নির্বিশেষ সন্ধানের শেষ দেখি ব্যক্তিত্বলোপে। কারণ সাহিত্যের উপজীব্য শূন্যে ঝোলানো নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব নয়। সে ব্যাপারটা বাস্তবে টেকেও না, নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব একটা এবস্ট্র্যাকশন বা পরোক্ষ নিদান, এবং সাহিত্যের কাজ প্রত্যক্ষ নিয়ে, বাস্তব নিয়ে। সাহিত্যে চৈতন্যের স্রোত বা স্ট্রীম অব কনশাসনেস-এর চর্চায় আমরা শিখেছি অনেক কিছুই, কিন্তু সে পরীক্ষায় আর বিকাশের পথ রুদ্ধ। বিকাশের পথ ব্যক্তিত্বের নব-নব উন্মেষে

নতুন-নতুন বিস্তারে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে যাতে আকস্মিকতা-দুষ্ট না হয়, যাতে মধ্যযুগের বৃত্তিতে সীমাবদ্ধ না হয়, যাতে একালের প্রতিযোগিতামূলক জীবনযাত্রায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন না হয়, তার জন্যে চাই বিজ্ঞান-শুদ্ধ মনুষ্যধর্ম। যে ধর্মে অর্থকরী বৃত্তির সুযোগ সকলের পক্ষে সমান, অবসর প্রচুর, সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তৃত, ধনী-দরিদ্রের, উন্নত-অনুন্নত জাতির ভেদ অবান্তর; মৌরসীপাট্টার জীবনযাত্রা নয়, জীবনই সেখানে মূল্যবান। টাকা সেখানে পুরুষার্থ নয়, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিস্বরূপ সেখানে চরম মর্যাদা পায়, বিজ্ঞান সেখানে জীবনের সঙ্গে একাকার। সমাজের সেই ভাবী গৌরবের দিনে শিল্প সাহিত্যেরও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত।

হেনরি জেমসের উপন্যাসের ভূমিকাগুলিতে আমরা এই স্বাধীনতার অভাব ও জেমসের স্বকীয় সমাধানের চমৎকার ব্যাখ্যা পাই। লেখকের স্বকীয় স্বর-বিস্তার কাম্য যে তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের পটভূমিগত জটিলতায় ও ভেদাভেদে সে বিস্তার হয় বারংবার বিড়ম্বিত। রূপকথায় যে স্বাধীনতা দেখি সে-কল্পনার বা রূপায়ণের মুক্তি হয় ব্যাহত। জেমসের অননুকরণীয় ভাষায়:

Yet the fairy tale belongs mainly to either of two classes,. The short and sharp and single, charged more or less with the compactness of anecdote (as to which let the familiars of our childhood, Cinderella and Blue Beard and Hop, O My Thumb and Little Red Riding Hood and many of the gems of the Brothers Grimm directly testify) or else the long and loose, the copious, the various, the endless, where dramatically speaking roundness is quite sacrificed—sacrificed to fulness, sacrificed to exuberance, if one will; witness at hazard any one of the Arabian Nights. The charm of all these things for the distracted modern mind is in the clear field of experience, as I call it, over which we are thus led to roam.

Nothing is so easy as improvisation, the running on and on of invention; it is sadly Compromised, however, from the moment its stream breaks and bounds and gets into flood······

To improvise with extreme freedom and yet at the same time without the possibility of ravage, without the hint of a flood, to keep the stream, in a word, on a something like ideal terms with itself ...

অর্থাৎ রূপকথাকে মোটামুটি দুইটি ভাগ করা যায়; একটি হচ্ছে স্বল্পকায়, প্রখর অখণ্ড, খোস গল্পের বা কেচ্ছার মতো আঁটসাঁট ( প্রমাণ, শৈশবের চেনাশোনা সব রূপকথা : সিণ্ডেরেলা ব্লু বিয়ার্ড ইত্যাদি)। আরেকটি হচ্ছে দীর্ঘ, শিথিল, অপর্যাপ্ত, বিচিত্র অন্তহীন, যেখানে নিটোলতা বিসর্জন দেওয়া হয় উচ্ছলতায়; প্রমাণ আরব্যরজনীর যে কোন একটি। বিপর্যস্ত আধুনিক মনের কাছে এদের বাহার হচ্ছে অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন ক্ষেত্রে যেখানে আমরা বিচরণ করতে পারি; আলাপ বিস্তারের মতো সহজ আর কিছু নয়, নব-নব যোজনার একের পর এক পরম্পরা; কিন্তু সেও বিড়ম্বিত হয়ে ওঠে যে মুহূর্তে ধারাটি পাড় ভেঙে বন্যা হয়ে ওঠে···সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিস্তার করে যাওয়া, অথচ কূল ভাঙবে না, বান ডাকবে না, এক কথায় ধারাটিকে বস্তুবিশ্বে আস্ত সম্পূর্ণ রাখা।

এই সুরবিস্তারে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আজকের শ্রেণীগত জীবনযাত্রার নানারূপ, মানবেতর ভেদাভেদ, অহেতুক সম্ভব-অসম্ভবের মানদণ্ড। আমাদের ভবিষ্যতের ছবি তাই অর্থনীতির পরের স্তরের মানব জীবনে খুঁজি, যেখানে জীববিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানে অর্থোত্তর নিছক মানব সমাজের পুরুষার্থ নির্মাণে কর্মঠ। সেখানেই রিল্‌কের নিঃসঙ্গতা ও জীবনের ঘনিষ্ঠতা একাধারে সম্ভব। সেখানেই প্রুস্তের স্মৃতির ইমারৎ, জয়েসের ভাষার বিহার ব্যক্তিগত চেষ্টার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান প্রত্যক্ষ জীবনের যুক্তিতে মনের গভীরতর সার্থকতা পায়। কাফ্‌কার মানসিক দ্বন্দ্ব সেখানে রূপকে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন মানে না। তখনই লরেন্সের আশ্চর্য কবিত্বের অখণ্ড সত্তার স্বপ্ন বাস্তবে সম্পূর্ণতা পাবে। তাইতে সোভিয়েট দেশের মানুষ অন্তর্ভঙ্গির জীবন এক হয়ে যায় বীরত্বের মহাকাহিনীতে।

এ কথাটা শুধু কাব্য উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সীমা বিস্তৃত হবে বলেই বলছি না। লেখক পাঠকে যোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় লেখকের শিল্পচর্চারই স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাবে। কনটেণ্টের সীমানা সেখানে জানা বলেই শিল্পী তদ্‌গত হতে পারবে ফর্মের ধ্যান ধারণায়। তাছাড়া মানতে লজ্জা নেই, বই বিক্রির

বা লেখকদের সমাদর যে ভবিষ্যতে কতখানি হতে পারে, সোভিয়েত ইয়ুনিয়নে আমরা এরই মধ্যে তার কিছু দেখতে পাই এবং সে বিষয়ে আমরা যে কিঞ্চিৎ আগ্রহান্বিত সেটা স্বীকার্য। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা মানুষের সম্বন্ধে, ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পাবো আরো ব্যাপক জ্ঞান, আরো গভীর অনুভব শক্তি। তাই আজ কবিরাও আপন গরজে সে দীপ্ত ভবিষ্যতের নির্মাণে মন দেয়।

**They play of one's mind gave one away, at the last dreadfully in action, in the need for action, where simplicity was all······**

অর্থাৎ আমাদের মনের যুক্তিই, শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যায় দারুণ সক্রিয়তার বা কর্মের জগতে, কর্মের প্রয়োজনে, যেখানে সরলতাই সব······ ।

# সাহিত্যের স্বরূপ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বিশ্বসৃষ্টি আমাদের নিকটে যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে সেইরূপে প্রতিভাসনের কারণ কি ইহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটা মায়াশক্তি, আর সেই মায়াশক্তির স্বরূপ হইল অনির্বাচ্য ; সে সৎও নয়, আবার সে অসৎও নয়, এই সত্যমিথ্যা— অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের মাঝখানে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনির্বচনীয় রহস্য, সেই অনির্বচনীয় রহস্যই দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বসৃষ্টির মূলে। কেহ কেহ বলিয়াছেন বিশ্ব সৃষ্টির যে রূপটি আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে যাহাকে আমরা আমাদের সকল ভালো লাগার মন্দ লাগার সকল সুখদুঃখের অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা বাহিরের কোন বস্তুর রূপ নহে, আমাদের মন ব্যতীত বিশ্ব সৃষ্টির কোন প্রতিভাসন নাই। তবে কি সে সম্পূর্ণই আমাদের মনের সৃষ্টি ? তাহাও নহে,—কারণ তাহা হইলে অন্ধ মানুষের মনের ভিতরেও রূপে রঙে ফুটিয়া উঠিতে পারিত বিশ্বসৃষ্টির বিচিত্র ছবিটি। এই রূপটি তাহা হইলে জাগিয়াছে কোথায় ? সে আমাদের অন্তরেও নাই, সে আমাদের বাহিরেও নাই, অথচ অন্তর বাহিরের যোগে ভাসিয়া উঠে সৃষ্টির বহু বিচিত্র রূপটি ঐ মায়ার অনির্বচনীয় লীলা রূপে।

আমাদের সকল সাহিত্য সৃষ্টির মূলেও পরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এইরূপ একটা মায়াশক্তি, অনির্বচনীয় তাহার স্বরূপ। আমাদের যে সাহিত্যের জগৎ তাহাকে সত্যও বলিতে পারিতেছি না ; মিথ্যাও বলিতে পারিতেছি না,—সত্য মিথ্যার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে আমাদিগকে দিতেছে বিচিত্র রসানুভূতি। সাহিত্যের ভাষায় কবির 'প্রতিভা'। সাহিত্যের রসমূর্তিতে আমাদের অন্তরের কাছে যে প্রতিভাসন তাহা কোনো বহির্বস্তুর বা বহির্বিষয়েরই সম্পদ নহে ;—কারণ, যদি তাহা হইত তবে মনোনিরপেক্ষভাবে সে মনুষ্য সাধারণের নিকটে সমানভাবে প্রতিভাত হইতে পারিত। সে শুধু

মনের বা হৃদয়ের সম্পদও নহে,—কারণ, বহির্বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন না করিয়া একান্তভাবে বস্তু বা বিষয় নিরপেক্ষরূপে সে কখনও আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করে না। একদিকে রহিয়াছে বহির্জগৎ, অন্যদিকে রহিয়াছে পাঠকের মন, আর মাঝখানে রহিয়াছে অনির্বচনীয়স্বরূপ প্রতিভার মায়াশক্তি,—সেই কৌতুকময়ীর বিচিত্র লীলাতেই অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ উভয়ের যোগে—অথচ উভয়-বিলক্ষণরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে একটা রহস্যময় সাহিত্যজগৎ।

প্রতিভার সহিত মায়াশক্তির তুলনা আরও অনেক দূর টানা যাইতে পারে। মায়াশক্তির দ্বারা সৃষ্ট জগৎ যেমন পারমার্থিক ভাবে সৎ না হইলেও তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বের জন্য ব্যবহারিকভাবে সৎ,—প্রতিভার সৃষ্টি সাহিত্য এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সেই কথা। রজ্জুকে যেমন আমরা মায়ার প্রভাবে সর্প বলিয়া মনে ভুল করি বেদান্তমতে তৎকালের জন্য অনির্বচনীয় রূপে রজ্জুর সর্পত্বই সত্য হইয়া উঠে; কারণ, তাহার অর্থ ক্রিয়াকারিত্ব রহিয়াছে, অর্থাৎ সেই রজ্জুসর্পকে দেখিয়াই আমরা ভীত হই এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত দূরে পলায়ন করি। সাহিত্য সৃষ্টি বা অন্যান্য কলাসৃষ্টির ভিতরে আমরা যে সকল বস্তু বা ঘটনার সহিত পরিচিত হই তাহারা আসলে সত্য নহে তাহা আমরা জানি, তথাপি তাহা মায়াশক্তির স্পর্শে একটা অনির্বচনীয় সত্য লাভ করে, কারণ সে আমাদের হাসায় কাঁদায়—বাস্তবের সহিত আমাদের হৃদয়ের যে যোগ, তাহা অপেক্ষা নিবিড়তর যোগ এই প্রতিভার সৃষ্টির সহিত। এই অর্থক্রিয়াকারিত্বই সাহিত্যের অনির্বচনীয় সত্যতার প্রমাণ।

এই সাহিত্যের জগৎ বিধাতার সৃষ্ট জগত হইতে স্বতন্ত্র,—ইহা একান্তভাবে মানুষের সৃষ্ট জগৎ,—এখানে 'কবিরেব প্রজাপতিঃ'। একদিকে রহিয়াছে বিধাতার বিশ্বসৃষ্টি, আরেক দিকে রহিয়াছে সহৃদয়ের পাঠকের মন,—প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় কবি বা সাহিত্যিক মাঝখানে গড়িয়াছেন এই সাহিত্য-জগৎ। কিন্তু কেন? বিধাতা পুরুষের সহিত এই পাল্লা কেন? তাহার কারণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছে। উপনিষদ বলিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যেন মানুষের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন,—তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়া ঈর্ষাবশতঃই যেন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে বাহিরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন, যেন মানুষ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গভীর রহস্যকে পরম সত্যকে জানিতে না পারে। কিন্তু মানুষই বা একেবারে হার মানিবে কেন? মানুষের ভিতরে যাহারা চতুর তাহাদের চোখে ধরা পড়িল বিধাতার এই ঈর্ষা-

প্রকৃত কারসাজি, তাঁহারা মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দৃষ্টিকে, শ্রবণকে শুধু বাহিরের স্রোতেই ভাসিয়া যাইতে দিলেন না, তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে চাহিলেন অন্তরের দিকে। তখন লাভ হইল নূতন দৃষ্টি, নূতন শ্রবণ, নূতন গন্ধ, স্পর্শ, আস্বাদন। মানুষ বুঝিল, বিশ্ব সৃষ্টিকে সে যেমন করিয়া দেখিয়াছিল, স্বাদে গন্ধে শব্দে স্পর্শে তাহাকে যেমন করিয়া পাইয়াছিল, সেই দেখা ও পাওয়াই ত যথার্থ দেখা এবং পাওয়া নয়,—বিশ্বসৃষ্টি যে আরও অনেকখানি। তখন মানুষ নূতন করিয়া বিশ্বের পানে তাকাইল,—সে তাকানো শুধু বাহিরের দিকে তাকানো নহে, সেই বাহিরে তাকাইবার পিছনে রহিল একটা ফিরিয়া তাকানো ; সেই ফিরিয়া তাকানোর ভিতরে মানুষ দেখিতে পাইল, দৈনন্দিন জীবনের একান্ত তুচ্ছ সাধারণ জিনিসগুলিও কত বড় হইয়া মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিতরে রহিয়াছে অসীম রহস্য, অনন্ত বিস্ময়। নিখিল বিশ্ব তখন গন্ধে গানে সৌন্দর্যে মাধুর্যে একান্ত অপরূপ হইয়া উঠিল।

বিধাতাপুরুষের ছল চাতুরী এড়াইয়া মানুষ তখন শুধু মাতিয়া উঠিল বিশ্বের স্বরূপ সন্ধানে। মানুষ অন্তরে অন্তরে জগৎ সম্বন্ধে লাভ করিল গভীর সত্য ; কিন্তু হায়, পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে সেই ঈর্ষাপরায়ণ বিধাতার অভিশাপ। সমগ্র অন্তর দিয়া মানুষ যাহা লাভ করিল অনির্বচনীয় তাহার স্বরূপ,—যে ভাষা বিধাতা পুরুষ মানুষকে দিয়াছেন সে ভাষা দ্বারা কিন্তু অন্তরকে ত আর বাহিরে প্রকাশ করা গেল না,—যাহা নিছক আমার, তাহাকে যে সকলের করিয়া তোলা গেল না। বিশ্ব-মানবের অন্তর হইতে 'আমি' যে তাহা হইলে রহিল চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া।

কিন্তু এই বিচ্ছেদ মানুষ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। কারণ বিশ্বমানবের যোগে যে সে নিরন্তর ভিতরে নিজেকে আবিষ্কার করিতেছে গভীর গভীরতর রূপে। সেখানে যদি আসে বিচ্ছেদ তবে 'আমি' যে পড়ে আপনার গৃহকোণে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া। মানুষের পশ্চাতে ঘোরাফেরা করিতেছে একটা বিদ্রোহী শানিম শয়তান,—মানুষও করিল বিদ্রোহ। বিশ্বের অনির্বচনীয় স্বরূপকে সে ভাষা দিবে, ইহাই তাহার পণ। মানুষ তখন সৃষ্টি করিল অসংখ্য কলা-কৌশল,—সৃষ্টি করিল নূতন ভাষা নূতন প্রকাশ-ভঙ্গি,—তাহা দ্বারা সে আরম্ভ করিয়াছে কোন সুদূর অতীত হইতে যুগে যুগে দেশে দেশে জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত অনির্বচনীয় স্বরূপকে প্রকাশ করিবার সাধনা, এই সাধনা দ্বারাই মানুষ জগৎকে এবং জীবনকে আবার

নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। বিশ্বের সেই নূতন সৃষ্টিই সাহিত্যসৃষ্টি এবং অন্যান্য কলাসৃষ্টি। যুগে যুগে দেশে দেশে চলিয়াছে এই এক সাধনা,—জীবনকে ও জগৎকে শুধু সুন্দর এবং মধুরকরিয়া দেখিব না, তাহার সমস্ত কুশ্রীতা, কারুণ্য এবং রুদ্রত্ব লইয়াই তাহাকে আরও অনেক গভীর করিয়া অনুভব করিব।

গ্রীক মনীষী প্লেটো এই সাহিত্য-জগৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে সাহিত্য বিশ্বসৃষ্টির একটা 'অনুকরণ' মাত্র। আমাদের এই জগৎটাই জগতের আসল রূপের সন্ধান দিতে পারিতেছে না, সুতরাং এই সাহিত্যরূপ 'নকল' জগৎটি যে আমাদিগকে সত্যলাভ সম্বন্ধে একেবারে পথে বসাইবে ইহাতে আর সংশয় করিয়া লাভ নাই। সাহিত্যকে জগতের নকল মানিয়া লইলে প্লেটোর পরবর্তী যুক্তিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য সাহিত্যের তরফ হইতে একদল হয়ত প্লেটোর কথার জবাবে কাটাছাটা ভাবে বলিয়া দিবেন সাহিত্যের ভিতর দিয়া সত্যকে না পাইলাম ত নাই পাইলাম; সে নকল হোক মিথ্যা হোক তাহাকে আমরা চাই—কারণ সেই নকল এবং মিথ্যাই আমাদের ভালো লাগে,—আর জীবনের পথে ভালো লাগাটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো কথা।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সুবিশুদ্ধ চার্বাকপন্থী আমরা নই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের মতে সাহিত্যের স্বরূপটিই চার্বাকের মতের বিরোধী। প্লেটো কাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে এই 'অনুকরণ' কথাটি যে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক কলহ রহিয়াছে: সাহিত্য বিশ্বপ্রকৃতির 'নকল' সাধারণ অর্থে একথা কিছুতেই মানিব না, আর না মানার কারণ রহিয়াছে সাহিত্যের যে সৃষ্টিরহস্য পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি তাহারই ভিতরে। সাহিত্য বহিঃপ্রকৃতির নকল নয়, এই জন্য বহিঃপ্রকৃতির যে অংশ আমাদের নিকট অতি সুস্পষ্টরূপে জানা সে অংশ লইয়াই আমাদের সাহিত্য জগৎ গড়িয়া উঠে না,—জানার ভিতর ধ্বনিত হইয়া ওঠে যে অজানা, সাহিত্য গড়িয়া ওঠে তাহাকে লইয়া। জানা জগৎটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই উপলক্ষ্য,—লক্ষ্য সেই অজানা। কিন্তু যে অজানা তাহাকে লইয়া সাহিত্য গড়িয়া উঠে কিরূপে? এ কথার জবাব এই যে, যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের কাছে—মনের কাছে থাকে, বুদ্ধির প্রখর আলোককেও যাহা চলিতে চাহে আড়াল করিয়া, তাহা আমাদের হৃদয়ের কাছে আসিয়া ধরা দেয় একটা রস-স্পন্দনের রূপে,—ইহাকেই আমি বলিয়াছি

বিশ্বপ্রকৃতির অনির্বচনীয় স্বরূপ, যাহাকে আমরা নিরন্তর প্রকাশ করিতে চাহিতেছি, আমাদের সাহিত্যে। প্লেটো হয়ত তৎপূর্ববর্তী যে সকল সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্যকে জীবনের 'অনুকরণ' বলিয়াছেন তাহা গ্রীক সাহিত্যের এপিক এবং নাটকগুলি ; কিন্তু এপিক নাটক প্রভৃতি বিষয়-প্রধান (Objective) কাব্যগুলির ভিতরেও যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে একটা বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের যথাযথ বর্ণনা তাহা মনে হয় না ; যেখানে সেই বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের ভিতর দিয়া সকল জুড়িয়া মানুষের জীবন-রহস্য আরও গভীর হইয়া একটা অকথিত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠে নাই, সেখানে তাহা বড় সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

যে বিশ্বসৃষ্টিকে জড় ও চেতনের লীলার ভিতর দিয়া পাইতেছি প্রত্যক্ষ নিরন্তর আমাদের চারিপাশে, তাহাকে আবার সাহিত্যের ভিতরে রূপায়িত করিয়া পাইতে ভাল লাগে কেন ? তাহার কারণ, জীবনের ভালমন্দ, সৌন্দর্য বীভৎসতা, কারুণ্য রুদ্রত্ব সকল জড়াইয়া আমাদের চোখে জাগিয়া উঠে যে বিস্ময়, ব্যঞ্জিত হইয়া ওঠে যে মহিমা তাহাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে এবং পাইতে চাই সাহিত্যে। রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বিষয়প্রধান সাহিত্য জগতে আর কি আছে ? কিন্তু সে কি তৎকালীন জীবনের ফোটোগ্রাফ মাত্র ? সমস্ত জুড়িয়া কবিগুরু বাল্মীকি এবং ব্যাসদেব কী কথা বলিয়াছেন ? বলিয়াছেন,—"জীবনকে দেখ—বিশ্বজগৎকে দেখ,—কত তার রহস্য—প্রতি রন্ধ্রে ভরা রহিয়াছে অসীম বিস্ময়,—অনির্বচনীয় তাহার মহিমা। জীবনের সেই অনির্বচনীয় মহিমাকে আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছি গভীর রস স্পন্দনে, জীবনের সেই অনির্বচনীয়তাকেই লক্ষ লক্ষ শ্লোকে বচনীয় করিয়া তুলিয়াছি আমাদের কাব্যে। জীবনবেদের পাতায় পাতায় লেখা রহিয়াছে যে গভীর সত্য তাহা হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানুষকে করিতে চাহিয়াছিলেন বঞ্চিত ; জীবনের সেই গভীর সত্যকে আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছতার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে দিই নাই ; আমরা ফিরিয়া তাকাইয়াছি জীবনের পানে ; আমরা জীবনের অমৃত লাভ করিবার জন্য 'আবৃত্তচক্ষুঃ'। জীবনের পানে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিয়াছি যে বিপুল রহস্য, প্রতি পদে লাভ করিয়াছি যে বিস্ময় তাহাকে প্রকাশ করাই আমাদের লক্ষ্য, "রাম-রাবণের যুদ্ধ বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ উপলক্ষ্যমাত্র"। এইজন্য আমরা বিষয়-সর্বস্ব অথবা বাস্তবপন্থী সাহিত্য বলিয়া যেখানে কোলাহল করি, সেখানেও

বাড়াবাড়ি করিবার কিছুই নাই, যাহা শুধু দেখিয়া শুনিয়াই তৃপ্তি—দেখা শুনার পশ্চাতে যে রাখিয়া যায় না ভাবনার মূর্চ্ছনা, তাহাকে লইয়া কখনও কোনোদিন সাহিত্য হয় নাই ; আমার এই ভাবনার মূর্চ্ছনার পশ্চাতে রহিয়াছে আমাদের অন্তরের গভীর বিস্ময়। নাটককে আমরা সাধারণতঃ বিষয়প্রধান বা ঘটনা-প্রধান বলিয়া জানি ; কিন্তু ভরত তাঁহার নাট্যসূত্রে নাট্যের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্।

ত্রিলোকের যাহা কিছু তাহার ভাবানুকীর্তনই নাটকের উদ্দেশ্য।

আমরা আধুনিক কালে এক রকমের তথাকথিত বিষয়সর্বস্ব কবিতা রচনা করিতেছি। সেখানে আমরা চেষ্টা করি প্রবহমান সংসারের কোথাও হইতে এক টুকরা ছবিকে ছিঁড়িয়া আনিয়া তাহকে বিশুদ্ধতম আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে। তাহার গায়ে যাহাতে আমাদের মনের রঙ দাগ লাগিয়া সে বিকৃত না হইয়া ওঠে, সেই দিকেই থাকে আমাদের সচেতন চেষ্টা। আমরা বলি তাহার আত্মগত সমাবেশের ভিতরেই আছে একটা মহিমা, আমরা লাভ করিতে চাই সেই মহিমাকে। কিন্তু আজকালকার এই জাতীয় কবিতাকে একটু নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যাহাকে আমরা বলি বিশ্ব-সংসারের খণ্ডচ্ছিন্ন একটি দৃশ্য বা ঘটনার আত্মগত সমাবেশের মহিমা, তাহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটি বিশ্বপ্রবাহের বিপুল পটভূমি। সেই বিপুল পটভূমি থাকিয়া যায় আমাদের সচেতন মনের পটভূমিতে,—সেই অসীম অনন্ত পট-ভূমিই দান করে খণ্ডচ্ছিন্ন একটি অংশকে অকথিত মহিমা। আমরা আমাদের এই জাতীয় কবিতার ভিতরে বর্ণনীয় বিষয়কে যতই বৃহত্তর জগতের বিপুল প্রবাহ হইতে টানিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া আঁকিতে চাই না কেন, এখানে সেখানে থাকিয়া যায় সেই বৃহত্তর প্রবাহের আভাস ইঙ্গিত। সেই বৃহতের সহিত মিলিয়া মিশিয়াই ক্ষুদ্রও হইয়া ওঠে বৃহৎ। নিছক আত্মগত সমাবেশের ( Composition ) মহিমা চিত্রশিল্পের বেলায় যদি বা সম্ভব হইয়া ওঠে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সংশয় আছে। যুক্তির দ্বারা তাহার সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব।

বিশ্বনাথ রসের স্বরূপ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—রস হইল 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণঃ', কবি কর্ণপূরও বলিয়াছেন 'চমৎকারি সুখং রসঃ'। বিশ্বনাথের মতে চমৎকার শব্দের অর্থ চিত্তবিস্তার রূপ বিস্ময়। তাহা হইলে রসের ভিতরে

যে একটা আনন্দবোধ রহিয়াছে সেই বোধের সহিত অভিন্ন হইয়া রহিয়াছে একটা পরম বিস্ময়বোধ। এই প্রসঙ্গে ধর্মদত্তের গ্রন্থ হইতে যে মতটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও দেখিতে পাইতেছি যে 'চমৎকার' বা বিস্ময়ই হইতেছে রসের সারবস্তু এবং এইজন্যই কাব্যে যত প্রকারের রস হয় তাহার মূলে রহিয়াছে একটা অদ্ভুত রস। কথাটার তাৎপর্য কি? পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জীবনের ভিতর রহিয়াছে যে অতলস্পর্শ রহস্য তাহা আমাদের কবিমনকে নিরন্তর করিতেছে বিস্ময়মুগ্ধ, আমাদের সাহিত্যের রসানুভূতির ভিতরে একটা গভীর আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়া আমরা লাভ করি বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে একটা লোকোত্তর চমৎকৃতি,—একটা পরম বিস্ময়, জীবনের যত প্রেম, যত হাসি, যত করুণা, যত উৎসাহ, রুদ্রত্ব, ঘৃণা, ভয় কিছুই সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে না যতক্ষণ না সে একটা বিস্ময়ের ভিতর দিয়া আভাস দেয় জীবনের গভীর রহস্যের। এই বিস্ময় লক্ষণের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের লৌকিক আনন্দ ভোগ এবং আমাদের অলৌকিক ধর্মানন্দের সহিত সাহিত্যের রসাস্বাদের একটা প্রকার ভেদ স্থাপন করিতে পারি। প্রেমের আনন্দে যত বিস্ময় কম, চিত্তের প্রসার কম,—ততই সে লৌকিক, সাহিত্যের জগৎ হইতে সে থাকে দূরে। আমাদের ধর্মরাজ্যের প্রেমেও আনন্দের গভীরতার সহিত রহিয়াছে সকল রহস্য—সকল জিজ্ঞাসা—সকল বিস্ময়ের পরিনির্বাণ; যে আনন্দানুভূতি আনে শুধু চিত্তের পরিনির্বাণ সে যতই বৃহৎ হোক না কেন, তাহাকে সাহিত্যের জগতে স্থান দিতে পারি না। সাহিত্যের রসই 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' হইয়াও 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণঃ।' সাহিত্যে ধর্মের স্থান রহিয়াছে, ভগবৎ প্রেম লইয়া অনেক কাব্য কবিতা হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের যে ভগবৎ প্রেম মানুষকে একান্ত পরিনির্বাণের পথে লইয়া যাওয়াই তাহার মুখ্য কাজ নহে, সে মানুষের মনকে লইয়া যায় রহস্যের গভীরতায়—বিস্ময়ের অতলতায়। সেই রহস্য এবং বিস্ময় লইয়াই ধর্মও সাহিত্য হইয়া ওঠে।

সাহিত্য সৃষ্টির আদিম প্রেরণার ভিতরেই রহিয়াছে এই চিত্ত-প্রসার-রূপ চমৎকৃতি বা বিস্ময়। বিশ্বসৃষ্টিকে মানুষ যত দেখিয়াছে তাহার রহস্যময় বৈচিত্র্যে তত সে হইয়াছে বিস্ময়-মুগ্ধ; এই জগৎ হইতে জীবন হইতে সে অনেক পাইয়াছে প্রেম, অনেক পাইয়াছে সৌন্দর্য, মাধুর্য,—অনেক পাইয়াছে হাসি কান্না, আশা উৎসাহ, ঘৃণা ভয়; জগৎ এবং জীবন হইতে দুই হাত

ভরিয়া এই যে নিরন্তর পাওয়া তাহাকে যতক্ষণ সে ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে ক্ষণিক হৃদয়বৃত্তির বিস্ময়হীন আলোড়নে, ততই তাহাকে করিয়াছে ক্ষুদ্র সাধারণ লৌকিক জীবনের অমহিমায়; জীবনের চলার পথে ধূলামাটির ভিতরে সে হারায় আপন সত্তা। কিন্তু জীবনের সকল পাওয়াকে মানুষ এমনি করিয়া ধূলায় বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই; মানুষের মহত্তর সত্তায় এই সকল পাওয়া তুলিয়াছে স্পন্দন,—মানুষ পাইয়াছে আর বিস্মিত হইয়াছে। তাই সে পাইয়াছে আর ভাবিয়াছে,—সেই পাওয়া আর ভাবনায় মিলিয়া মিশিয়া গড়িয়াছে একটা মনোময় লোক,—সাহিত্যের সৃষ্টি এইখানে।

জীবনের যে সকল অনুভূতি একটা ভাবনার অনুরণন না রাখে তাহারা সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে না। জগৎ ব্যাপার এবং জীবন প্রবাহের পশ্চাতে এই যে একটা অনুরণন রহিয়াছে, তাহা লইয়াই গড়িয়া ওঠে আমাদের কাব্যলোক। প্রেমের যে দুইটি রূপ—সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ তাহার প্রথমটি লইয়া কাব্য জমিয়া উঠে না; কারণ সম্ভোগের ভিতরে নায়ক নায়িকা উভয়ে উভয়ের এত কাছাকাছি যে মাঝখানে বিস্ময়ের স্থান নাই; তাই সেখানে নাই ভাবনার অনুরণন। বিরহ সৃষ্টি করে যতখানি ব্যবধানের ততখানি বিস্ময়ের, কারণ প্রেমের দুই পারের মাঝখানে ত থাকিতে পারে না কোন ফাঁক, ব্যবধানের দূরত্ব তাই ভরিয়া যায় রহস্যের গোধূলিতে,—সে বিস্মিত করে—ভাবায়,—সে আনে চমৎকৃতি, তাই বিরহ লইয়া হয় কাব্য।

বৃহৎ জগৎ ব্যাপারের ভিতরকার অনুরণনকে অনুভব করিতে হইলে নিজেকে এই জগৎ ব্যাপারের ঘূর্ণি এবং কোলাহল হইতে একটু গুটাইয়া লইতে হয়,—একটু ঊর্ধ্বে রাখিতে হয়। বেদে দেখিতে পাই 'নৃচক্ষাঃ' অর্থাৎ মনুষ্যদিগের দ্রষ্টাকে 'কবি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—'কবির্নৃচক্ষা অভিধীমচষ্ট' (ঋগ্বেদ. ৩।৫৪।৬) সূর্যদেব যেমন আকাশে অবস্থান করিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে দর্শন করেন, কবিকেও তেমনই এই সংসারের ঘূর্ণিপাক হইতে আত্মস্বরূপে একটু ঊর্ধ্বে অবস্থান করিয়া বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিতে হয়। রাজপথের কোলাহলের সহিত যে লোক কোলাহল করিয়া চলে সেই কোলাহলের ভিতরেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দেয়, সে কোলাহলকে ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পায় না,—তাই সে কোলাহলের পশ্চাতে রহিয়াছে যে বিস্ময়বিমথিত ভাবনার অনুরণন তাহা তাহার নিকট থাকিয়া যায় একেবারে অজ্ঞাত। এমন লোক আছে যে ঐ রাজপথের মিছিলের সঙ্গেই চলিয়াছে কোলাহল করিয়া,—কিন্তু মাঝে

মাঝে সে থামিয়া যায়,—চোখ মেলিয়া দেখিতে চাহে রাজপথের শোভা-যাত্রাকে, শুধু পরের চলাকে নহে, নিজের চলাকেও, কান পাতিয়া শুনিয়া লয় শুধু পরের কোলাহলকে নহে, নিজের কোলাহলকেও, তখনই সে অনুভব করিতে পারে চলার পশ্চাতে যে অনুরণন রহিয়াছে তাহাকে। শব্দের অনুরণন শব্দের মতন স্থূল নহে, তাই তাহাকে শুনিতে হয় বিশেষ ভাবে কান পাতিয়া, জগৎ ব্যাপারের পশ্চাতে রহিয়াছে যে বিস্ময়ের অনুরণন তাহাও তেমনি জগৎ ব্যাপারের ন্যায় স্থূল নহে। তাহাকে লাভ করিতেও চাই সেই তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এই জন্যই কবিকে হইতে হয় 'আবৃত্তচক্ষুঃ'।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ভিতরে একদল ধ্বনিবাদী আছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমরা যাহা বলি সেই বলা যখন বলার ভিতরেই শেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ বলাটার যে একটা সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট অর্থ রহিয়াছে সেই অর্থটির প্রকাশের সঙ্গে যখন তাহার সমস্ত কর্তব্যটুকু শেষ হইয়া যায় তখন সে কাব্যেতর; কিন্তু সেই বলার সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট অর্থটিই যেখানে প্রধান নয়, বলার ভিতর দিয়া আভাসে ইঙ্গিতে, প্রধান হইয়া উঠে একটা বাচ্যাতীত অর্থ, সেইখানেই সে কাব্যপদবাচ্য। এই যে বাচ্যার্থের ভিতর দিয়াই বাচ্যার্থকে ছাপাইয়া ওঠে একটা বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনা ইহাই ধ্বনি, সেই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা।

এই ধ্বনি শব্দটিকে আর একটু গভীর এবং ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলেই আমরা কাব্যের আত্মাকে লাভ না করিলেও তাহার অন্তর্দেশের প্রবেশাধিকার লাভ করিব। উত্তম সাহিত্য যে ধ্বনিপ্রধান তাহার কারণ এই যে মূলতঃ ধ্বনি লইয়াই গড়িয়া ওঠে সকল সাহিত্য, সে ধ্বনি হইতেছে সমগ্র সৃষ্টির ধ্বনি। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে—সে বৃহৎ হোক বা ক্ষুদ্র হোক—তাহারা কিছুতেই আপনাতে আপনি লীন হইয়া যাইতেছে না, সকল ঘটনের ভিতর দিয়া থাকিয়া যাইতেছে একটা অঘটনের ঝঙ্কার, ইহাকেই আমি বলিয়াছি জগৎ ব্যাপারের অনুরণন। বিশ্বপ্রবাহের ভিতরে নিহিত রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্যই বিধাতার ছলা-কলা, মানুষ তাই এমন একটি জীবন গড়িয়া লয় তাহার সাহিত্যের ভিতরে যেখানে সে সকল দৃশ্য, গন্ধ, গান,—সকল ঘটনাপ্রবাহের ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চায় সেই ধ্বনিকে, প্রকৃতিতে এবং সাহিত্যে এইখানেই তফাৎ। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকে সাধারণ লোকে ধরিতে পারে না, তাহা ধরা পড়ে শুধু বিশেষ বিশেষ দেশে ও কালে বিশেষ বিশেষ

লোকের কাছে। সেই বিশেষ লোকই জগতের বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিক, বিশ্বজীবনের ধ্বনিকে তাঁহারা সুলভ করিয়া তোলেন তাঁহাদের নিজেদের সৃষ্টির ভিতর দিয়া। সাহিত্যের ভিতরে আমরা বহির্বিশ্বকে যেমনটি ঠিক তেমনটি করিয়া কখনই প্রকাশ করি না,—উগ্রতম বাস্তববাদী সাহিত্যেও না, কারণ বিশ্বজীবনকে যেমনটি ঠিক তেমনটি করিলে তাহার ধ্বনিটিকে যে প্রকাশ করা হইত না। তাই সর্বপ্রকার সাহিত্যসৃষ্টির ভিতরেই রহিয়াছে অনেক ছাটাই বাছাই নানা প্রকার কলা কৌশল, এই সকল প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে এই মুখ্য উদ্দেশ্য—বিশ্বজীবনের সেই অংশটুকু সেইভাবে প্রকাশ করা যাহাতে বিশ্বজীবনের ভিতরে লুকাইয়া রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকেই সবচেয়ে স্পষ্ট এবং সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা হয়।

বহির্জগতের নায়ক নায়িকা শুধু প্রেম করে না আরও হাজার রকমের কাজ করে, কিন্তু জগতের যত কাব্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক হইয়াছে তাহা যে অধিকাংশই নায়ক নায়িকার প্রেম লইয়া তাহার কারণ এই যে প্রেমের ভিতর মানুষ সবচেয়ে বেশী পাইয়াছে জীবনের রহস্য-বিস্ময়, জীবনের ধ্বনির সন্ধান। সেই ধ্বনিটুকু ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বাস্তব জীবনের যেটুকু যেটুকু প্রয়োজন, কাব্যের ভিতরেও আমরা গ্রহণ করি সেইটুকুই। তাহা যে শুধু রোমান্টিক কাব্যে বা আদর্শবাদী কাব্যে করি তাহা নহে, তাহা করি সকল বাস্তববাদী সাহিত্যেও। আমাদের বর্তমান যুগের দৃষ্টিতে আমরা হয়ত জীবনের রহস্য পাইয়াছি শুধু নায়ক-নায়িকার প্রেমের ভিতরে নহে, তাহাকে পাইয়াছি পরস্পরের ঘৃণা বিদ্বেষের ভিতরেও, কিন্তু সেই ঘৃণা বিদ্বেষের ঘাত-প্রতিঘাতের যে রূপ আঁকিয়া তুলি আমরা আমাদের সাহিত্যে, সে আমাদিগকে কি দিতেছে? ঘৃণা বিদ্বেষের ভিতর দিয়াও মানুষের জীবনে জাগিতেছে যে গভীর রহস্য যে জীবন-ধ্বনি, তাহাকেই সে প্রকাশ করিতে চাহে তাহার সকল রূঢ়তার ভিতর দিয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাই আমরা শুধু সুন্দরকে—শুধু মধুরকে—খুঁজি না, জীবনের সকল দুঃখ-বেদনা, সকল ঘৃণা-বিদ্বেষ, কুশ্রীতা, বীভৎসতাও সাহিত্যের রস হইয়া উঠিতে পারে যদি সে প্রকাশ করে জীবনের ধ্বনিকে, জীবনের সেই ধ্বনির স্বরূপ পরম বিস্ময়।

জগৎ ব্যাপারের পশ্চাতে এই যে একটি অনুরণন তাহা দ্বারাই সৃষ্ট হয় কবির অন্তর রাজ্যে একটি বিশেষ বাসনা-লোক। জীবনের ধন তাই কিছুই ফেলা যায় না। যাহা কিছু বাহিরে পাওয়া যায় স্থূল বাহিরের

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তাহাই আবার একটি অনুরণনের রূপে অন্তরে প্রবেশ করিয়া গড়িয়া তোলে এই সাহিত্যের বাসনা-লোক। এই বাসনা-লোক হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি, এই বাসনা-লোকেই আবার সাহিত্যের আস্বাদন। সম-বাসনার যোগেই একটি হৃদয় অপরের কাছে হইয়া উঠে 'সহৃদয়', আর দুইটি সহৃদয়ের যে সংবাদ তাহাই সাহিত্যের যথার্থ 'সাহিত্য'। এই বাসনা-লোকের সামগ্রী বলিয়াই সাহিত্যের বিষয়বস্তু শরীরী হইয়াও অশরীরী। শরীরী সে বাহিরের যোগে, অশরীরী সে অন্তরের যোগে। সাহিত্যের বিষয়বস্তু যেমন একদিকে স্থূল বাস্তব নহে, অন্যদিকে সে একান্তভাবে বস্তু-বিযোজিতও নহে। বিশ্বসৃষ্টি যে আমাদের চিত্তরাজ্যে স্থানলাভ করে বাসনারূপে তাহার ভিতরে বিধৃত হইয়া থাকে বিশ্বসৃষ্টির শরীরী রূপ, তাহার দেহাতীত অনুরণনের রূপের সহিত যুক্ত হইয়া। এই দেহ এবং বিদেহের মাঝখানে জাগিয়াছে সাহিত্য, দেহের ভিতর দিয়া দেহাতীতেরই সন্ধান দিতে। কবির বাসনা-লোকে বিধৃত বিশ্বজীবনের অনুরণন লোকোত্তর চমৎকৃতির ভিতর দিয়া নিরন্তর জীবনের সকল সুখ দুঃখ, প্রেম-ঘৃণা, বীরত্ব ভয়কে অপূর্ব আস্বাদ্য করিয়া তুলিতেছে; বিশ্বজীবনের সেই আস্বাদ্যমানতার নামই 'রস'।

সাহিত্যের এই রস আমাদের চিত্তের বন্ধন মোচন করে। বহির্বিশ্ব প্রতি মুহূর্তেই দেশ কাল পাত্রের দ্বারা আমাদের চিত্তের উপরে টানিয়া দিতেছে অসংখ্য আবরণ। এই আবরণ আমাদের চিত্তকে টানিতেছে বন্ধনের দিকে। সুখের বন্ধন সোনার শৃঙ্খলের বন্ধন, দুঃখের বন্ধন লোহার শৃঙ্খলের বন্ধন, উভয়ই দিতেছে অতৃপ্তির বেদনা। উদ্ভট মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা। সে জগৎকে চায়, জীবনকেও চায়, আবার সেই সঙ্গে সব লইয়া চায় পলে পলে বন্ধন হইতে মুক্তি, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের ভিতরে, সীমা হইতে অসীমের ভিতরে মুক্তি। সাহিত্য সেই মুক্তির জগৎ। হাজার রকম বন্ধনের আয়োজন করিয়া তাহারই ভিতরে সে আমাদের মনকে যে বিশ্বজীবনের আকাশে একটুখানি ঘুরিবার সুযোগ দেয় সেইখানেই আমাদের তৃপ্তি, তাই আমরা জীবন ছাড়িয়া আবার সাহিত্য চাই।

সাহিত্যে রসানুভবের কোন বিশেষ ক্ষণে আসিয়াই যে আমাদের চিত্তের বন্ধনমোচন হয় তাহা নহে। এই বন্ধন-মোচনের আয়োজন রহিয়াছে প্রথমাবধিই। সাহিত্যের ভিতরে সাধারণীকৃতি বলিয়া একটা ব্যাপার আছে,

তাহার ভিতরেই রহিয়াছে আমাদের সীমা হইতে অসীমে যাত্রা। এ অসীমে যাত্রার বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য এইখানে যে, এখানে সীমা আছে কিন্তু তাহার বন্ধন নাই। সীমাকে অস্বীকার করিয়া অসীমে চলিয়া যাই না, সীমাই এখানে দেখা দেয় অসীমের রূপে। আপিসের কেরাণী আলো হাওয়া শূন্য আপিস ঘরের ভিতরে মোটা মোটা অঙ্কের যোগ-বিয়োগের ফাঁকে ফাঁকে পড়িতেছে গল্প এবং উপন্যাসও; তাহাতে হয়ত লেখা রহিয়াছে কেরাণী জীবনের লাঞ্ছনাময় দুর্বহতারই কথা। কিন্তু বাস্তব জগতের কেরাণী-জীবন তাহার মনকে যতই বিষাইয়া দিক না কেন, সাহিত্যের কেরাণী জীবন তাহার চিত্তকে অমৃতরসে সিঞ্চিত করিয়া দিতেছে; তাই বড় সাহেবের নিরন্তর বকুনি এবং ঝাঁকুনি হজম করিয়াও সে যখনই ফাঁক পাইতেছে তখনই নির্বিকারে পড়িতেছে গল্প এবং উপন্যাস। ইহার কারণ চিত্তের বন্ধনমোচন। বাহিরের জগতের কেরাণী তাহার দেশ কালের খণ্ডিতসত্তা লইয়া আমাদের চিত্তকেও শত আবরণে খণ্ডিত করিতেছে। সাহিত্যের ভিতরেও দেশ রহিয়াছে, কাল রহিয়াছে, কেরাণীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি সকল জুড়িয়া রহিয়াছে তাহার একটা দেশ-কাল-পাত্র নিরবচ্ছিন্ন রূপ। এই যে দেশ-কাল-নিরবচ্ছিন্ন রূপ তাহাই চিরন্তন রূপ—তাহাই অসীম। প্রমেয়ের ভিতরে এই যে চিরন্তনের অসীমতা তাহাই প্রমাতার ভিতরে আনে আত্ম-প্রসারণ; তাহাই সাহায্য করে প্রমাতৃচিত্তের বন্ধনমোচনের।

আমাদের জাগতিক জীবনের যে সাধারণ অনুভূতিগুলি তাহারা জাগিয়া ওঠে 'আমি' এবং 'আমি-না'কে লইয়া। এই 'আমি' এবং 'আমি-না'কে গড়ে চিত্তের বন্ধন; মনকে সে চারিদিক হইতে ধরে ঘিরিয়া, বৃহৎ জীবনের রহস্যকে রাখে আচ্ছাদিত করিয়া। মানুষ চায় এই 'আমি-না'র সাথে 'আমি'র একটা গভীর মিল, কারণ এই মিলের ভিতর দিয়াই 'আমি'ও মুক্তি পায় তাহার প্রাচীর-ঘেরা বিচরণ-ভূমি হইতে। এই মিলটা অতি সহজ হইয়া আসে সাহিত্যের ভিতরে, তাই সাহিত্যে 'আমি'রও আছে মুক্তি। সাহিত্যের যে রস তাহা কাহার সামগ্রী? তাহা পরের বলিয়া মনে হয়, আবার পরের নয়, আবার আমার বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আবার মনে হইতেছে সে যেন আমারও নয়। 'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ'। রামায়ণ কাব্য হইতে যে করুণ রসের ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহা রাম সীতারও বটে, বাল্মীকি মুনিরও বটে, আজ যে আমি

বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছি আমারও বটে। রসাস্বাদকালে বিভাবাদিরই যে কোন 'পরিচ্ছেদ' থাকে না তাহা নহে, রসস্বাদকেরও থাকে না 'পরিচ্ছেদ'। এই সীমাহীনতার ভিতরে বিশ্বসৃষ্টির সহিত মানবমনের নিত্যকালের নিগূঢ় যোগ। এই যে আমি হইতে বিশ্বে এবং বিশ্ব হইতে আমাতে আসা যাওয়ার একটা সহজ পথ দেখিতেছি সাহিত্যের মধ্যে, তাহার ভিতরে মমত্বও তাহার মমত্ব হারায় না, পরত্বও তাহার পরত্ব হারায় না, উভয়ে থাকে অবিনাভাবে যুক্ত হইয়া। সেখানে বহির্বিশ্বও ওঠে গভীর রহস্যের বিরাট মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া, আমিও ওঠে তাহারই যোগে সর্বব্যাপী হইয়া. আর 'আমি'র এই সীমাহীন ব্যাপ্তিতেই মানুষের গভীরতম আনন্দ।

---